কর্ম্মবীর রাসবিহারী

(অমর বিপ্লবী, আই, এল, এর প্রবর্ত্তক, ও
সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ার স্বাধীনতার
অগ্রদূত শ্রীরাসবিহারী বসুর
জীবন-চরিত)

লেখক :
অধ্যাপক : শ্রীবিজনবিহারী বসু
(রাসবিহারীর অনুজ)

মুখ বন্ধ

উত্থান ও পতন, ঘাত ও প্রতিঘাত, মিলন ও বিরহ, শুভ ও অশুভ লইয়াই ত মানুষের জীবন। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে আছে দেবাসুরের যুদ্ধ ও দিব্যক্ষণ। ক্ষুদ্র মানুষের জীবন-নৌকা প্রতিকুল খরস্রোতে দিকহারা হইয়া ছুটিতে থাকে ও অবশেষে ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া নিমজ্জিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। মহাপুরুষদের জীবনেও আছে অসংখ্য বাধা, বিপত্তি ও বিঘ্ন, কিন্তু তাঁহারা সকল প্রতিকুলতা বিনষ্ট করিয়া অবিচলিত চিত্তে অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অদম্য সাহসিকতা, ও একান্ত ঐকান্তিকতার সহিত অভীষ্টপথে অগ্রসর হন। সেই জন্য মহাপুরুষদের জীবন কথা আমাদের প্রাণে জাগায় আশা, উৎসাহ, সাহস, সত্যানুবর্ত্তিতা, ও কর্ম্মপ্রেরণা।

রাসবিহারী ছিলেন এই মহাপুরুষদের মধ্যে অন্যতম। যে বঙ্গ-সন্তান আজীবন মাতৃমুক্তির সাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন ও অবশেষে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন আজও তাঁহার সমগ্র জীবন চরিত অপ্রকাশিত ও তাঁহার স্মৃতি অরক্ষিত।

জাতীয় জীবনে প্রত্যেক মহামানবের জীবন অমূল্য সম্পদ। যে জাতীর মধ্যে মহাপুরুষদের পূজা আছে, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আছে, তাঁহাদের চরিত-কথা পাঠ আছে, তাঁহাদের

প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও আদর্শের অনুধাবন ও অনুকরণ আছে, সে জাতি কখনও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে পারে না। তাই জগৎ-পূজ্য মহাপুরুষদের জীবন চরিতের পার্শ্বে রাসবিহারীর জীবন-চরিত-কথা সশ্রদ্ধে গ্রথিত করিলাম। আশা করি ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সন্তান এই পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিয়া নিজ জীবন গঠিত করিবার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন ও রাসবিহারী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি কালবিজয়ী পুরুষ বাঙ্গলাকে যে কৌলিন্য দান করিয়াছেন তাহা সযত্নে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইবেন।

রাসবিহারীর জীবন কথা রচনা করিতে করিতে বারম্বার নিজ লেখনীর অক্ষমতা অনুভব করিয়াছি। যেমন অনন্ত আকাশের অনন্তরূপ শব্দে ও বর্ণে চিত্রিত করা অসম্ভব তেমনই কোন মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবন-রহস্য ঘটনা-বিবৃতির দ্বারা সম্যকরূপে প্রতিফলিত করা একপ্রকার অসাধ্য। তবুও যে সেই অমর চরিত্র রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি তাহা কেবল নিজকে ধন্য করিবার জন্য। সকল ত্রুটী লেখকের, রাসবিহারীর চরিত্রের নয়। যে সকল সহকর্ম্মী ও বন্ধুগণ এই চরিত্র গাথা রচনা ও প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাইতেছি।

নিবেদক

শ্রীবিজনবিহারী বসু

ওম্

আশীর্ব্বাদ পত্র

এতদিন পরে রাসবিহারীদা সম্বন্ধীয় একখানি নির্ভরযোগ্য জীবন-কথা বাহির হইল। এই জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি শ্রীমান বিজনবিহারীকে—আর ততোধিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিশিষ্ট জাপানী বন্ধুবর—ডাঃ জর্জ ওশাওয়াকে, যিনি এই জীবন কাহিনী রচনায় প্রাণস্পর্শী ভাষায় অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন শ্রীমান বিজনকে। জাতীয় বীরদের সম্পর্কে জাতির, বিশেষ বাঙ্গালী জাতির, গভীর ঔদাসীন্যের উপর এই জাপানী সুহৃদের কঠোর মন্তব্যও এই সঙ্গে ভুলিতে পারিতেছিনা। বোধ হয়, এই আঘাতের খোঁচা না খাইলে লেখক বিজনবিহারীর মনে তাঁর দেশগৌরব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবন-চরিত্র সঙ্কলন করার আগ্রহ ও প্রেরণা আসিত না—বাঙ্গালীও জাতীয় স্বাধীনতেতিহাসের এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও মহানায়কের বস্তুনিষ্ঠ জীবন গঠনের কাহিনীও শুনিতে পাইত না।

রাসবিহারীর বলিষ্ঠ দেহ-মন-শীল-কুল-কর্ম্মের মূলে যে নিগূঢ় সুর-সঙ্গতি, তাহার পরিচয় শ্রীমান বিজনবিহারীর লিখিত ঘটনাচিত্রের মধ্য দিয়া এমন চমৎকার ফুটিয়াছে যে, তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। রাস-দার সমস্ত পূর্ব্বজীবন যে সেই সন্ধিক্ষণের অপেক্ষায় উন্মুখ ও প্রতীক্ষা রত হইয়াছিল, যে মহাক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ

প্রচারিত গীতার আত্মসমর্পণ মহাযোগে অধ্যাত্ম দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেন চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে—তারপর বিদ্যুন্ময় মহাযন্ত্রের ন্যায় তিনি ছুটিয়া চলিলেন ভারতব্যাপী বিপ্লব সংহতি রচনা করিতে—ইহাই স্পষ্ট হইল গ্রন্থের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলি পড়িতে পড়িতে। লেখক রাসবিহারীর শুধু কনীয়ান ভ্রাতা নহেন, তাঁর অনুরক্ত ও আদর্শেরও পূজারী এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়াই আবার এই জাতীয় মহানেতার জীবন পাঠ করারও ক্ষমতা তাঁহার আছে দেখিতেছি। তাই বইখানি যতটুকু পড়িলাম, পড়িয়া অতিশয় খুসী হইয়াছি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হোতা যাঁহারা, তাঁহারা শুধু রাষ্ট্র-সাধকই নহেন, তাঁহাদের রাষ্ট্র প্রেরণার মূল উৎস ছিল সুগভীর ও অতলস্পর্শী অধ্যাত্মপ্রত্যয় ও সাধনানুভূতি—ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিলেন আমাদের রাসবিহারীদা। তাঁহার সহিত কৈশোরে যতটুকু সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহার নির্দ্দেশে বৈপ্লবিক শিক্ষা ও কর্ম্মের যেটুকু সুযোগ মিলিয়াছিল, তাহাতে তাঁর চরিত্রের এই দিকটাই ছিল আমার প্রধান শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের বস্তু। এই জীবন-কথায় সেই জীবন গঠনেরই একটা ধারাবাহিক সুর সামঞ্জস্য পাইয়াই আমি বিপুল আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ করি—তাঁর এই পূণ্যশ্রম সম্পূর্ণ ও সার্থক হউক। তিনি ইহার পরে রাসবিহারীদার বাল্যসঙ্গী ও বিপ্লব-সহতীর্থ নীরব মহাকর্ম্মী শ্রীশদারও (৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষ) এমনই একখানি অনুপম বাস্তব জীবন পরিচয় লিখিয়া

আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন—এই অনুরোধও তাঁকে করিয়া রাখিলাম।

আজকাল জীবন-নাট্য বহু দেখা দিয়াছে—রঙ্গমঞ্চে ও ছায়া-চিত্রে তার প্রদর্শন জাতির অতীত ইতিহাস ও গৌরবকে বর্ত্তমান যুগের নর-নারীর কাছে তুলিয়া ধরিতেছে। অবশ্য ইহার একটা তরল দিকও আছে—সে সুলভতায় বস্তুগরিমা ক্ষুণ্ণ যদি না হয়, রাসবিহারী বসুর রোমাঞ্চকর জীবন-কথায় মনে হয় এমন বহু উপাদান মিলিবে, যাহা লইয়া উৎকৃষ্ট ছবি তৈরী হইতে পারে। ইহাও বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে লেখক ও পাঠকগণ উভয়েই চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক
প্রবর্ত্তক সংঘ
চন্দননগর

মন্তব্য

১। 'সময়', 'হিতবাদী', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও 'উপাসনা', 'হিন্দদর্শন', 'আলোচনা' প্রভৃতি মাসিকপত্রের অন্যতম লেখক অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

বাল্যে বাংলা ভাষার চর্চ্চা কতদূর করিয়াছেন জানি না। বিদেশে যখন চাকুরি করেন প্রথম পরিচয় তখন হয়। তারপর বিদেশে চাকুরি করিতেই দেখিয়াছি। সুতরাং ধারণা ছিল আপনার বাংলা রচনা সুবিধামত হইবে না। সে ধারণা ঘুচিল, আপনার পাণ্ডুলিপি পাঠে বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম বিহার প্রবাসী চাকুরিসেবী বিজনবাবু এরূপ প্রাঞ্জল বাংলা লিখিতে শিখিলেন কবে এবং কিরূপে? আনন্দ হইল। আমার ধারণা রাসবিহারীর চরিত্র অঙ্কনে আপনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

২। বিপ্লবী নায়ক শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী বীর শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ, এক্ষণে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক লিখিয়াছেন—

অপূর্ব্ব বিপ্লবী বিশ্ববিখ্যাত রাসবিহারীর জীবনী, তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই বিজনবাবু লিখছেন এরচেয়ে সুসংবাদ আর কিছু নাই। ভারত জননীর শৃঙ্খল মুক্তির যোদ্ধা যে কজন ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন রাসবিহারী তাঁদের একজন। তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল শুধু বঙ্গদেশ নয়,

ভারতবর্ষ নয়, গোটা জাপান ও দূর প্রাচ্য জুড়ে। এই বইখানি বহু ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

৩। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাচার্য্য ও ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতির অন্যতম সদস্য ডাক্তার শ্রীকালিকিঙ্কর দত্ত এম, এ; পি, এইচ্, ডি; পি, আর, এস্ মহাশয় 'কর্ম্মবীর রাসবিহারী' পাঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—

কর্ম্মবীর দেশপ্রেমিক ৺রাসবিহারী বসুর জীবনী রোমাঞ্চকর ও প্রাণস্পর্শী ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁহার মহৎ জীবনের সম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও ভারতের মধ্যে নাই; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইঁহার বিশেষ স্থান। তাঁহার সহোদর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী বসু মহাশয় বহুবিধ কর্ম্ম ও বাধার মধ্যে থাকিয়াও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই বীরের জীবন কাহিনী অতি সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক নরনারীর এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করা উচিৎ। আশা করি বিজনবাবু অন্য ভাষাতেও এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিবেন। স্বাধীন ভারতে অন্য প্রকারেও ৺রাসবিহারী বসুর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

৪। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব দর্শনাচার্য্য ও আমেরিকার মিনোসেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক অধুনা শান্তিনিকেতনের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দত্ত মহাশয় এম, এ; পি, এইচ্, ডি; পি, আর, এস্ 'কর্ম্মবীর রাসবিহারী' পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন:—

স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত রাসবিহারী বসুর নির্ভীক দেশপ্রেম এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নানা কাহিনী স্বদেশী যুগ হইতেই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে

প্রচলিত। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বসু মহাশয়ের অসামান্য জীবনবৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহার অনুজ বিহার প্রবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী বসু মহাশয় বহুদিন যাবৎ এই অভাব মোচনের জন্য নানা সূত্র ধরিয়া কর্ম্মবীর রাসবিহারীর স্বল্পজ্ঞাত জীবনের তথ্য নীরবে সংগ্রহ করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সাধনার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা সাহিত্যে এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে ইহা যথোচিত সমাদর লাভ করিলেই বিজনবাবুর সুদীর্ঘ শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

রাসবিহারীর কন্যা
শ্রীমতী তেতসুকো

রাসবিহারীর পুত্র
শ্রীমাসাহিদে
(পরলোকগত)

রাসবিহারী বসু
(পরলোকগত)

কর্ম্মবীর রাসবিহারী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা। এ সময় যজ্ঞের প্রধান হোতা ছিলেন শেষ পেশোয়া নানা-সাহেব। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন আজিমুল্লা খাঁ। অন্যান্য হোতা ছিলেন তাঁতিয়া টোপী, দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ, গুজরাটের নবাব বাহাদুর শাহ, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও আক্রম খাঁ। সেদিন হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চালনা করিয়াছিলেন এই সংগ্রাম। সেদিন রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কণ্ঠস্বর আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল "মেরি ঝান্সী নেহি দিউঙ্গি, কভি নেহি দিউঙ্গি।" আজও সেই কণ্ঠস্বর দূরাগত মেঘমন্দ্রের মত ভারতীয় মাত্রেরই হৃদয় ঝঙ্কৃত করে। আর কয়েক বর্ষ পরেই ত সেই সংগ্রামের শতবার্ষিকী স্মৃতিতর্পণ। আমাদের কর্ত্তব্য এই শতবার্ষিকী ব্যাপকভাবে, ও গম্ভীর গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপন করা।

সবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে, আততায়ী ও শান্তিকামীর মধ্যে, ধ্বংসকারী ও স্রষ্টার মধ্যে, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে সুরু হইয়াছিল এই ১৮৫৭ সালেই দীর্ঘকালব্যাপী এক

বিরাট সংগ্রাম। সে সংগ্রামের কয়েকাঙ্ক অভিনীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও তাহার সমাপ্তি হয় নাই। তাই এই সংগ্রাম কেবল ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র মানব ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই এই শতবার্ষিকী স্মৃতি তর্পণ সমগ্র ভারতে সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

প্রতীচ্যে সক্রেটিস্, প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া টলষ্টয়, রোমা রোলাঁ প্রভৃতি বহু অধ্যাত্মবাদী ও দার্শনিক পণ্ডিত বিশ্ব-মানবতা প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজও বহু মনীষী মানব-কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রতীচ্যের রাজনীতি ও সাধারণ জনসমাজ এই অধ্যাত্মবাদ দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হয় নাই। প্রতীচ্য কাণ্ট প্রমুখ জড়বাদী দ্বারা প্রভাবান্বিত, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল সাম্রাজ্যবাদ। অপরদিকে ভারতের ব্যক্তিগত জীবনবিধি, সমাজ-বিধি, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি অতি সূক্ষ্মভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত এবং সকলের মূলমন্ত্র মানব-কল্যাণ। প্রাচ্য সভ্যতা দুইটী মূলমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটী পরপীড়ন পাপ, দ্বিতীয় আত্মসংস্কার। প্রাচ্যের রাজ-আদর্শ প্রজার কল্যাণার্থে আত্মত্যাগ—সর্ব্বস্ব পরিহার। তাই পাশ্চাত্য যখন রাজদণ্ড লাভ করিয়া এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মম-ভাবে লুণ্ঠন ও অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন সহসা শান্তিকামী প্রজা আত্মনাশ ভয়ে সম্মিলিতভাবে প্রতীচ্যের এই সাম্রাজ্য

লোলুপতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তাই যাঁহারা এই রাজদণ্ডধারী পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিকল্পে এই শতবার্ষিকী দিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান কর্ত্তব্য।

প্রাচ্য তাহার সভ্যতা প্রচারের জন্য বহু দূর দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছে। বহু দূর দেশ তাহার সভ্যতায় আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু একবিন্দু রক্তও পৃথিবীকে কলঙ্কিত করে নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিজয় অভিযানে পার্থক্য বহু, উদ্দেশ্য বিভিন্ন, তাই পন্থাও ভিন্ন। প্রাচ্যের পঞ্চসহস্র বর্ষব্যাপী অভিযান নিরুপদ্রব, শান্তিময়, স্বার্থশূন্য, স্বাধীন ও সুন্দর। প্রতীচ্যের অভিযান—বলপ্রয়োগের অভিযান, তাই রক্তরঞ্জিত ও অশ্রুলিপ্ত। প্রাচ্যের নীতি, মানব প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন ও মহামানবতার প্রচার। প্রতীচ্যের নীতি শোষণ, সুতরাং তজ্জনিত বলপ্রয়োগ। প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী তাই মানব মনের বিকাশ ও আত্মসংস্কার তার লক্ষ্য। পাশ্চাত্য পশুবলে বিশ্বাসী, তাই অস্ত্র তার একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। তাই পাশ্চাত্য নিত্যনূতন মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনে বদ্ধপরিকর। সেইজন্যই শাস্ত্রবিদ্যা অপেক্ষা শস্ত্রবিদ্যার অনুশীলন পাশ্চাত্যের অধিক প্রিয়। ফলতঃ যে লোভপরবশ হইয়া পরপীড়ন-দ্বারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য ব্যগ্র সেই ত অস্ত্রের জন্য ব্যাকুল হয়, সেই ত ভীষণ হইতে ভীষণতর অস্ত্রের প্রয়োজন প্রতিক্ষণে অনুভব করে, সেই ত মারণাস্ত্র প্রয়োগে বিশেষ

যত্নশীল হয়, সেই ত বলদ্বারা লুণ্ঠিত সম্পত্তি রক্ষণের জন্য নিত্যনূতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে তৎপর হয়। পাশ্চাত্য যখন নিত্য-নূতন মানবসমাজ-বিধ্বংসী নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর অকল্যাণকর মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে ও নির্ম্মাণে ব্যস্ত, প্রাচ্য তখন মানবসমাজের কল্যাণকর শান্তির বাণী প্রচারে, আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানে, মানুষের উত্তরাধিকার বিশ্লেষণে, অস্ত্রের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রচারে উদ্‌গ্রীব। প্রাচ্য শান্তির স্রষ্টা, পাশ্চাত্য মৃত্যু ও ধ্বংসের সাধক। পাশ্চত্যের কাম্য সর্ব্বগ্রাস, প্রাচ্যের সাধনা অহিংসা ও আত্মত্যাগ। কিন্তু পাশ্চাত্যের অবিরত শোষণ ও উৎপীড়ন এই অসম সহনশীল প্রাচ্যের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল। আত্মনাশ ভয়ে তাঁহারা অহিংসার পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই এই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ও শোষণে বিপর্য্যস্ত হইয়া স্বীয় শান্তিময়, স্বাধীন, অহিংস, নিরুপদ্রব, ইতিহাস অতিক্রম করিয়া প্রাচ্য এই প্রথম প্রবলের বলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সমবেতভাবে বাধা দিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়। আত্মরক্ষার জন্য পাশ্চাত্যের পশুবলের বিরুদ্ধে এই প্রথম প্রয়াস, এই প্রথম অস্ত্রধারণ। একদিকে বহুল মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত সমরকুশল পাশ্চাত্য—আর অপরদিকে অতি নিকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত শস্ত্রবিদ্যায় অদীক্ষিত প্রাচ্য। একদিকে বলদর্পীর রক্তক্ষরণ অভিযান—অপরদিকে দুর্ব্বলের বাঁচিবার প্রাণপণ প্রয়াস। এ স্মৃতি স্মরণীয় করাই ত উচিত।

এই যুদ্ধ স্মরণ করাইয়া দেয় কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে মোহান্ধ অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রবৃত্তই করেন নাই, স্বয়ং সেই যুদ্ধে সারথ্যও করিয়াছিলেন। যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ হয়, তবে এ যুদ্ধই বা অধর্ম্ম হইবে কেন? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পরপীড়নের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অস্ত্রধারণ না করা অহিংসা নয়, তার অন্য নাম আছে। মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও অন্যায়কে বাধাদান—ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব।

প্রাচ্যের বহু সহস্রব্যাপী ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রাচ্য বিপদসঙ্কুল বহু দূরদেশে তার সভ্যতা ও আদর্শ প্রচারের জন্য বহু সম্মিলিত সভা আহ্বান করিয়াছে, কিন্তু কোথাও একবিন্দু রক্তপাত করে নাই। এই প্রথমবার প্রাচ্য তার আদর্শ ও নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু কেন? কারণ পশুবলের নিকট যুক্তি, তর্ক, বিবেক, ধর্ম্ম, মোক্ষ সম্পূর্ণ নিরর্থক। দুর্য্যোধনের পশুবল ও অহঙ্কার তাহাকে যুক্তি, তর্ক, অনুনয়, বিনয় প্রভৃতি আবেদনে বধির করিয়াছিল। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণেরও দৌত্য নিষ্ফল হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের ইতিহাস শুধু বলপ্রয়োগের ইতিহাস, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ইতিহাস, তাই তার অভিযান সর্ব্বত্র রক্তরঞ্জিত।

প্রাচ্য মনোবৃত্তির সম্বন্ধে বিশেষ পরিচিত অধ্যাপক নর্থ্রপ তাঁর "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন— পাশ্চাত্য অভিযান প্রাচ্যের নিকট পরাজিত। কি রাজনীতি, কি শক্তি, কি অর্থনীতি, কি সভ্যতা, সর্ব্বত্রই তার পরাজয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন—এ পরাজয়ের মূলকারণ প্রাচ্যের মনোবৃত্তি ও মনোভিত্তি।

সত্যই পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যের মনোবৃত্তি আয়ত্ত করা অতীব কঠিন। এই মনোবৃত্তির ভিত্তি বেদান্তদর্শন, এবং এই বেদান্তদর্শন পৃথিবীতে অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের সাক্ষর, অনক্ষর সকল শ্রেণীর মানবের অস্থিমজ্জার সঙ্গে বেদান্তের মূল-মন্ত্র অপূর্ব্বভাবে মিশ্রিত। তাই দীর্ঘকালের অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও প্রাচ্যের ধর্ম্ম, নীতি ও মানবসমাজ, ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

একজন যখন যুক্তিতর্ক, অনুনয়, বিনয়, মনুষ্যত্বের আবেদন করিয়াও অপরকে নিজ মতে আনিতে অক্ষম হয় তখনই বলপ্রয়োগে অগ্রসর হয়। মানুষ আদিতে পশু, প্রকৃতির বশীভূত, ইন্দ্রিয় চালিত। এই পাশবিক বলপ্রয়োগ সাধারণ মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক—ক্ষমতাবানের পক্ষে ত বটেই। যখন কাহাকেও আমরা কোন বিষয় বুঝাইতে চাই তখন নিজের সূক্ষ্ম বিচারশীল ভাষা পরিত্যাগ করিয়া তাহার বোধগম্য স্থূল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হই। যাহার মধ্যে বুঝিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা আছে—সে স্বীয় চেষ্টায় বিষয়টী প্রণিধান করিতে চেষ্টা করে এবং সমর্থও হয়। কিন্তু যে বুঝিতে চায় না, বুঝিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহাকে বুঝাইবার জন্য বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। শক্তির পথ অপেক্ষা যুক্তির পথ অনেক

কঠিন, ধৈর্য্য ও সময়সাপেক্ষ। তাই সাধারণ মানুষ বল-প্রয়োগের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠে। এ অধীরতা নিন্দনীয়। কিন্তু যে বুঝিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এবং নিয়ত পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মানবকে অকাতরে লুণ্ঠন করিতেছে, উৎপীড়ন করিতেছে, তাহার এই মানবসমাজের অকল্যাণকর কার্য্যে বাধাদানের জন্য অস্ত্রগ্রহণ নিন্দনীয় নয়। অধর্ম্ম নাশের জন্য, মানবকল্যাণের জন্য অস্ত্রগ্রহণ সমর্থনীয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশই দিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়দিগের মতে ও বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ শক্তি-মত্তা ও গৌরবের পরিচায়ক। প্রাচ্যে এরূপ অপহরণের সংজ্ঞা অধর্ম্ম। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র এই পররাজ্য লোলুপতাকে তস্কর-বৃত্তি আখ্যা দিয়াছেন। এই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাঁহারা দুর্ব্বল হইয়াও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, যাঁহারা রুধিরপিপাসু সাম্রাজ্যবাদীর উৎপীড়ন হইতে কোটী কোটী মানবকে রক্ষা করিতে গিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলিদান অবশ্যকর্ত্তব্য। তাঁহারা বিফল হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ব্বলের মধ্যে নিহিত শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভবিষ্যৎ বিপ্লববাদীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। নানা-সাহেবের আদর্শ বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে পুনর্জ্জীবিত হইয়া মুষ্টিমেয় সাত্ত্বিক বিপ্লবীকে এক হাতে গীতা আর এক হাতে বোমা লইয়া প্রতীচ্যের অত্যাচার ও লুণ্ঠন রোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে প্রেরণা দিয়াছিল। যে সকল বিপ্লবী মাতৃভূমির মুক্তির

জন্য হাসিতে হাসিতে ফাঁসীর মঞ্চে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, এই শতবার্ষিকী দিনে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় কর্ত্তব্য।

জাতির জীবনে জাতীয় মহামানবের

ভূমিকা

জাতীয় ইতিহাসে জাতীয় মহামানবের জীবনী অতীব মূল্যবান। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনুপ্রাণিত করিতে, কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে, বৃহত্তর মানবকল্যাণের দিকে তাহাদের জীবনের গতি পরিচালিত করিতে জাতীয় মহাপুরুষদের জীবনী তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জাতীয় আভিজাত্য গঠন করিতে, জাতিকে আদর্শের পথে চালিত করিতে এই সকল মহাপুরুষের আত্মত্যাগের কাহিনী ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের স্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়। মহামানবের জীবন-চিত্র অবিনশ্বর—সদা সৌন্দর্য্যময়। স্মরণীয় ব্যক্তিরাই কালজয়ী। যতদিন জাতি তাঁহাদের স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে, ততদিনই তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাই কেবল শতবার্ষিকী দিনে এই সকল মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান কর্ত্তব্য নহে, প্রতি বৎসর তাঁহাদের স্মরণ করিয়া প্রতি ঘরে শ্রদ্ধাঞ্জলিদানের আয়োজন কর্ত্তব্য।

কর্ম্মবীর রাসবিহারী

প্রায় সহস্র বৎসরের পরাধীন জাতির পরপদদলিত জন্মভূমির অন্যতম কৃতিসন্তান রাসবিহারীর অনন্যসাধারণ স্বদেশানুরাগ, পরাধীনতার পাশমোচনে আত্মোৎসর্গ, প্রসঙ্গক্রমে উজ্জ্বলবর্ণে স্মৃতিপটে উদয় হয়। তাঁহার আদর্শ জীবনের রেখাপাতে স্বদেশ প্রেমের যে সমুজ্জ্বল চিত্র নেত্রপথে ভাসিয়া উঠে, তাহা সগৌরবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার বাসনা জাগিয়া উঠা, বিস্ময় বা বিচিত্র বিষয় নহে। দেশের ও দশের তাঁহার জীবনী জানিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। সুতরাং কর্ত্তব্যানুরোধে সেই দেশপ্রাণ মহাপুরুষের জীবনী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

সামান্য ব্যক্তি ও মহাপুরুষের মধ্যে প্রভেদ এই, যে সামান্য ব্যক্তির স্মৃতি অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হইয়া যায়, আর মহাপুরুষের স্মৃতি মৃত্যুর পরও লুপ্ত হয় না—দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতির জীবনে জাগিয়া থাকে। এই স্মৃতির দৈর্ঘ্য মহামানবতার মাপকাঠি। যত দীর্ঘকাল মহামানবেরা জাতির স্মৃতিতে বা জগতের স্মৃতিতে জাগরূক থাকেন, ততই জাতির উত্তরাধিকারিগণের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।

এইখানে জাপান প্রবাসী কর্ম্মবীর সদাবিপ্লবী রাসবিহারীর জীবনচিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। জগতের যাবতীয় মহাপুরুষদের চিত্রের পাশে এই কর্ম্মবীরের চিত্র গ্রথিত করিলাম।

কতদূর এই কর্ম্মবীরের চরিত্রের উপর আলোকপাত করিতে পারিলাম তাহা পাঠক বিচার করিবেন। যাহা কিছু ক্রুটী তাহা লেখকের—রাসবিহারীর চরিত্রের নয়।

রাসবিহারী বসু ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দ

হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে, বিহারে কিংসফোর্ডের উপর ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপে, ভারতে বৃটিশ সরকার চমকিত হইলেন। ১৮৫৭ সালের নিষ্পেষণে ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন। যে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছিল তাহাতে বল সঞ্চার দেখিয়া বৃটিশ সরকার বিস্মিত। বাগাড়ম্বর, গলাবাজী, ক্রন্দন, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থ হইয়া সহসা আক্রমণ,—ভারত সরকার তৎপর হইয়া উঠিলেন। প্রফুল্ল চাকী ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করিল। মহাসমারোহে ক্ষুদিরামের বিচার ও ফাঁসী হইয়া গেল। বিপ্লবের স্নায়ুকেন্দ্র অনুসন্ধান করিতে করিতে মানিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল। কানাইলাল, সত্যেন্দ্র, প্রভৃতির ফাঁসী হইল। বারীন্দ্র প্রমুখ কয়েকজনের দ্বীপান্তর হইল। ইংরাজ স্পষ্ট বুঝিল এই আক্রমণকারীরা দস্যু নহে, তস্কর নহে, সাধারণ রক্তলোলুপ পশু নহে। এই বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত, ইহারা সর্ব্বদাই আত্মবলিদানে প্রস্তুত—ইহারা হাসিতে

হাসিতে ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়ায়—বন্দেমাতরম্ বলিয়া ইহারা ঝুলিয়া পড়ে। ইংরাজ সরকারের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই, একদিনে বিপ্লবীরা এই নৈতিক চরিত্র লাভ করে নাই। গোপনে গোপনে স্বেচ্ছাসেবকদল গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ এই বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাবতীয় বাঙ্গালী যুবকের উপর খরদৃষ্টি পড়িল। বাঙ্গলার স্কুল কলেজে ছদ্মবেশে গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। বহু নিরীহ বাঙ্গালী যুবক যথেচ্ছভাবে নিগৃহীত হইতে লাগিল। সভা সমিতি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালী যুবকদের সরকারী চাকুরী হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গলা হইতে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার কণ্ঠনালী রুদ্ধ করিয়া দিয়া বৃটিশ সরকার নিশ্চিন্ত হইলেন। এই যুগের কথা বলিতে গিয়া "বনফুল" বলিয়াছেন—"যেদিন মুজাফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা ফাটিল সেই দিন বাঙ্গালী শিক্ষিত সন্তানের কপাল ভাঙ্গিল।" কপাল ভাঙ্গিল কি প্রসন্ন হইল, ভবিষ্যৎকাল তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বলপ্রয়োগে জাতির নব জাগরণ কি রুদ্ধ করা যায়?

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর ভারতের ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন সরকারীভাবে অতীতের মুঘল নগরী এবং বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লীতে মহাসমারোহে প্রবেশ করিতে-ছিলেন, তখন একটী বিস্ফোরক বোমা তাঁহার উপর নিক্ষিপ্ত হয়। এই বোমা বিস্ফোরণে রাজপ্রতিনিধি নিহত হয় নাই। বোমা

নিক্ষেপকারী অদৃশ্য হন। যে বিপ্লববাদীর চেষ্টায় এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তিনিও আত্মগোপন করেন। কে এই বোমা নিক্ষেপকারী? কাহারা এই বোমা নিক্ষেপকারীর পশ্চাতে?

সুপ্ত বৃটিশ সিংহের নিদ্রা ছুটিয়া গেল। এ কেবল সমগ্র বৃটিশ ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, প্রধান রাজপ্রতিনিধির প্রাণ লইয়া খেলাই নয়, এ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে আঘাত। এ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। সমগ্র সাম্রাজ্যের বৈদ্যুতিক চাপ তীব্র হইয়া উঠিল। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত, বৃটিশ সিংহের হুঙ্কারে মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। চারিদিকে ধরপাকড় ও অত্যাচার তীব্র হইয়া উঠিল।

ভারতের নিরীহ জনসাধারণ ভয়ে, শঙ্কায় মৃতপ্রায় ভাবে দিনযাপন করিতে লাগিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ কর্ত্তৃক যে নির্ম্মম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তখনও বহুলোকের স্মৃতি হইতে অপসৃত হয় নাই। তাহারই পুনরাভিনয়ের শঙ্কায় অনেকেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। যুবকমণ্ডলীর ধমনীতে কিন্তু রক্তস্রোতের গতি বৰ্দ্ধিত হইল—আশা আকাঙ্ক্ষায় তাহাদিগের মনের আবেগ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে একান্ত ভীরু তাহারও হৃদয়ে নব সাহস সঞ্চারিত হইল। সকলেরই মুখে ঐ এক কথা—কে এই বোমা নিক্ষেপকারী? কোন্ শক্তিমান্ পুরুষ এই বোমা নিক্ষেপকারীর পশ্চাতে? কি তার শক্তি? কতদূর তার আয়োজন? কতদিনে বন্ধন মুক্তি?

রাসবিহারীর আত্মগোপন—লাহোর ষড়যন্ত্র

এই বোমা নিক্ষেপের ফলে ভারত সরকারের গুপ্তচর-বিভাগ সমগ্র ভারতভূমি আলোড়িত করিতে লাগিলেন। এই বোমা নিক্ষেপের কয়েক মাসের মধ্যেই বোমা নিক্ষেপকারী ও বোমা নিক্ষেপকারীর পশ্চাতে যে বিপ্লবী, তাহার সন্ধান পাইলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইল এই বিপ্লবী একজন সামান্য বাঙ্গালী কেরানী রাসবিহারী বসু। কিন্তু রাসবিহারী সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছেন। রাসবিহারীর পিতা, আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত সকলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইল—যদি কোনপ্রকারে রাসবিহারীর গোপন আবাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। কখনও কখনও রাসবিহারীর সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু গুপ্তচর পৌছিবার পূর্ব্বেই রাসবিহারী অন্তর্ধান করেন। অবশেষে রাসবিহারীকে ধরিবার জন্য হুলিয়া বাহির হইল। নগরে নগরে, জনবহুল স্থানে তাঁহার আলোকচিত্র টাঙ্গান হইল। তাঁহাকে, যে কেহ ধরিয়া দিবে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। অল্প দিনের মধ্যেই পুরস্কার দ্বিগুণিত করা হইল। জীবিত বা মৃত রাসবিহারীকে ধরিবার জন্য গুপ্তচর বিভাগ আত্মনিয়োগ করিল। ফলে সামান্য কেরানী রাসবিহারী, দুঃসাহসী বিপ্লবী বলিয়া লোক সমক্ষে প্রচারিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিলেন। লোকের মুখে মুখে বহু সম্ভব অসম্ভব গল্প রচিত হইয়া নগর হইতে নগরান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। সেদিন বাঙ্গালী অবাঙ্গালী

সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রাসবিহারীর কাহিনী শুনিত। সেদিন প্রাদেশিকতা ভারতের মজ্জাকে আক্রমণ করে নাই। সকলেই রাসবিহারীকে আপনাদেরই একজন মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগেও বহু ভারতীয় কর্ম্মচারী রাসবিহারীর গুণে মুগ্ধ হইয়া সশ্রদ্ধে তাঁহার বিষয়ে গল্প করিত। কিন্তু রাসবিহারী আত্মগোপন করিয়া কি নিশ্চেষ্ট ছিলেন? না—না। রাসবিহারী একদিন কৈশোরে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য দৃঢ়চিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৈশোরের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশমাতৃকার সেবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হন নাই—বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ভাবাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই। তিনি কৈশোরের সঙ্কল্প হইতে তিলমাত্র চ্যুত হন নাই। তিনি স্পষ্টই জানিতেন, একজন রাজপুরুষ তা' তিনি যত বড়ই হউন না, তাঁহাকে হত্যা করিলে দেশ স্বাধীন হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন, এই হত্যা চেষ্টার ফলে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ইংরাজ বিস্তৃত জাল নিক্ষেপ করিবে এবং ধৃত হইলে ফাঁসীকাষ্ঠে তাঁহাকে ঝুলিতেই হইবে। একজন রাজপ্রতিনিধি—বিস্তৃত মহাসাগরের একটী জলকণা মাত্র, একজন রাসবিহারী—মহাসাগর বেষ্টিত সৈকতের একটী বালুকণা মাত্র। এ বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে সাহস দান ও সমধর্ম্মীকে আকর্ষণ। এ বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্যবাদীকে

যুদ্ধের জন্য নিমন্ত্রণ। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। এইবার তিনি সমগ্র শক্তি লইয়া আরও দৃঢ় হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন—হয় দেশ মাতৃকার মুক্তিসাধন, নতুবা মৃত্যুবরণ। গোপনে তিনি তাঁহার কার্য্য বিপুল উৎসাহে চালাইতে লাগিলেন। মাতাপিতা, ভগিনীভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দৃষ্টি স্থাপন করিলেন কেবল সম্মুখের দিকে—উদ্দেশ্যসাধনের দিকে।

চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের স্থাপয়িতা ও সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় রাসবিহারী প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

যে দিন রাসবিহারী প্রথম আমার প্রিয় শিষ্য ও সহকর্ম্মী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে সে দিনটী আজও আমার বেশ মনে পড়ে। চন্দননগরের যে ঐতিহাসিক প্রকোষ্ঠে শ্রীঅরবিন্দ কয়েক মাস পূর্ব্বে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছিলেন সেই প্রকোষ্ঠে একত্র বসিয়া আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের নিকট শ্রুত আত্ম-সমর্পণ যোগ বিষয়ে আমি ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। আমার মুখ হইতে যেন ঐশীবাণী নির্গত হইতেছিল। রাসবিহারী নীরবে সে মহতী বাণীর মধুর রস পান করিতেছিল। আমাদের আলোচনা শেষ হইতেই রাসবিহারী পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—

‘ভগবানের যন্ত্র—তাঁরই আত্মপ্রকাশ—তাই নয় কি

মতিলাল ? মাথা দুই হাতের তালুতে চাপিয়া ধরিয়া নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে হইবে। বেশ! তাই হইবে।'

মুহূর্ত্তে ডেরাডুনের সামান্য কেরানী ভগবদ্‌মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। রাসবিহারী এক বিরাট শক্তিশালী পুরুষে রূপান্তরিত হইল। সেই পুরুষসিংহই পরে ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে অদ্ভুত লীলা করিয়াছেন। তাঁহার আত্মায় অগ্নি সংযোগ হইল। রাসবিহারীর চক্ষু নব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভগবানের যন্ত্ররূপে এই বীরের প্রথম কার্য্য—দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ।

সেইদিন ভারতের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল। রাসবিহারীর পরবর্ত্তী জীবন রাসবিহারীর আত্মসমর্পন সাধনার সৌন্দর্য্যময় ইতিহাস।

রাসবিহারীর উপর হুলিয়া জারী হইবার কিছুদিন পরে রাসবিহারী মাসাবধি কাল চন্দননগরস্থ বাটীতে আত্মগোপন করেন। এইরূপ করিবার কারণ, চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত উপনিবেশ। এখানে ইংরাজ বিশেষ তৎপর হইতে পারিবে না। কিন্তু ফরাসী সরকার নিজ আন্তর্জাতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া রাসবিহারীকে ধৃত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। রাসবিহারী দুইবার ধৃত হইতে হইতে রক্ষা পান। কোন নিকট আত্মীয় বা আত্মীয়েরা অর্থ লোভে তাঁহার গোপনবাসের কথা পুলিশে বলিয়া দেন। এই আত্মীয়েরা অতীব দুর্দ্দিনে রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারীর নিকট বহুপ্রকারে উপকৃত হইয়াও অর্থ

লোভে তাঁহারই পুত্রকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। অর্থলোভ মানুষকে কত হীন, কত নীচাশয় করে, এই আত্মীয়গণ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। লোভ যে মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে, অকৃতজ্ঞ করিয়া হিংস্র পশুতে রূপান্তরিত করে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারত ইতিহাসে বহু আছে। দারার মৃত্যু, সিরাজের মৃত্যু, জালাল্ উদ্দীন খিল্‌জীর মৃত্যু ভারত ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে।

রাসবিহারীর বিপুল উৎসাহে ভারতের নানাস্থানে বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপিত হইল। পূর্ব্বে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্র আপন আপন বিপ্লবকার্য্য চালনা করিতেছিল। রাসবিহারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল কেন্দ্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইল। বীরহৃদয় বহু কর্ম্মী রাসবিহারীকে কেন্দ্র করিয়া একত্রিত হইয়া একযোগে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাসবিহারীর চেষ্টায় বিপ্লবের আগুন সৈন্যাবাস হইতে সৈন্যাবাসে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রাসবিহারীর হৃদয় আশায় নাচিয়া উঠিল।

লাহোর, কাশী, মিরাট প্রভৃতি স্থানে, সৈন্যাবাসের সৈন্যরা শুভ ইঙ্গিতের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্থির হইল, লাহোর সৈন্যাবাস প্রথমে বিদ্রোহ করিবে। এই বিদ্রোহ বিপ্লবীরা চালিত করিবে। লাহোর বিদ্রোহ সফলতার পথে অগ্রসর হইলেই, ভারতের অন্যান্য স্থানের সৈন্যাবাস বিপ্লবে যোগ দিবে। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-হোমাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিবে।

সিডিশন কমিটীর রিপোর্টে লাহোর ও কাশীর বিপ্লবকাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন প্রদেশের যুবকমণ্ডলীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ইংরাজবিরোধী বিপ্লবীদল গঠন করা ও চালিত করাই রাসবিহারী জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী দীননাথ নামক দলের জনৈক সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় লাহোর ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তৎসত্ত্বেও রাসবিহারী স্বয়ং এই বিপ্লব চালিত করেন। ইংরাজের যন্ত্রচালিত কামানের বিরুদ্ধে এ বিপ্লব সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সেদিন যদি বিশ্বাসঘাতকতা না হইত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের পুনরাভিনয় হইত। কে বলিতে পারে সেদিন ভারত দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত কি না ?

রাসবিহারী পরাজিত হইলেন। ইহাকে রাসবিহারীর পরাজয় ছাড়া আর কি বলিব ? পরাজিত হইয়াও রাসবিহারীর উদ্যম হ্রাস হয় নাই। তিনি এ পরাজয়ে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, দেশের মধ্যে বিপ্লব চালাইয়া দেশকে মুক্ত করা অসম্ভব। একজন মাত্র লোকের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি অথবা কাপুরুষতা বহুদিনের কষ্টসাধ্য উদ্যোগ নষ্ট করিয়া দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। একবিন্দু অম্লরস সমগ্র দুগ্ধকে নষ্ট করিতে সক্ষম। তিনি বুঝিলেন দেশের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। এ কথাও সত্য, দেশের মধ্যে থাকিয়া

বিপ্লবকে সাফল্য দান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। রাসবিহারী ছিলেন কর্ম্মবীর। তিনি গীতোক্ত কর্ম্মযোগে স্থিরবিশ্বাসী। নিশ্চেষ্ট হইয়া অলসভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যদি দেশের মধ্যে থাকিয়া দেশমাতৃকার মুক্তি-যজ্ঞ চালিত করিবার সামান্য মাত্র পথ তিনি উন্মুক্ত দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তখনই তিনি নূতন উদ্যমে দেশের মধ্যেই অবস্থান পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। মরণকে তিনি ভয় করেন নাই। মৃত্যুবরণ করিলেই যদি দেশমাতার দাসত্বশৃঙ্খল মোচন হইত তাহা হইলে তিনি সহস্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকার মুক্তির পথ তিনি দেখিতে পাইলেন না। কাজেই অচিরে দেশত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, নতুবা যে কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে, যে কোন দেশদ্রোহীর নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতায়, অথবা অর্থলোলুপ বৃটিশ গোয়েন্দার হস্তে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। সুতরাং তাঁহার কৈশোর স্বপ্ন বিফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় রাসবিহারী দেশত্যাগ করিলেন। দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার অর্গলবদ্ধ, কিন্তু বিদেশের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার এখনও উন্মুক্ত। সুতরাং বিদেশে যাইয়া অভীষ্টলাভের উপায় উদ্ভাবন করাই তিনি শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

রাসবিহারীর দেশত্যাগ ও জাপান গমন

কলিকাতা বন্দর হইতে জাপানী জাহাজ 'সানুকীমারু'তে রাসবিহারী ভারত ত্যাগ করেন। তাঁহাকে তুলিয়া দিবার জন্য

তাঁহার তুই সহকর্ম্মী সঙ্গে যান। একজন সহকর্ম্মী পথে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে লইবার আভাস দেন। রাসবিহারী বলিলেন—"তুর্য্যোধনের সভায় প্রবেশ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অস্ত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন? বহুদিন পূর্ব্বেই আমি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আমি কোন দিন অস্ত্র ব্যবহার করি নাই। আমার কার্য্য যদি সমাপ্ত হইয়া থাকে তবে আমি ধৃত হইব, যদি অসমাপ্ত থাকে তবে কে আমায় ধরিবে?" রাসবিহারীর উক্তি আত্মসমর্পণকারী কর্ম্মযোগীরই উপযুক্ত। নতুবা জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কে আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইতে পারে? যে মহদুদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ ও আত্মবলি দিতে পারে, স্বীয় প্রাণরক্ষায় এ নিশ্চেষ্টতা তাহারই পক্ষে সম্ভব। আমরা সামান্য ব্যক্তি, ক্ষুদ্র অসংখ্য স্বার্থদ্বারা চালিত, সর্ব্বদাই প্রাণভয়ে ভীত, আমরা এ আত্মসমর্পণের মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ। কিন্তু রাসবিহারীর এ আত্মসমর্পণ নিরর্থক হয় নাই।

রাসবিহারী জাহাজে উঠিয়া নিজ টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেন। এই টিকিট ক্রয় করিতে তাঁহার অবশিষ্ট অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। দীর্ঘ পথের যাত্রী। অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন পথে হইতে পারে। তবুও তিনি টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া কেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হইলেন, তাহা তিনি নিজেও জানেন না। কোন ঐশী-শক্তি যেন ইহা করাইয়া লইল। তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে

জাহাজে তুলিয়া দিয়া তীরে অবতরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন, রাসবিহারী নিজ কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জাহাজ ছাড়িতে আর অল্পক্ষণই বাকী। সহসা জাহাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা মৃদু অথচ উত্তেজিত গুঞ্জন সমগ্র জাহাজময় ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশ অধ্যক্ষ টেগার্ড কর্ম্মচারীসহ জাহাজে উঠিয়া আসিলেন। তিনি প্রতিটী যাত্রীকে পরিদর্শন করিলেন, সকল কেবিনই পরীক্ষা করিলেন। কেবল রাস-বিহারীর কেবিন তিনি পরীক্ষা করিলেন না। রাসবিহারীর কেবিন ও জাহাজের অধ্যক্ষের কেবিন পাশাপাশি। রাসবিহারীর কর্ণে জাহাজের অধ্যক্ষ ও টেগার্ডের আলোচনা স্পষ্ট প্রবেশ করিতেছিল। কক্ষের মধ্যে রাসবিহারী নিশ্চেষ্ট—সূক্ষ্ম সূতায় তাঁহার জীবন দোদুল্যমান। অবশেষে টেগার্ড জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন। জাহাজ দুলিয়া উঠিল ও গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। রাসবিহারী অভিভূত হইয়া কক্ষের গবাক্ষ পথে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। এ অশ্রু নিবেদন কার পাদপদ্মে? রাসবিহারী কি ভাবিতেছিলেন? রাসবিহারী কি ভাবিতে-ছিলেন,—"ভুবনমোহিনী ভারতমাতা! তোমার এ অধম সন্তান শৈশবে মাতৃহারা হয়েও মাতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত হয় নি। এক স্নেহশীলা নারীর মাতৃস্নেহে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হচ্ছিল সে। তাকে যখন তুমি কেড়ে নিলে মা, মনে করলাম তোমার সেবার ক্রটী হচ্ছিল ব'লে তুমি আমায় রিক্ত করলে যেন আমি

আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমার মুক্তি যজ্ঞ করি। আজ আবার তোমার অক্ষম সন্তানকে তোমার কোল থেকে দূরে সরিয়ে দিলে মা! আজ আমি সহায়সম্বলহীন, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন। জানি মা, আর তোমার কোলে ফিরে তোমার অমিয় স্নেহধারা পান করবার ভাগ্য হবে না, তবুও তোমার মুক্তিই আমার জপ, তপ, ইহকাল, পরকাল। মা! তোমার অনেক অর্থশালী, ক্ষমতাপন্ন, বিদ্বান, বুদ্ধিমান সন্তান আছে, তবুও এই অধম সন্তানের প্রতি তোমার অগাধ স্নেহ। তাই তোমার কার্য্য সাধনের জন্য এই অভাগাকে তুমি নির্ব্বাচন করেছিলে তোমার সুপ্ত সন্তানদের জাগিয়ে তুলতে। যেখানে যেভাবে থাকি, তোমার মুক্তি ছাড়া আমার অন্য কাম্য নাই ও থাকবে না। যে ব্রতে তুমি দীক্ষিত করেছ, তা' থেকে আমি একপদও সরে দাঁড়াব না মা! বন্দেমাতরম্।"

আমরা জানি না তিনি কি ভাবিতেছিলেন—কিন্তু তাঁর পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে রাসবিহারী, নেতাজীর সঙ্গে একত্রে যে সঙ্কল্পবাণী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অনুমানের অনুকূলেই সাক্ষ্য দেয়। সে বাণী:

ভারতমাতা! তোমার সেবা ব্রতে আমরা দীক্ষিত। আমাদের শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত তোমার মুক্তিযজ্ঞে ব্যয়িত হইবে। যতক্ষণ আমাদের শেষ সন্তানটী জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ আমাদের গৃহের একখণ্ড ইষ্টক থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মুক্তির জন্য

আমরা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিব। মা! ত্বরায় কোন প্রয়োজন নাই, তোমার সুবিধামত তুমি ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করিও। যদি মাসের পর মাস আবশ্যক হয় আমরা তোমার মুক্তি যুদ্ধ চালাইব, যদি বৎসরের পর বৎসর দরকার হয় আমরা অক্লান্তভাবে তোমার জন্য যুদ্ধ করিব। আজকে যে শিশু সে আগামীকাল তোমার মুক্তি সৈনিক। মা! আমাদের এই ঐকান্তিক পূজা গ্রহণ কর। আমাদের সকল শক্তি, সকল আশা, সকল আনন্দ সকল দুঃখ তোমার প্রেমে নিমজ্জিত হউক। তোমার অক্ষম সন্তানদের পূর্ব্ব ভুলভ্রান্তি ক্ষমা কর মা। তাদের তোমার গরিমায় উজ্জ্বল কর মা। তাদের তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও মা। তাদের মৃতদেহের উপর বিজয়ী হইয়া নবরঙ্গে তুমি নৃত্য কর। তুমি জাগো! তুমি জাগো! আমাদের আত্মবলি তোমার বন্ধন মোচন করুক। বন্দেমাতরম্!

যাহা হউক—ছদ্ম নাম, পি, এন, ঠাকুর গ্রহণ করিয়া রাসবিহারীকে দেশত্যাগ করিতে হয়। কিভাবে তিনি আত্মগোপন করিয়া ষড়যন্ত্র চালিত করেন ও কি উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি পলাইতে সক্ষম হন সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। নানাপ্রকার রোমাঞ্চকর কাহিনী নানা লোকে প্রচার করিয়াছেন। তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা অতীব দুরূহ।

তাঁহার জাপান যাত্রা অতি বিপদসঙ্কুল ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। জাপান ও চীনে অস্ত্র সংগ্রহ করিবার সুযোগের বিশেষ সম্ভাবনা অনুমান করিয়াই তিনি জাপান অভিমুখে রওনা হন। শুনিয়াছি,

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ সম্পত্তি বন্ধক দিয়া তাঁহাকে জাপান যাইবার পাথেয় দেন এবং তাঁহার পথের দাবীর নায়কচিত্র রাসবিহারীর চরিত্রের অনুকরণে লিখিত।

১২ই মে, ১৯১৫ সালে ২৯ বৎসর বয়স্ক রাসবিহারীকে লইয়া জাপানী জাহাজ 'সানুকীমারু' কলিকাতা ত্যাগ করে। এই জাহাজ ২২শে মে, ১৯১৫ সাল সিঙ্গাপুর স্পর্শ করে। সেই দিনই অপেক্ষাকৃত একটী ছোট জাহাজ 'বানাইমারু' এক জাপানী বিপ্লবীকে বহন করিয়া এই সিঙ্গাপুর স্পর্শ করে। এই জাপানী বিপ্লবী বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম দর্শনের সহায়তায় পাশ্চাত্য সভ্যতার মেরুদণ্ড নিষ্পেষিত করিবার মানসে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত করিতে ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁর সে আশা আজও অপূর্ণ, কিন্তু তিনি ভগ্নোত্যম হন নাই। আজও তিনি সেই যুদ্ধই চালাইয়া যাইতেছেন। সেদিন কে জানিত যে এই জাপানী বিপ্লবী ৬১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় বসিয়া ভারতীয় দুই কর্ম্মবীরের ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হইবেন। এই জাপানী বিপ্লবী ডাক্তার অশোয়া। তিনি রাসবিহারীর শ্বশ্রু-মাতা শ্রীমতী কোকো সোমার জাপানী ভাষায় লিখিত রাসবিহারীর জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজীতে 'জাপানে দুই ভারতীয় মহামানব' নামক পুস্তক রচনা করিয়া চলিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয় বহুস্থানে বহুলোক খণ্ড খণ্ড ভাবে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু রাসবিহারীর বিষয় তদ্রূপ আলোচিত হয় নাই। এ আলোচনা না হইবার কারণ একাধিক। ডাক্তার

অশোয়া নিজে বৈদান্তিক পণ্ডিত এবং আয়ুর্ব্বেদ মতে জাপানে তাঁহার স্বাস্থ্যাশ্রম আছে। তিনি বলেন—

"ধর্ম্মমাত্রেই মনোবিজ্ঞান, কিন্তু সেইটাই যথেষ্ট নয়। তার চেয়ে অনেক বড় মানবপ্রকৃতি-বিজ্ঞান। আর সেই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে তাহা কঠিন। আবার তার চেয়েও বড় সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, সহজ কথায় বলা যাইতে পারে বিশ্বের গঠন ও নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞান। এইটাই হইল বৈদান্তিক দর্শনের প্রতিপাদ্য। মহামানবতার পূর্ণ বিকাশের পথ নির্ণয় করে এই বিজ্ঞান।

তিনি আরও বলেন—"তোমার বিপক্ষ তোমাকে ধ্বংস করিবার জন্য যে অস্ত্র প্রয়োগ করে তুমিও যদি সেই অস্ত্র প্রয়োগ কর, তবে তুমি বৈদান্তিক ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই, তুমি বৈদান্তিক শাস্ত্র পাঠ করিয়াও বৈদান্তিক ধর্ম্ম হইতে স্খলিত।" অতি সত্য কথা—জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের চরম অবস্থার কথা। গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর ভেদের কথা আছে এবং স্তর ভেদে কর্ম্ম ভেদের কথাও আছে। বিপ্লবীদের জ্ঞানপন্থীদের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিলে চলিবে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাপক্ষ ছিল না, কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা ছিল না তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁহার অস্ত্রধারণের আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু অর্জ্জুনের পক্ষে তাহা মোহমাত্র। তিনি জ্ঞানের সেই পর্য্যায় পৌঁছান নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন—এই স্তরের ভিতর দিয়া অর্জ্জুনের পার হইবার প্রয়োজন ছিল।

বুদ্ধদেব, মহাবীর, শঙ্কর, নানক, কবীর, মাধ্বাচার্য্য, রামানুজ, রামদাস, চৈতন্য ইঁহারাও মহাপুরুষ; আবার অশোক, রাণা প্রতাপ, মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, নানাসাহেব ইঁহারাও মহাপুরুষ। এই দুই জাতীয় মহাপুরুষের সেতুস্বরূপ মহাত্মা গান্ধী। রাসবিহারী ও অন্যান্য বিপ্লবীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যুগানুসারে মানবকল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ মহাপুরুষের লক্ষণ।

দেহ ও মনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। দেহ যদি ক্লিষ্ট থাকে মনের বিকাশ অসম্ভব। তাই দেহকে সুস্থ সবল করার একান্ত প্রয়োজন। দেশ যখন নানাপ্রকার অত্যাচারের তাড়নায় ক্লিষ্ট তখন মানব মনের বিকাশ বা উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব। সে যুগের মহামানবদের কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রথম এই অত্যাচার বিদূরিত করিয়া দেশের মধ্যে স্বাধীনতা স্থাপন,—শান্তিস্থাপন। জীবনধারণের জন্য, বাঁচিবার জন্য চাই,—অন্ন, জল, বস্ত্র, বাসগৃহ, নিরুপদ্রব সরল জীবনযাত্রা। দেশের কল্যাণের জন্য যে শান্তিময় ঈর্ষাদ্বেষ-শূন্য অবস্থার প্রয়োজন, তাহারই জন্য এই তথাকথিত বিপ্লবীরা সর্ব্বস্ব দান করিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোনপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ ছিল না—কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা ছিল না। প্রত্যেক বিপ্লবী ছিলেন মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। দেশ বলিতে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন কোটী কোটী মানবের কল্যাণ। এই মহৎ আদর্শই তাঁহাদের আত্মাহুতি দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

ডাক্তার অশোয়া এ কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁর মনের

গভীরতম প্রদেশে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি রাসবিহারী বা নেতাজীর চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন ও তাঁহাদের জীবনকথা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রাসবিহারীর বাল্য ও যৌবনের লীলাভূমি ভারত, যৌবনের শেষাংশের ও প্রৌঢ়কালের লীলাভূমি জাপান, বার্দ্ধক্যের লীলাভূমি শ্যাম, বর্ম্মা ও সিঙ্গাপুর। ডাক্তার অশোয়া জাপানে রাসবিহারীর জীবনাংশ ভারতীয়দের নিকট তুলিয়া ধরিয়া ভারতীয়মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

রাসবিহারীর বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকারের অভিযোগ

দিল্লী:তে হার্ডিঞ্জ বোমা মকদ্দমার শুনানী হয়। এই মকদ্দমায় বোমা নিক্ষেপকারী বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, যখন বিচারালয়ের মধ্যে বসন্তবিহারী ও অন্যান্য অপরাধীর বিচার চলিতেছিল, একদিন রাসবিহারী স্বয়ং এই বিচারালয়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। বহুলোক বিচারালয়ে এই বিচার দেখিতে আসিতেন এবং সেদিনও আসিয়াছিলেন। রাসবিহারী স্বহস্তে লিখিয়া এক বিবৃতি বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন। বিচারক রাসবিহারীর হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর দেখিয়া চমকিত হইলেন। তখনই তিনি কোর্টের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া রাসবিহারীর অনুসন্ধান করেন। কিন্তু রাসবিহারী তখন বিচারালয় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র দিল্লী নগরী অনুসন্ধান করিয়াও রাসবিহারীর সন্ধান মিলে

নাই। এ কাহিনীর ভিতর কতদূর সত্য আছে জানি না, কিন্তু তাৎকালিক দিল্লী প্রবাসী বহু বাঙ্গালীর মুখে এ কথা শুনা যাইত।

তাৎকালিক শিমলাস্থ সি. আই. ডি বিভাগের শ্রীব্যানার্জ্জীকে একদিন রাসবিহারীর মধ্যম ভ্রাতা এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি সংক্ষেপে উত্তর দেন—"রাসবিহারীর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। রাসবিহারীর ভয় বলিয়া কোন জিনিষ নাই।" এ ঠিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নয়, তবুও উদ্ধৃত করিলাম তার কারণ উচ্চতম পুলিশ কর্ম্মচারীরাও রাসবিহারী সম্বন্ধে যে ধারণা রাখিতেন তাহাই পরিস্ফুট করিবার জন্য।

দিল্লীর বিচারালয়ে রাসবিহারীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হয় তার সংক্ষিপ্তসার ভারতের প্রায় সকল দৈনিক সংবাদপত্রে বাহির হয়। রাসবিহারী ধৃত হন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি ধৃত হন ও মকদ্দমা চালাইবার প্রয়োজন হয়, সেই জন্য রাসবিহারীর পিতা এই মকদ্দমায় রাসবিহারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত নথিপত্র সংগ্রহ মানসে তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রীহরিচরণ ঘোষাল:কে দিল্লী প্রেরণ করেন। এই ঘোষাল মহাশয় রাসবিহারীর পিতার অধীন একজন কর্ম্মচারী। রাসবিহারীর পিতার দুর্দ্দিনে ইংরাজ সরকারের ভয়ে সকলেই প্রায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সামান্য শিক্ষিত অল্প বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারী রাসবিহারীর পিতাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিনোদবিহারী যে সকল

নথিপত্র সংগ্রহ করেন তাহা শিমলার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের সময় নষ্ট করেন। তখন আর সে সকল নথিপত্রের আবশ্যকতা তিনি অনুভব করেন নাই। রাসবিহারী তখন নিরাপদে জাপানে পৌঁছিয়াছেন এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন।

রাসবিহারীর বিরুদ্ধে তিনটী অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং এই তিন অভিযোগের একত্র বিচার হয়।

প্রথম—প্রতিষ্ঠিত রাজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, যাহার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির উচ্ছেদ।

দ্বিতীয়—ফৌজদারী আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে নরহত্যার অপরাধ।

তৃতীয়—বিস্ফোরক আইন অমান্য করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক বস্তু সংগ্রহ করা, বিস্ফোরক বোমা প্রস্তুত ও ব্যবহার করা এবং আইন অমান্য করিয়া অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করা।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে পলাতক রাজনৈতিক অপরাধী প্রত্যর্পণ সম্পর্কীয় যে চুক্তি আছে তাহার বলেই ইংরাজ সরকার চন্দননগরস্থিত ফরাসী সরকারকে রাসবিহারীকে ধৃত করিয়া প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করে। অবশ্য রাসবিহারী ধৃত হন নাই। রাসবিহারী ফরাসী প্রজা এবং এই আইন ফরাসী প্রজার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে কি না, সে বিচার ফরাসী সরকার করেন নাই।

ফরাসী সরকার যখন রাসবিহারীকে ধরিতে ইংরাজকে সাহায্য করেন, শ্রীঅরবিন্দ তখন পণ্ডিচারীতে। ফরাসী

সরকারের এই অন্যায় আদেশ যাহাতে রাসবিহারী ধৃত হইবার পূর্ব্বেই প্রত্যাহৃত হয় তাহার চেষ্টা করিবার জন্য তিনি শ্রীমতিলাল রায়কে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লেখেন এবং এ বিষয়ে স্বয়ং সহায়তা করিতেও স্বীকৃত হন। অবিলম্বে যাহাতে ফরাসী কোর্ট অব কাসেসনের নিকট আবেদন করা হয় ও তাহার আদেশ গ্রহণ করা হয় সে জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ কাজ কে করিবে? করিতে পারেন একমাত্র রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী। বিনোদবিহারী তখন শিমলায় এবং তখনও তিনি ইংরাজ সরকারের কর্ম্মচারী। অন্য নিকট আত্মীয় কে এ দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লইবে? এ আবেদনের জন্য যে প্রচুর অর্থের আবশ্যক তাহা কোথা হইতে আসিবে? কাজেই এ আবেদন জল্পনা কল্পনায় রহিয়া যায়। রাসবিহারীর দেশত্যাগের সংবাদ তাহার বন্ধুরা অল্প দিনের মধ্যেই জানিতে পারেন—কাজেই এ চেষ্টা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

রাসবিহারীর দেশত্যাগের উদ্দেশ্য ও জাপান যাত্রার কারণ।

প্রাণের মমতা কাহার নাই? দৈহিক কষ্টের ভয় ও প্রাণের মমতাই তো মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। এ হেন প্রাণের মমতা মানুষ ত্যাগ করে। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় কত লোকই তো আত্মহত্যা করে। ঐহিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যখন নিজকে মিলাইতে না পারিয়া মানুষ দিশেহারা হইয়া পড়ে, মান

মর্য্যাদা সম্ভ্রম রক্ষার পথ খুঁজিয়া পায় না, অথবা নির্য্যাতনের মাত্রা যখন সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন মানুষ মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দেয়। এ শ্রেণীর মৃত্যুবরণ প্রতিদিনের সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। এ মৃত্যুবরণ—মৃত্যুর নিকট পরাজয়। কাজেই হিন্দুর কাছে এ মৃত্যু অধর্ম্ম।

যাঁহারা মহান আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁহারা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হন ; পথে যদি মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সে মৃত্যু তাঁহারা বরণ করিয়া লন—তথাপি আদর্শচ্যুত হন না। এরূপ দৃষ্টান্ত অল্প হইলেও বিরল নয়। শিখ সর্দ্দার বন্দা, শিখগুরু তেজবাহাদুর সিংহ, রাজা নন্দকুমার ও বিপ্লবী যুগের ক্ষুদিরাম বসু, কানাই দত্ত, সত্যেন্দ্র বসু প্রভৃতি এ মৃত্যুবরণের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। ইঁহারা কেহই মৃত্যুকে আগত দেখিয়া কাতর হন নাই। ইঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ। কে এমন ভারতীয় আছে যে এই সকল মহান ব্যক্তির নাম স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নত করিবে না ?

রাসবিহারীকে এ গৌরব হইতে বঞ্চিত দেখিয়া সেকালে অনেকের মনে ব্যথা জাগিয়াছে। তাঁহাদের মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়াছে, নির্ভীক রাসবিহারী যেন অবশেষে প্রাণের মমতার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। রাসবিহারীর চরিত্র অনুধাবনের জন্য এ সন্দেহের মীমাংসা আবশ্যক। অথচ

এ সন্দেহ ভঞ্জনের অন্তরায় বহু। রাসবিহারী দেশত্যাগ করিবার পর আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সুযোগ পান নাই। বিদেশে কেহ তাঁহাকে এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন কিনা, এবং এ প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই শেষের দিকে তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। যাঁহারা তাঁহার দেশত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সংস্পর্শে ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই মৃত। এ বিষয়ে পরলোকগত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত রাসবিহারীর ভ্রাতার যে আলোচনা হয় আমরা তাহা পরে উদ্ধৃত করিব। এ আলোচনা দুই একটী বিষয়ে আলোকপাত করিবে। কিন্তু অন্য উপায়েও আমরা মীমাংসা করিতে পারি ও নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

যে বালকের একবার অগ্নিতে অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়াছে, সে অগ্নি হইতে দূরে থাকে। হার্ডিঞ্জ বোমা ব্যাপারে ইংরাজ সরকার যেরূপ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন তাঁহার তাহা ভুলিবার কথা নয়। কিন্তু রাসবিহারী এই পশ্চাদ্ধাবন অগ্রাহ্য করিয়া, লাহোর ও কাশী ষড়যন্ত্র চালনা করিয়াছিলেন। প্রাণ ভয়ে পীড়িত পুরুষ কখনও এরূপ নির্ভীকভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন না। এ ষড়যন্ত্র বিফল হইলে তিনি ছদ্মনামে ও পরিচয়ে জাপান যাত্রা করেন। সেখানে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া সচ্ছন্দে তিনি জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। জাপানের ভূমিতে পদার্পণ করিতে না

RASH BEHARI BOSE
70 SANCHOME ONDEN
SHIBUYA KU TOKYO
JAPAN

TELEPHONE AOYAMA 56 0404

TOKYO, July 17, 1937.

My dear Bijon,

Your letter of the 14th ultimo reached me last night. I am exceedingly glad to get the pictures, and your photo resembled our dear father very clearly. Indeed I have not seen you all for more than 25 years, and it is natural that I should long to see you. But it all depends upon the will of the Lord Almighty.

As desired by Bowma, I am sending to you separately a photo- myself, my son Masahide and my daughter Tetsu. We are all well. My son is now in the fifth year class of the Middle School, and he will enter the University next year. My daughter is now in the third year class of the Girls Higher School. Their mother studied the Bengalee, but after her death nobody could teach the children the Bengalee.

I also received information from Aris that Fachu was going to be married shortly. But Fachu has not written to me about it as yet. It is no use quarrelling over petty matters like this. If possible, you should go down to Calcutta and be present at the ceremony, if my letter reaches you before the date of the marriage. Tell Bowma not to feel offended even if the invitation did not come directly from Fachu, which he ought to have done. We must all live and work with high ideals in our respective spheres. Small and insignificant matters should not make us lose our temper. We must be broad-minded, and show our example to others.

Do you correspond with Sushila? If not, do so please. If your financial condition permits, remit to her some times Ten Rupees or so. She will no doubt be glad. Who is now living in our house? I think it was rented. If so, what happened to the rent-money? I think Sushila could now and then be helped out of the rent to a certain extent. What is your opinion? If you agree, you can take necessary steps to effect it.

With love and blessings to you all,

Yours affectionately,

Rash Behari Bose

My dearest Biman,

I am so glad to get your letter of the 14th ultimo. Please do now and then write to me. What are you studying now? In what class you are now? Yes, when you are old enough, you must come to me. Your cousins are now in higher School here. They are learning English also, as it is a compulsory subject here. For everybody, the first important thing is health, next personality, and the last education. When you come here, I shall tell you many other things of life. Give my affectionately blessings to your mother and Bimal. Japan is a nice place. The climate is good and the country is full of beautiful sceneries in mountains, lakes, rivers and oceans. The people are extremely patriotic, clean, modest, brave, and spiritual. When you grow up, you will understand Japan. Now it is summer here, but the temperature seldom goes up more than ninety degrees. Generally it varies between 80 and 90 in day time, and 70 and 80 in night time. Try to be as patriotic, clean, modest, brave and spiritual as the Japanese.

Your affectionately uncle,

Rash Behari Bose

রাসবিহারীর পত্রের প্রতিলিপি

করিতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতরণ করেন এবং পুনরায় মৃত্যুর সম্মুখীন হন। সেবারও অতি অদ্ভুত উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। এ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই তিনি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তিনি ভারতমাতার অজেয় মুক্তি-সেনানায়ক। মৃত্যু বার বার দ্বারে করাঘাত করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যতদিন না তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধিলাভ করিয়াছে ততদিন তিনি যেন মৃত্যুকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল রায়ের রাসবিহারীর সম্বন্ধে উক্তিতে আমরা পূর্ব্বেই শ্রীশচন্দ্র ঘোষের পরিচয় পাইয়াছি। এই বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ছিলেন রাসবিহারীর আবাল্য বন্ধু। বিনোদবিহারীর পরিবারের মধ্যে শ্রীশচন্দ্রের স্থান ছিল অতি উচ্চে। চন্দননগরস্থ শ্রীচারু চন্দ্র রায়কে যখন চতুরতা করিয়া বৃটিশ সরকার আটক করিয়া রাখে, তখন শ্রীশচন্দ্র চারু রায়ের পরিবারবর্গকে প্রতিপালনের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন ও ফিরি করিয়া তাঁতের কাপড় ও গামছা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা দিয়া এই রায় পরিবারের সাহায্য করিতেন। ইনি মেদিনীপুর জেলে বহুদিন আবদ্ধ ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র শুধু রাসবিহারীর বন্ধু ছিলেন না, বিনোদবিহারীর মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শেষকৃত্য সমাপনে সহায়তা করেন ও পরে বিনোদবিহারীর পুত্রদের সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শদাতা ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রও বিনোদ বিহারীর পুত্রদের ভ্রাতৃসম স্নেহ করিতেন। ১৯২৪ সালে

বিনোদবিহারীর মধ্যম পুত্র বিজনবিহারী যখন কাঁচড়াপাড়ায় চাকুরী করিতেন তখন বহু সময় বিজনবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র একত্রিত হইয়া পুরাতন দিনের কথা লইয়া আলাপ করিতেন। অতীত দিনের স্মৃতি এমনই মধুর, দুঃখের দিনের স্মৃতি মধুরতম।

বহুপূর্ব্বের কথা তুলিব না। বাঙ্গালীর জীবনে—শুধু বাঙ্গালীর নহে—সমগ্র ভারতবাসীর জাগরণের সূচনা হইয়াছিল —মহামতি তিলক, বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মহাত্মাদিগের আপ্রাণ চেষ্টায়। সুপ্তোত্থিত ভারতবাসী দেখিল, পূর্ব্বগগনে স্বাধীনতার মনোরম সমুজ্জ্বল ভাতির অপূর্ব্ব ছটা। তাহারই বিকাশের ফল ক্রমশঃ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

বহুদিনই বিজনবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে রাসবিহারীর পলায়ন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র সে সকল প্রশ্ন উঠিলেই অন্য কথা বলিয়া বিষয়টা চাপা দিতেন। একদিন বিজনবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে চাপিয়া ধরিলেন।

বিজনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"দাদা দেশত্যাগ করিলেন কি প্রাণের মায়ায়, মৃত্যুর ভয়ে?" এরূপভাবে পূর্ব্বে কখনও বিজন বিহারী শ্রীশকে প্রশ্ন করেন নাই।

শ্রীশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—"অর্থাৎ?" শ্রীশচন্দ্রের চক্ষুতে তীব্র ভর্ৎসনা ফুটিয়া উঠিল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বিজনবিহারী বলিলেন—

"অনেকেই ত ভাবাবেগে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন, আবার জেল খাটিয়া, পুলিশের তাড়া পাইয়া মতটা বদলে ফেলেছেন—

কেউ কেউ দেশের স্বাধীনতার জন্য কঠোর যোগ সাধনা সুরু করেছেন, কেউ কেউ বা বিদেশ থেকে ঘুরে এসে বড় সরকারী চাকুরীও করিতেছেন, এবং দেশের লোককে উৎপীড়নও করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীশ হো হো করিয়া উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল তীব্র বিদ্রূপ। হাসি থামিলে বলিলেন—

"তোমার মন্তব্য অপরিণামদর্শীর মত। কতকগুলা বিচার বুদ্ধিহীন লোকের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি, তিন এক নয়। মানুষ যদি বোঝে যে তার শক্তির অভাব আছে তাহলে পথ বদলান তো উচিত। অনেকের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকে কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার মত দীর্ঘ সাধনার শক্তি থাকে না। যে মুহূর্ত্তে এই কথাটা বুঝতে পারে সেই মুহূর্ত্তেই ত তার পথ পরিবর্ত্তন করা উচিত। এটা দোষের নয়। তোমার গণিত শাস্ত্র আয়ত্ত করবার মত মস্তিষ্ক নাই তুমি তাহার পিছনে পড়িয়া থাকিলে কি লাভ হইবে ?

বিজনবিহারী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা তুমি দাদার কথাই বল। তিনি কি প্রাণভয়ে পালালেন।"

শ্রীশ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"লোকে তাই বলে বটে"। বিজনবিহারী শ্রীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের চক্ষু মিলিত হইলে শ্রীশ প্রশ্ন করিলেন—"কেন ? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

বিজনবিহারী বলিলেন—"না। কারণ তা হলে তিনি লাহোর ষড়যন্ত্র হইতে দূরে থাকিতেন।

শ্রীশ বলিলেন—"তা বটে! কিন্তু লোকের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?"

বিজনবিহারী বলিলেন—"লোকে কি বলে তা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।"

শ্রীশের চক্ষুতে কৌতুক ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"কেন, ইংরাজের সতর্কদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালানোর মধ্যে কম বাহাদুরী কিসে? আর প্রাণভয়ে পালালেন কি না, একথার এখন কোন মূল্য আছে কি? পালালেন একথাটা তো আর মিথ্যা নয়।"

বিজনবিহারী নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র বিজনবিহারীকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"তোর অহঙ্কারে বাধছে, না? বুঝিরে বুঝি, তোর আঘাত কোনখানে বুঝি।"

বিজনবিহারী বলিলেন—"ছাই বোঝ? কেবল কথার ফাঁকি জান?"

অবশেষে শ্রীশ বলিলেন—"না। কোন স্বেচ্ছাসেবকই মরণকে ভয় পায় না। মৃত্যুকে জয় কর্ত্তে না পারলে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া যায় না। অগ্নি যজ্ঞে যারা নামে তাদের আগুনকে ভয় পেলে চলবে কেন? তুই ঠিকই অনুমান করেছিস্, রাসবিহারী মরণের ভয়ে দেশত্যাগ করে নাই।"

বিজনবিহারীর বুকের উপর হইতে একটা বিশ মন ভারী বোঝা যেন নামিয়া গেল। তিনি আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"তবে পালালেন কেন?"

শ্রীশ বলিলেন—"শুধু শুধু ফাঁসী কাষ্ঠে মাথা গলালে কি ফল হতো? আর যদি চরম দণ্ডই না হতো, জেলে পচিলে বা আন্দামানে অন্তরীন হলেই বা কি লাভ হতো?"

ক্ষণপরে শ্রীশ আরম্ভ করিলেন—লাহোর ষড়যন্ত্র রাসবিহারীর একটা বিরাট কল্পনা। এই ষড়যন্ত্রে সে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল। এ ষড়যন্ত্র ফেঁসে যাবার পর রাসবিহারীর বন্ধুরা রাসবিহারীকে দেশত্যাগ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু রাসবিহারী একেবারে চুপচাপ। রাসবিহারী অসাড়। হাঁ-না কোন জবাবই সে দিত না। রাসবিহারীকে ঘিরে সর্ব্বদাই কয়েকজন পালা করে পাহারা দিত। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে রাসবিহারী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো; ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ইদানিং রাসবিহারীকে নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছিল। যাহারা কাছে ছিল সকলেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। সকলেই রাসবিহারীকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ রাসবিহারী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো—"দেশত্যাগ করাই ঠিক। দেশের মধ্যে থেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানো প্রায় অসম্ভব। আর সম্ভব হ'লেও আংশিকভাবে সম্ভব। দুঃখ, এই মহাযুদ্ধের সুযোগ আমরা নিতে পারলাম না। ভারতের কংগ্রেস নেতারা এ যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করেই

চলেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন ইংরেজ তাদের হাতে মোয়া তুলে দেবেন। যত সব—। যাক একবার যতীনদের খবর দিতে পারিস শিরে?" রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার মতলব কি?" রাসবিহারীর উত্তর আসিল—"ভেবে দেখলাম দেশের ভিতর থেকে আমরা যত তীব্র আন্দোলন চালাই না কেন, তাতে দেশকে বৃটিশের হাত থেকে মুক্ত করতে কিছুতেই পারব না! যদি দেশের মধ্যে থেকে আন্দোলনে যথেষ্ট ফল পাওয়া যেতো তাহলে দেশ ছেড়ে কিছুতেই যেতাম না। যেমন করেই হোক মাটি কামড়ে পড়ে থাকতাম। কিন্তু লাহোর আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে দেশের ভিতরে থেকে যথেষ্ট কাজ করা সম্ভব নয়। বাহিরে থেকে আক্রমণ দরকার, বাহিরের সাহায্যও দরকার।" একজন বলিয়া উঠিল—"সে তো পরের কথা, কিন্তু ক্রমাগত লুকিয়ে থেকে কাজ করাও তো মুস্কিল। আপনি জার্ম্মানী চলে যান। সেখানে পৌঁছুতে পারলে আর ভয় নাই—আমাদের দলও সেখানে আছে। আগে তো নিজে রক্ষা পান, তখন কাজ করবার জন্য অনেক সময় পাবেন।" রাসবিহারী হুঙ্কার দিয়া উঠিল—"আমার মরা বাঁচা কি আমার হাতে না কি? আমার সহকর্ম্মীরা যদি মরণ বেছে নিতে পারে তো আমি পারবো না কেন? তবে নিরর্থক প্রাণ দিতে আমি রাজী নই। ফাঁসীর মাচায় দাঁড়িয়ে বাহাদুরী করতে আমি লজ্জা বোধ করি। হেরে গেছি হেরে গেছি, ব্যস।" ধমক খাইয়া সকলে চুপ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে জার্ম্মাণী যাওয়াই তো ঠিক ?"

রাসবিহারী বলিল—"না—জার্ম্মাণী নয়। জার্ম্মাণীতে কাজ করিবার জন্য বহুলোক গিয়াছে ও আছে। আমি মনে করি পশ্চিম—পশ্চিমই। গলা কাটতে পারলে কেউ ছাড়ে না—পশ্চিম তো ছাড়বেই না। বিপ্লব শিখবার স্থান রুশ। কিন্তু সেখানে যাওয়া দুরূহ। পূর্ব্বদিকে যাব মনে করেছি। পূর্ব্বে যেতে পারলে ভাল হয়। পূর্ব্বে যাওয়াও সহজ। পূর্ব্বের সঙ্গে আমাদের অনেক রকমের মিল আছে। ইচ্ছা করলে চীন ও জাপান আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারে। জাপানী ওকাকুরার মত লোক জাপানে আরও আছে। ইংরেজের মত জাপানের আমাদের উপর বিদ্বেষ না থাকাই সম্ভব। জাপানেও ভারতীয় কর্ম্মীর অভাব হবে বলে মনে হয় না।"

তারপর যতীন ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গেই রাসবিহারীর আলোচনা হয়। রাসবিহারী জাপান যাওয়াই স্থির করেন। রাসবিহারী তখন শিয়ালদহ পোষ্ট অফিসের উপর আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছিলেন।

বিজনবিহারী শ্রীশকে প্রশ্ন করিলেন—"বৈদেশিক সাহায্য লওয়ায় কি বিপদ নাই? জয়চন্দ্রের কথা ভেবে দেখুন—ভেবে দেখুন জগৎশেঠ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির ভুলের কথা—ভেবে দেখুন রাণী ভবানীর সতর্কবাণী।

শ্রীশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"বিপদ নেই, সমূহ

বিপদ আছে। তোরাই ইতিহাস উল্টেছিস—আর আমরা উল্টাই নাই। বরং তোদের চেয়ে আমরা বেশী করেই উল্টেছি। কিন্তু সাহায্য লওয়ার সময় আছে—সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আর তুই কি মনে করিস্ সাহায্য চাইলেই পাওয়া যায়? ভিক্ষা করতে হলে ভেক দরকার হয়। সাহায্যের জন্যও অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্যও অপেক্ষা করতে হয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলারও শুভক্ষণ আসা চাই। ইংরেজ ও ইংরেজের প্রতিপক্ষ উভয়েই যখন শক্তিহীন হয়ে পড়বে ঠিক সেই সময়টির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এবার যদি একটা যুদ্ধ বাধে দেখে নিস্, ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আসবে। জার্ম্মাণী, আমেরিকা, রাশিয়া সর্ব্বত্রই কর্ম্মীরা দল গড়ে তুলছে। সময়ের অপেক্ষা করছে মাত্র।

বিজনবিহারী প্রশ্ন করলেন—"আমরা আজ ইংরাজের কাছে স্বাধীনতা ভিক্ষা চাইছি। শেষে সেই পরের কাছেই স্বাধীনতা ভিক্ষা করব, তফাৎ কোথায়?"

শ্রীশ বলিলেন "না, এক কথা নয়। তুই স্কুল কলেজের বইই মুখস্থ করেছিস, আর হাতুড়ি পিটেছিস; এ সব কিছুই বুঝিস না। গত যুদ্ধের সময় ভারতের সহায়তা ইংরাজ লয় নাই? তাতে তাদের লজ্জা হয় নাই? আমরাও অপরের সহায়তা লইব, এটা ঠিক। আমরা অস্ত্র-শস্ত্র লইব, লোকজন আমরাই দেবো, আমরাই স্বাধীনতার জন্য মরবো, তাদের মরতে বলবো না—আমাদের কাজে তাদের হাত দিতে দেবো না। আমাদের অর্থ,

আমাদেরই রক্ত। গত যুদ্ধে ইংরেজ আমাদের রক্তে জিতেছে। আমরা কিন্তু তা চাই না।”

বিজনবিহারী ভাবিতে লাগিলেন “এটা একটা পথ বটে। কিন্তু আমাদের লোকবল কই? আমাদের নিরক্ষর ও সাক্ষর লোকে স্বাধীনতার কতটুকু বোঝে? আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা কই? আমাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা কই? আমাদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা কই?”

শ্রীশ বলিলেন—“তোর সন্দেহের কারণ কি? আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের দুইটা দিক আছে—একটা নৈতিক আর একটা দৈহিক। তুই কি ভাবিস আমরা চিরদিন ইংরাজের জুতা বহিব। কখনও না। সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা কারও জুতা বহিব না। আমরা স্বাধীন হবই হব। দেশের ভিতরে এ বোধ হওয়ার দরকার, দেশের বাহিরেও এ মনোভাব প্রচার হওয়ার দরকার। যদি আমরা জুতা বই তো আমাদের নিজের জুতাই বইব—অপরের নয়। দ্বিতীয় কথা—আজকের দিনে, দেশের লোক লাঠি সড়কি নিয়ে তো আর গোলা-বারুদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না। কাজেই দেশের বাহিরে থেকে যোগাতে হবে অস্ত্র-শস্ত্র—দেশের বাহিরেই লোককে শেখাতে হবে এসব অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার। সুতরাং দেশের বাহিরে আমাদের দেশের লোক যারা আছে দেখতে হবে তারা কতটুকু সাহায্য করতে পারে আর কতটুকু অপরাপর দেশ সাহায্য করতে চায়। ভিতর থেকে গণ্ডগোল ও বাহির থেকে গণ্ডগোল হলে কতটুকু সময় লাগবে দেশকে

স্বাধীন করতে। তবে সবই নির্ভর করে কালের উপরে, সুযোগের উপরে। কিন্তু সুযোগ এলে তখন দেখা যাবে, না করে এখন থেকেই এমন তৈরি হয়ে থাকতে হবে যে সুযোগ এলেই 'জয় মা কালী' বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারিস!"

রাসবিহারী যে প্রাণভয়ে পলায়ন করেন নাই সেই কথাটা শ্রীশের কথায় পরিষ্কার হইয়া যায়। যতীন মুখুয্যের ও কানাইলালের মৃত্যুবরণ কথা বিজনবিহারী ভুলেন নাই। যতীনকে যখন ভারত সরকার নিরন্তর তাড়া করিয়া ফিরিতেছিল তখন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে দেশত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। যতীন তখন বিপ্লবীদের সংহতি করিতে ব্যস্ত। যতীন প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন যে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিলে তার বংশগরিমা বৃদ্ধি পাইবে বই কমিবে না। পরবর্ত্তীকালে তাঁর মৃত্যুবরণ, বীরেরই যথোপযুক্ত। শান্ত, ধীর কানাইলালের ফাঁসীর সময় কানাইলালের মৃত্যুবরণের কথা শ্রীমতিলাল ও নির্ম্মল বক্সীর মুখে বিজনবিহারী শুনিয়াছিলেন। এই মুক্তি যজ্ঞের সাধকরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তবে দেশমাতার সেবায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু যুক্তি তর্ক দ্বারা অনুধাবন এক, আর মনপ্রাণ দিয়া অনুভব আর এক। এই কথাটা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন বিজনবিহারী বহু পরে। বহুদিন পরে বিজনবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে শ্রীশ বলিলেন—"শোন একটা কথা। আমার মৃত বন্ধুদের আত্মারা কেবলই আমাকে ডাকিতেছে, বলিতেছে শ্রীশ চলিয়া এস, আমাদের সঙ্গে যোগ

দাও। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে দেশ স্বাধীন হবে না। তুমি শীঘ্র চলে এস।"

শ্রীশের কথা শুনিয়া বিজনবিহারী চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওটা তোমার নিয়ত চিন্তার ফল শ্রীশদা। তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, তুমি বরং আমার কাছে চল।" শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন—"আরে মরতে কি আমি ভয় পাই, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বাধীন মায়ের মুখ দেখতে পাব না সেইটাই আমার বড় দুঃখ রে।"

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই শ্রীশ একদিন আত্মহত্যা করেন। শুনেছি তিনি লিখে রেখে যান দেশ মুক্তির জন্য মৃত বন্ধুদের আহ্বানে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিতেছেন। কিংবদন্তী, ইনিই সেই শ্রীশ যিনি নাকি জেলের ভিতর কানাইলালকে বন্দুক দিয়া আসিয়াছিলেন।

রাসবিহারী প্রসঙ্গে ডাক্তার জিলানী পরলোকগত বিপ্লবীরই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—'রাসবিহারী কেবল পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ রোপণ করেন নাই, তিনি পূর্ব্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশেও এই বীজ বপন করেন। প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার জাগরণের মূলে বাঙ্গলার এই মহাপ্রাণ সন্তান। স্বর্গীয় সত্যমূর্ত্তি যখন জগতে ঘোষণা করেন যে বাঙ্গলা জগৎকে চিরদিন পথ দেখাইয়া আসিয়াছে তখন তিনি বাঙ্গলার তোষামদ করেন নাই, বিন্দুমাত্রও

অত্যুক্তি করেন নাই। ইন্দোনেশিয়ার ডাক্তার হাত্তা তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।'

তিনি আরও বলিয়াছেন—রাসবিহারী ধাম্মিক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন সমগ্র বিশ্বের মানবমণ্ডলী এক, তাদের একটী মাত্র ধর্ম্ম, তাদের সকলের একটী মাত্র দাবী। তাঁর কোন প্রকার গোঁড়ামী ছিল না। তিনি সকল দেশের ধর্ম্ম পুস্তক আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিতেন।

রাসবিহারী বুঝিয়াছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত। ভারতের মুক্তি সমগ্র এশিয়ার মুক্তি এবং সেই বিরাট মুক্তির জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাসবিহারীর শৈশব ও কৈশোর।

প্রাচীন সাংবাদিক স্বনামখ্যাত শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ রাসবিহারীর সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—

"বড়ই দুঃখের কথা রাসবিহারীর শৈশব ও কৈশোরের কথা কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় শৈশবে মাতৃহারা রাসবিহারী ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে আসে, বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিপ্লব পন্থা আলোচনা করে, বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেয়, ভারতের যুবকদের লইয়া বিপ্লবীদল গঠন করে, হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র করে, লাহোর ষড়যন্ত্রে মূল কর্ম্মীরূপে কার্য্য করে

ও অবশেষে বৃটিশ পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া দেশ হইতে পলায়ন করে।"

পরে রাসবিহারীর জাপান জীবন, গভীর স্বদেশ প্রেম ও আই, এন, এ, গঠনের ইতিহাস জানিতে পারিয়া হেমেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বকবি সেক্সপীয়রের কবিতার দুই কলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

It is strange—but true ; for
Truth is always strange ; Stranger
Than fiction.

অনুবাদ—"অদ্ভুত—কিন্তু সত্য ; সত্য
রবে চিরদিন অপূর্ব্ব বিস্ময় ;
গল্প, উপকথা হতে অপূর্ব্বতর।"

আরও অনেকে এই খেদই করিয়াছেন। রাসবিহারী শৈশবে মাতৃহারা বলিয়াই তাঁহারা শৈশব পরিচয় দান কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

আমাদের প্রশ্ন—কে জানিতে চাহিয়াছিল, এই দরিদ্র সন্তানের কথা? তখনকার দিনে কাহার সাহস ছিল সে বিষয়ে সন্ধান করিতে? তখনও রাসবিহারীর পিতামহ শ্রীকালীচরণ বসু জীবিত ছিলেন, রাসবিহারীর পিতা শ্রীবিনোদবিহারী জীবিত ছিলেন, রাসবিহারীর আবাল্য বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ জীবিত ছিলেন, তখনও রাসবিহারীর অন্যান্য বন্ধু, সহধ্যায়ী ও সহকর্ম্মী অনেকেই বাঁচিয়া ছিলেন—তখনও তাঁহার বিপ্লবী সাথীরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াও পড়েন নাই এবং জীবিতও ছিলেন। তখন

রাসবিহারীর জীবনীর ঐতিহাসিক বা জাতীয় মূল্য কোন্ বাঙ্গালী বা ভারতীয় অনুভব করিয়াছিল ?

রাসবিহারী নিজেই তাঁহার পলায়ন ইতিহাস ১৯২০।২১ সালে প্রবর্ত্তকে লিখিতেছিলেন—পরে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। রাসবিহারী ভারত আকাশে উল্কার মত উদিত হইয়াছিলেন—তাঁহার ঔজ্জ্বল্যে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার স্পর্শ হইতে সকলে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তখন সকলেই ভাবিয়াছিল—রাসবিহারীর কার্য্য রাসবিহারী শেষ করিয়া দেশ হইতে বিদায় লইয়াছেন আর তাঁহাকে আবশ্যক নাই। সেদিন রাসবিহারীর পরিবারবর্গ ঘরে লাঞ্ছিত, বাহিরে লাঞ্ছিত—কেহ অপ্রকাশ্যভাবেও রাসবিহারীর পরিবারবর্গের সহিত সংস্রব রাখিতে চাহিতেন না।

আজ সেই অতীত দিনের সাক্ষী বিশেষ কেহ বাঁচিয়া নাই। রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু সুবলদাহস্থ পৈত্রিক ভিটায় শেষের দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং রাসবিহারীর একজন সেবক শ্রীনরেন্দ্র নাথ সরকার জীবিত আছেন এবং বিপ্লবী বীর অমরেন্দ্র নাথও জীবিত। শুনিয়াছি তিনি অতিশয় পীড়িত। তাঁহাকে একটী বিবৃতির জন্য অনুরোধ করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া চেষ্টা করিলে কি হইত বলা যায় না। বিপ্লবী বীর যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে লিখিয়া জানিতে পারি এক অমরেন্দ্র ব্যতিরেকে রাসবিহারীর সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত আর কোন বিপ্লবী

জীবিত নাই। লেখক বিজনবিহারীও সকল কথা জানেন না এবং যাহা জানেন তাহা লোকমুখে শোনা কথা। কিছু কিছু নথিপত্র তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নষ্ট করিতে হয়। মস্তিষ্কের কোণে যেটুকু সযত্নে বহন করিয়াছেন সেটুকু পাছে নষ্ট হইয়া যায় সেই আশঙ্কায় এতদিন পরে জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার মুখে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য—বসুবংশকে যে মর্য্যাদা ও যে কর্ম্মবীজ-মন্ত্র রাসবিহারী দিয়াছেন, বসুবংশ যেন সে মর্য্যাদা ও মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে কোন কিছু পার্থিব লোভে চ্যুত না হয়। আরও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। দুঃখ হয় রাসবিহারীর কোন ভক্ত কোন দিন-পঞ্জিকা রাখিয়া যান নাই।

মানুষকে জানিতে হইলে, বিচার করিতে হইলে, জানিতে হইবে তাঁহার কুল পরিচয়, তাঁহার কৌলিক কৃষ্টি, তাঁর লীলাভূমি, পারিপার্শ্বিক স্থিতি ও বাতাবরণ, তাঁর জীবনের ঘটনা সংঘাত, তাঁর সাফল্য ও বিফলতা। আমাদেরই পুরাণে আছে মাতৃদোষে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, মাতৃগুণে বিদুর ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ। আমাদেরই শিশু শিক্ষায় আছে মাসীর অনবধানতায় ভগ্নীপুত্রের ফাঁসী। এমন কি ইহজন্মের কর্ম্মের ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দ্দেশ করিতে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ পুনঃ পুনঃ পূর্ব্ব জন্ম ধরিয়া টানাটানি করিয়াছে। কেবল স্থূল ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে কিন্তু একটী ব্যক্তি

বিশেষকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না। এরূপ চিনিবার বা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। যদি না বুঝিলাম, না জানিলাম, হৃদয় দিয়া অনুভব না করিলাম তবে তাকে আদর্শ করিব কি প্রকারে? সেই মানুষের যদি জীবন যুদ্ধ না অনুধাবন করিতে পারিলাম তবে তাহার সৎগুণ দ্বারা আকৃষ্ট হইব কি প্রকারে? যদি তার ভুল ভ্রান্তি না জানিলাম তবে সাবধান হইব কি প্রকারে?

যারা ধনীর দুলাল, যাদের পশ্চাতে আছে অসংখ্য দাসদাসী, অগণিত শিক্ষকমণ্ডলী, উচ্চ শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিবার সহস্রমুখী পথ, যাহারা অর্থ বিনিময়ে সমাজের যে কোন স্তরে নেতৃত্ব করিতে পারেন তাঁহাদের কাছে রাসবিহারীর জীবনী একটা চিত্তাকর্ষক কাহিনী মাত্র। কিন্তু যারা দরিদ্র, যারা স্বীয় পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক সাধনায় নানারূপ বিপত্তি অতিক্রম করিয়া মানব কল্যাণ সাধন করিতে ও পৃথিবীতে পদচিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প তাঁরা রাসবিহারীর জীবনে বহু বস্তু পাইবেন, বহু উৎসাহ পাইবেন। দুঃস্থ পথহারা নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত বাঙ্গালী সন্তান আশার আলোক দেখিতে পাইবেন এই রাসবিহারীর জীবনীতে।

রাসবিহারীর জন্ম হয় ২৫শে মে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সুবলদহ গ্রামে কালীচরণ বসুর পর্ণ কুটীরের সংলগ্ন গোশালায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনার ঠিক ত্রিশ বৎসর পরে ইংরাজের বিষম শত্রু জন্মগ্রহণ করলেন বাঙ্গলায় এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে, নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে। এই শিশুর পিতা তখন সুদূর

শিমলাপাহাড়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সামান্য সরকারী চাকুরী করিতেছিলেন।

রাসবিহারীর জন্ম স্মরণ করিয়ে দেয় আর এক মহামানবের জন্মের কথা। সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক মেষশালায়। পরে সমগ্র ইউরোপ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র গ্রাম রায়না থানার এলাকাভুক্ত। আজও এই গ্রামে কোন রাজপথ থাকা দূরের কথা, গোযানের উপযুক্তও কোন পথ নাই। এই গ্রামখানিকে বেষ্টন করিয়া দামোদরের খাল প্রবাহিত। এই গ্রাম তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বর হইতে অন্যূন ছয় ক্রোশ। এখন এই গ্রামে যাইতে হইলে চকদিঘী হইতে বা মোশাগ্রাম হইতে পদব্রজে যাইতে হয়। এখনও এই গ্রামের মধ্যে বা নিকটে কোন স্কুল নাই, পোষ্ট অফিস নাই, ডাক্তারখানা নাই, হাটবাজার নাই। ফলতঃ আজও সেখানে আধুনিক সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই। আজও এই গ্রামে প্রবেশ করিতে হইলে বহু নালা ও খাল পার হইতে হয়। গ্রীষ্মকালে এই সব নালা বা খালে কোথাও সামান্য জল, কোথাও একেবারে শুষ্ক। কিন্তু বর্ষায় দামোদরের বন্যায় এই ক্ষুদ্র গ্রাম একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মত জাগিয়া থাকে। তখন সহরবাসী বাবুদের পক্ষে এই গ্রামে প্রবেশ করা ওয়াটারলুর যুদ্ধের মতই কঠিন ব্যাপার।

গ্রামে ১০।১২ ঘর কায়স্থ পরিবার, একঘর ব্রাহ্মণ, একঘর কর্ম্মকার, কয়েক ঘর বাগ্দী, কয়েক ঘর উগ্রক্ষত্রিয় ও কয়েক ঘর মুসলমান বাস করে। আজও এই গ্রামের জীবন, সরল ও সুন্দর ; এখনও কোন প্রকার কৃত্রিমতা প্রবেশ করে নাই। গ্রামের

লোকেরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেও জানে। ব্রাহ্মণ শূদ্র মুসলমান প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলের নীচে পরম প্রীতিতে এই গ্রামে বাস করে। এই গ্রামই রাসবিহারীর শৈশব লীলাভূমি।

নিম্নে বসুবংশের তালিকা প্রদত্ত হইল। এই বসুবংশ প্রথমে বৈঁচীতে, পরে সিঙ্গুরে ও তারপরে সুবলদহে সরিয়া আসেন। কেন তাঁহারা এই নদী বহুল পথঘাটহীন দেশে সরিয়া আসেন ঠিক বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ বংশবৃদ্ধির জন্য ও মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে তাঁহারা এইখানে সরিয়া আসেন। নিধিরাম বসু সর্ব্বপ্রথম এই গ্রামে বাস করেন বলিয়া শুনিয়াছি।

দুর্গাচরণ বসুর মৃত্যুর পরে কালীচরণ বসু এই বসু পরিবারের প্রধানরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। শ্যামাচরণ ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন ও সকল বিষয়ে ভ্রাতার আদেশ মান্য করিয়া চলিতেন।

বসু পরিবার এক সময় অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালীচরণ বসু একদিকে যেমন তেজস্বী ছিলেন অপরদিকে তেমনই অমিত-ব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত ব্যয় ও অযথা দানের জন্য বসু পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়ে। শ্যামাচরণ বসু অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াও বসু পরিবারকে আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। একপ্রকার অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভিতরে ভিতরে নষ্ট হইতে থাকে এবং অকালে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় কিন্তু তবুও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ব্যয় সঙ্কোচের কথা বলিতে পারেন নাই। শ্যামাচরণের মৃত্যুতে কালীচরণ সংযত হইলেন কিন্তু তখন আর বসু বংশের কিছু ছিল না।

কালীচরণ নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সমাজপতি ছিলেন। কালীচরণ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেও পার্শ্ববর্ত্তী দশ বার ক্রোশের মধ্যে তাঁর বাক্য ইংরাজ সরকারের বিধিবদ্ধ আইন ও আদালত হইতে অধিক সম্মান লাভ করিত। তিনিই এই সকল গ্রামের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ছিলেন। তাঁহার লাঠি ও বজ্রগম্ভীর আদেশ গ্রাম শাসন করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর লাঠির প্রশস্তি লিখিয়া গিয়াছেন। সেদিনে বাঙ্গালী এমন

হীনবল ও বাকসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে নাই। কালীচরণের প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

শীতের প্রভাত। খালের জলের উপর প্রভাতের সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়াছে। দিগন্ত প্রসারিত মাঠে সোনালী ধানের শীর্ষ সোনালী আলোর স্পর্শ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কালীচরণ ফর্‌সির নল ধরিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে খালের ধার দিয়া চলিয়াছেন—পশ্চাতে এক রাখাল বালক ফর্‌সি ধরিয়া চলিয়াছে। তাহার স্কন্ধে কালীচরণের গামছা, ধুতি, বেনিয়ান প্রভৃতি। কোন কোন কৃষক কালীচরণকে নমস্কার ও কুশল প্রশ্ন করিয়া দ্রুত মাঠের দিকে চলিয়াছে। কালীচরণ ধীরে ধীরে আম বাগানের দিকে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য অগ্রসর হইলেন। এমন সময় দূরাগত বহুলোকের কোলাহল তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—বহু দূরে বহু লোক। তাহারা গ্রামের দিকেই খালের তীরে তীরে অগ্রসর হইতেছে। কালীচরণ রাখালকে নির্দ্দেশ দিলেন—"এই দেখ, কতকগুলা লোক গ্রামের দিকে আসছে।

ওদের জিগ্যেস কর্ ওরা কোথায় যাচ্ছে আর কোথায় গেছলো, বুঝেছিস। আমি মুখ হাত ধুয়ে আসছি।"

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে করিতে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইল। রাখাল জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে কালীচরণ আসিয়া পড়িলেন ও নিজেই তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা সুরু করিলেন। তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে "তাঁহারা বিবাহ দিতে

গিয়াছিলেন কিন্তু কন্যাপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়াতে তাহারা বর লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন।

কালীচরণ বলিলেন—"সব তো বুঝিলাম। কিন্তু আপনারা একটা বিষয় ভাবেন নাই—এই বাকদত্তা কন্যার কি হইবে?" বরপক্ষ হইতে একজন অভদ্রতাসূচক মন্তব্য করিতেই কালীচরণ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আমি বিচার করিব। এই আম বাগানেই সভা হইবে। আমাকে বিচারে পরাস্ত করিলে তবে আপনারা বর লইয়া ফিরিতে পাইবেন নতুবা ঐ কন্যার সহিতই আপনাদের বরের বিবাহ হইবে।"

বরপক্ষ তখন অত্যন্ত গরম। তাহারা কালীচরণকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই কালীচরণ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন ও পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। মাঠের মধ্যে অসংখ্য মাথা সহসা জাগিয়া উঠিল ও তাহারা আম বাগানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। বরপক্ষ নিশ্চল হইয়া মাথা নত করিল।

পরে সেই আম বাগানেই সভা বসিল, বিচার হইল এবং কালীচরণের নির্দ্দেশে কন্যাকে আনিতে লোক গেল। কালীচরণ নিজে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

কন্যা সম্প্রদানের পর কালীচরণের গম্ভীর মুখে হাসি দেখা দিল। পরক্ষণেই সে মুখে গভীর বিষাদ দেখা দিল, তাঁর নয়নকোণে বাষ্প দেখা দিল, তিনি করযোড়ে উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

বাক্‌বিতণ্ডায় আপনারা সকলেই অনাহারে আছেন। আমার আর সে অবস্থা নাই যে আপনাদের পরিতোষ করিয়া সেবা করি। একপ্রকার ভিক্ষা করিয়া সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়াছি আপনারা তাহাই গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব। বুঝিব আপনারা আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন, আমার কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন।

যাঁহারা কালীচরণের হুঙ্কারে স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার অপূর্ব্ব বিনয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। কালীচরণের মধ্যে তেজস্বিতা ও বিনয় অপূর্ব্বভাবে মিশ্রিত ছিল।

এই কালীচরণ রাসবিহারীর পিতামহ। শৈশবে মাতৃহারা হইয়া রাসবিহারী এই কালীচরণ ও তাঁহার পত্নীর নিকট লালিত ও পালিত হন।

এই গ্রামেরই পাঠশালায় রাসবিহারীর বিদ্যারম্ভ হয়।

সে যুগে শরীর ও স্বাস্থ্যচর্চা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, এখনকার মত পুস্তকের মধ্যে ও পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তরের মধ্যে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। কালীচরণ বসু স্বীয় পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের দুইটী শিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটী আচরণ শিক্ষা অপরটী ব্যায়াম শিক্ষা। কুলীন সন্তানের নব লক্ষণের কথা তিনি সর্ব্বদা সকলকে স্মরণ করাইতেন—প্রায়ই বলিতেন কুলীন সন্তান অকুলীনোচিত ব্যবহার করিলে সে চণ্ডাল হইতেও অধম। বংশের কেহ অন্যায় আচরণ করিলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন।

বংশের যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা ও প্রধান তিনি শিশু ও বালকদের ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। ইহাই ছিল বসু বংশের কৌলিক রীতি। কালীচরণের সঙ্গে সঙ্গে সে রীতির অবসান হয়। কালীচরণ সকলকেই সন্তরণ, নৌ চালনা ও লাঠি খেলা শিক্ষা দিতেন। মধ্যে মধ্যে এই সকল বিদ্যার প্রতিযোগিতা হইত। প্রবাদ এইরূপ, কালীচরণ লাঠি ধরিলে ৫০।৬০ জন লাঠিয়ালও তাঁহার সম্মুখীন হইতে ভয় পাইত। নিম্নলিখিত আখ্যানটী পরবর্ত্তীকালে দিদিমণির (শ্যামাচরণ বসুর পত্নী ও কালীচরণ বসুর ভ্রাতৃজায়ার) নিকট শ্রুত—

রাসবিহারী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র প্রায় সমবয়সী ছিলেন, তবে রাসবিহারী কনিষ্ঠ ছিলেন। লাঠি খেলায় উভয়ে সমদক্ষ ছিলেন। একবার এক প্রতিযোগিতায় কালীচরণ সভাপতিত্ব করেন। একদিকে রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র সকলকে পরাজিত করিয়া প্রথম হইলেন, অপর দিকে রাসবিহারী সকলকে পরাজিত করিয়া প্রথম হইলেন। এইবার উভয় ভ্রাতার মধ্যে লাঠি খেলা আরম্ভ হইল। রাসবিহারীকে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম হইতেই পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিলেন—রাস-বিহারী সযত্নে কেবল আত্মরক্ষায় তৎপর হইলেন। ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া রাসবিহারীর ভ্রাতা অন্যায়ভাবে রাসবিহারীকে আঘাত করিলেন। রাসবিহারীও এইবার উত্তেজিত হইয়া ভ্রাতাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাসবিহারীর লাঠির আঘাতে তাঁহার ভ্রাতা ধরাশায়ী হইলেন। রাসবিহারী

জয়ী হইলেন। কালীচরণ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রাসবিহারীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিজ গলার মালা পরাইয়া দিলেন। মাল্যদান অন্তে তিনি সভা ত্যাগ করেন।

রাসবিহারীর পিতা সামান্য কারণে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের ভাল চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া সুদূর শিমলা শৈলে পদব্রজে চাকুরী অন্বেষণে গমন করেন। তখনকার দিনে চাকুরী এত দুষ্প্রাপ্য ছিল না যে সুদূর শিমলায় চাকুরী অন্বেষণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। যতদূর মনে হয়, তিনি আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে থাকিবেন বলিয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন ; ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু তাঁহার জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই ঘটনা তিনি আজীবন ভুলিতে পারেন নাই। পুনঃ পুনঃ এই ঘটনাটী উল্লেখ করিয়া পুত্রদের সাবধান করিতেন, কেহ যেন আত্মীয়দ্বারে সামান্য কারণেও কোনদিন উপস্থিত না হয়। ঘটনাটী এইরূপ—

বিনোদবিহারীর প্রথম শ্বশুরালয় ছিল সিঙ্গুরের নিকটবর্ত্তী পাড়েলা গ্রামে। ৺নবীন চন্দ্র সিংহ মহাশয় ছিলেন তাহার শ্বশুর ও রাসবিহারীর মাতামহ। তাঁহার খুড়শ্বশুরই বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে তাহার চাকুরী করিয়া দেন। বিনোদবিহারীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে 'কাপুড়ে বাবু' বলিয়া পরিহাস করিতেন। একবার তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন। পুষ্করিণীতে স্নান করিতে

যাইবার সময় আপন পরিচ্ছদাদি লইয়া স্নানের ঘাটে রাখিয়া স্নানের পর বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার বেশের পারিপাট্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শ্বশুর বংশীয়া কোন মুখরা আত্মীয়া অনুচিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিনোদবিহারী মর্ম্মে আঘাত পাইয়া স্নানের পর আর শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিলেন না। ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কোন ট্রেন না পাওয়ায় পদব্রজে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। আত্মীয়ার মন্তব্যের মধ্যে শ্বশুরবাড়ীর সাহায্যে চাকুরীপ্রাপ্তির ইঙ্গিত ছিল। তিনি প্রথমেই চাকুরী ত্যাগের পত্র প্রেরণ করিলেন। পরে অন্যত্র নানাস্থানে চাকুরীর জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। বিনোদ-বিহারীর খুল্লশ্বশুর অনেক বুঝাইলেন, বন্ধুরা অনেক বুঝাইলেন, অন্যান্য আত্মীয়েরা বুঝাইলেন, কিন্তু কেহই বিনোদবিহারীকে সঙ্কল্প হইতে চ্যুত করিতে পারিলেন না। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া অতি সামান্য অর্থ লইয়া তিনি পদব্রজে শিমলা যাত্রা করেন। বিনোদবিহারীকে নির্ব্বোধ বলিয়া সকলেই ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। একমাত্র কালীচরণ পুত্রের আত্মসম্মান জ্ঞানে আনন্দিত হইয়াছিলেন। কালীচরণ মন্তব্য করিয়াছিলেন— "মানুষেরই আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে—পশুরই ঐ জ্ঞান নাই। যার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, সেই কেবল সকল পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।"

বিনোদবিহারীর তেজস্বিতার আর এক পরিচয় পাই সেইদিন যেদিন সিমলা পুলিশ তাঁহার বাসাবাটী খানাতল্লাসী করিতে

চেষ্টা করে। বিনোদবিহারী এই খানাতল্লাসীর সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারেন, এবং নিজ অফিসে এক আবেদন পত্র লিখেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—

পঁচিশ বৎসরের উপর আমি যথাসাধ্য সততার সহিত সরকারের সেবা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মের কোন ত্রুটী কেহ পায় নাই। রাসবিহারী আমার পুত্র এবং সাবালক কর্ম্মক্ষম পুত্র। বহুদিন হইতেই রাসবিহারী কার্য্যোপলক্ষে আমার নিকট হইতে দূরে থাকে। রাসবিহারী যাহা করিয়াছে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক তাহা আমার পরামর্শে বা আমার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া করে নাই। এক্ষেত্রে সরকার যদি আমার পঁচিশ বৎসরের ঐকান্তিক সেবা ভুলিয়া আমার পুত্রের কার্য্যের জন্য আমার বাটী খানাতল্লাসী করেন, তাহাতে আমার যথেষ্ট সম্মান হানি হইবে এবং আমিও সশ্রদ্ধে আর সরকারের কর্ম্ম করিতে পারিব না। হয় সরকার এই খানাতল্লাসী বন্ধ করুন, না হয় আমার কর্ম্মত্যাগ-পত্র গ্রহণ করুন। এই পত্রের পর যদি সরকার আমার বাটী খানাতল্লাসী করিবার চেষ্টা করেন, বা পুলিশ আমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, বা আমার পরিবারবর্গকে নানারূপ প্রশ্নের দ্বারা উত্যক্ত করেন, তাহা হইলে আমি কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। বুঝিব, আমি সরকারের সেবা করিয়া ভুল করিয়াছি।

বলাবাহুল্য পুলিশ খানাতল্লাসী বন্ধ করিয়া দেয় এবং সাময়িকভাবে পুলিশের তৎপরতা কমিয়া আসে।

রাসবিহারীর শৈশবে এক মহিমান্বিতা রমণীর স্নেহ মাতৃহীন রাসবিহারীকে ঘিরিয়া অবিরত প্রবাহিত হইত। এই মহিলাকে পৃথক করিয়া দিয়া রাসবিহারীর শৈশব কল্পনা অসম্ভব। এই নারী শ্যামাচরণ বসুর দ্বিতীয়া পত্নী বিধুমুখী। তিনি পুত্রহীনা ছিলেন, তিনি স্বপত্নীপুত্র, পুত্রী ও পৌত্র পৌত্রীদের অপরিমিত স্নেহে পালন করিয়াছিলেন। একদিকে তাঁহার যেমন বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা অপরদিকে তাঁহার মিষ্ট স্বভাব ও ব্যবহার শিশু, বালক বৃদ্ধ সকলকে সমভাবে আকর্ষণ করিত। রাসবিহারীর সকল অভাব, অভিযোগ, আব্দার তিনি পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বিপদে পড়িলেই রাসবিহারী এই নারীর স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এইখানেই কেবল কালীচরণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মনের মধ্যে রাসবিহারী এমন একটি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তীকালে কনিষ্ঠ বিজনবিহারীকে অন্যমনস্ক হইয়া "রাসি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একবার বিজনবিহারী তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—"দিদিমণি! দাদা তোমাকে ভিতরে বাহিরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—তুমি রাসিময় জগৎ দেখিতেছ—আমার ভয় হয় কখন তুমি গরু-বাছুরকে 'রাসি' বলিয়া বসিবে।"

দিদিমণি হাসিয়া বলিয়াছিলেন "বৌমা যে রাসিকে আমার হাতেই দিয়ে গেছলেন রে। ওই তো আমার একমাত্র বন্ধন ছিল। ওকে না হ'লে কি আমি তখন বাঁচতাম। না জানি সে কোথায়?

দিদিমণির চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। নিজকে সম্বরণ করিয়া

বলিলেন—"আমি যে তোর মাঝে তাকে কখনও কখনও দেখি রে। অত দুরন্ত তবু আমার কঠিন মুখ দেখলে তার সব দুরন্তপনা থেমে যেত।"

এই নারী রাসবিহারীর কথা বলিতে বলিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন; রাসবিহারীর কথা বলিতে বলিতে আত্ম ভুলিয়া কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন।

অনেকেই বড় বড় অক্ষরে প্রচার করিয়াছেন—রাসবিহারী শৈশবে মাতৃহারা। এটাই যেন রাসবিহারীর জীবনে একটা বড় অভিসম্পাত। এ অভিসম্পাত যেন জগতে আর কাহারও জীবনে ঘটে নাই। এই ক্ষোভই যেন রাসবিহারীকে সর্ব্ব স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। রাসবিহারীর স্নেহাকাঙ্ক্ষী মন যেন এই একমাত্র কারণে ক্ষুব্ধ হইয়া বাল্য হইতেই বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা এরূপ অনুমান করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত।

রাসবিহারীর মত ভাগ্যবান কে? এরূপ স্নেহশীলা নারীর স্নেহাঞ্চলে কার শৈশব গৌরবান্বিত হইয়াছে? যে অপুত্রক নারী আহারে, বিহারে, জাগরণে, নিদ্রায় রাসবিহারী রাসবিহারী করিয়া পাগল হইতেন, যিনি তাঁহার হৃদয় নিংড়াইয়া সকল স্নেহ ভালবাসায় রাসবিহারীকে স্নান করাইতেন, যিনি গর্ভধারিণী মাতা হইতেও অধিক স্নেহে রাসবিহারীকে ঘিরিয়া রাখিতেন তাঁহার কথা অনেকে জানেন না, নতুবা তাঁহারা রাসবিহারী শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া আক্ষেপ করিতেন না।

আমরা পরে দেখিব রাসবিহারী একদিনও মাতৃস্নেহ হতে

বঞ্চিত হন নাই। তাহা যদি না হইত, রাসবিহারী এতবড় কর্ম্মী হইতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। একাধিক নারীর মাতৃস্নেহে রাসবিহারী অবগাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সত্যবটে তিনি গর্ভধারিণীর স্নেহলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা না পাইলেও পুনঃ পুনঃ অযাচিত স্নেহ লাভ করিয়া তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে অপর নারীর মাতৃস্নেহ যদি এত সুমিষ্ট হয়, না জানি গর্ভধারিণীর স্নেহ আরও কত মধুর। হয়ত সেই কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল।

রাসবিহারীর শিক্ষারম্ভ ও বাধা। রাসবিহারীর বিমাতা ও পিতা

বিনোদবিহারী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন ও চন্দননগরে বাটী ক্রয় করিলে রাসবিহারী ও তাঁহার ভগিনী সুশীলা চন্দন-নগরে আসিলেন। এইখানেই তাঁহার ইংরাজী বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ হয়। চকদীঘিতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। এই বিদ্যালয়ে কোনদিন রাসবিহারী গিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। একটু বেশী বয়সেই রাসবিহারী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেজন্য তিনি একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু "ডবল প্রমোশন" পাইয়া সে ত্রুটী সংশোধন করিয়া লন। অল্পদিনের মধ্যে যে কেবল বিদ্যালয়ে উচ্চ স্থান অধিকার

করিয়া লন তাহাই নহে, তিনি সহপাঠিদের নেতৃত্ব করিতে থাকেন ও শিক্ষকদের মধ্যে নিজ চরিত্রগুণে অনেকেরই স্নেহ আকর্ষণ করেন ।

এক ঘটনা বিপর্য্যয়ে রাসবিহারীর শিক্ষায় বাধা উপস্থিত হইল। তিনি পাঠে অমনোযোগী হইয়া উঠিলেন। রাসবিহারীর পিতামহ ও পিতামহী ভৎর্সনা করিয়া বিশেষ ফল পাইলেন না। রাসবিহারীর বিমাতা রাসবিহারীকে প্রশ্ন করিলেন। রাসবিহারী প্রথমে কিছুই বলিতে চান না। কিন্তু বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিলে একদিন বলিলেন—

"তুমিই বল না, মা! ১৭জন ঘোড় সওয়ার কখনও একটা দেশ জয় করতে পারে?

মা রাসবিহারীর প্রশ্নর কারণ ও অর্থ বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন ও পরে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তা যাবে না কেন? সে দেশে মানুষ ছিল না নিশ্চয়ই। জানিস না কালকেতুর কথা? কালকেতু জঙ্গল কেটে একটা মস্ত বড় রাজ্য বসিয়েছিলেন। তোরই পূর্ব্বপুরুষ তো এই রকম করেই সুবলদহে বাস করেছিলেন।"

রাসবিহারী বলিলেন—"ধ্যেৎ, এ সে রকম নয়। জানো, লোকে কি বলে? সতের জন মুসলমান এসে বাঙ্গলা দেশটা নাকি জয় করেছিল? আমি এ বিশ্বাস করতেই পারি না।"

মা বলিলেন "তা জানি না বাবা, বিশ্বাস তো হয় না।

আবার ঘর শত্রু বিভীষণ থাকলে তা সম্ভবও হয়। এক ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে নিঃস্ব করেছিল।

রাসবিহারী মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন—"ঘর শত্রু বিভীষণ"

মা বলিলেন "তা বৈকি বাবা! অমন রাজা দশানন তিনিই ধ্বংস হয়ে গেলেন, ইন্দ্রতুল্য পুত্র ইন্দ্রজিৎ মরলো!" ক্ষণপরেই মা প্রশ্ন করলেম—"তাতে তোর কি হল?"

রাসবিহারী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আমি বিশ্বাস করি না বলায় ইতিহাসের শিক্ষক আমায় অপমান করেছেন। ছেলেরাও আমায় উপহাস করে।"

ইহারই কিছুদিন পর রাসবিহারী জিদ ধরিলেন যে চন্দন-নগরের স্কুলে তিনি পড়িবেন না। রাসবিহারী তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নিত হইয়াছেন। পিতামহ বুঝাইলেন, পিতামহী (কালী চরণ বসুর দ্বিতীয়া পত্নী) বুঝাইলেন, মাও বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। অর্থের অভাবের কথাও উঠিল। কিন্তু রাসবিহারী নাছোড়বান্দা। রাসবিহারী স্কুল পলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বিনোদবিহারীকে জানান হইল। রাস-বিহারী কলিকাতায় পড়িতে গেলেন।

কলিকাতায় ঠনঠনের বাজারে সুবলদহগ্রামের সকলে মিলিয়া একটি টিনের চালা ভাড়া লইয়াছিলেন। এইখানে থাকিয়া বিনোদবিহারীর ভ্রাতারা ও খুল্লতাত পুত্ররা চাকুরী ও অন্যান্য

কার্য্য করিতেন। রাসবিহারী আসিয়া এইখানেই উঠিলেন ও নিকটস্থ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

কিছুদিনের জন্য সমস্যার নিষ্পত্তি হইল। পড়াশুনা নিয়মিত চলিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন রাসবিহারী বাসায় ফিরিলেন না। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইল। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলিল, কিন্তু রাসবিহারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত হাঁসপাতালে হাঁসপাতালে অন্বেষণ করিয়া বিফল হইয়া বাসায় ফিরিলেন। পরদিন প্রাতেও রাসবিহারীর কোন সংবাদ নাই। চন্দননগরে লোক ছুটিল, সেখানেও রাসবিহারী নাই। রাসবিহারী গেল কোথায়? তবে কি রাসবিহারী চা বাগানের আড়কাঠির প্রলোভনে পড়িয়া চা বাগানের কুলী হইয়া চলিয়া গেল?

তখনকার দিনে চা বাগানের আড়কাঠি বাঙ্গলার সহরে গ্রামে সর্ব্বত্র ঘুরিত ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকদের সর্ব্বনাশ সাধন করিত। এই আড়কাঠির দল বাঙ্গালী বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। পুলিশে সংবাদ দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। ইহার পরের দিন প্রাতে দ্বার খুলিতেই দ্বারের নিকট রাসবিহারীকে রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত আবিষ্কার করিলেন। রাস-বিহারীর পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, রাসবিহারীর সর্ব্বাঙ্গ ধূলিমলিন। প্রশ্ন করিবার তখন সময় নয়,—রাসবিহারী ক্লান্ত, শ্রান্ত, ভীত ও অসুস্থ। রাসবিহারীকে শয্যায় শায়িত করা হইল।

রাসবিহারী সুস্থ হইলে, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, তাড়না করিয়া কেহই কোন উত্তর পাইলেন না। রাসবিহারীর পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য কি হইল, তাহারও কোন উত্তর নাই। রাসবিহারীর পিতামহ চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন, সেইখানে রাসবিহারীকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কে এই দুরন্ত খেয়ালী রাসবিহারীর ভার লইবে? সেখানেও কালীচরণ প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। রাসবিহারী নিরুত্তর। অবশেষে কোন উত্তর না পাইয়া সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু একজন হাল ছাড়িলেন না। তিনি সতর্ক হইয়া হাল ধরিয়া রহিলেন। অবশেষে রাসবিহারীর মুখ খুলিল, তাঁহারই স্নেহের আবেদনে। ইনিই রাসবিহারীর বিমাতা।

রাসবিহারী মাকে বলিলেন "মা! আমি পড়বো না আর।" রাসবিহারীর মা বলিলেন "কেন রাসি? তুমি তো ভাল ছেলে বাবা? তোমার একথা শুনলে তিনি যে দুঃখ পাবেন। তুমি তো জান, তিনি নিজে পড়তে পাননি বলে কত দুঃখ করেন। ছি! ও কথা আর মুখে এনো না।"

রাসবিহারী বলিলেন "না মা, আমি পড়তে পারবো না। আমার পড়বার একটুও ইচ্ছা নেই।"

মা সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন—"কেন? কি হয়েছে? আমায় সব খুলে বল্ রাসি। আমি তাঁকে জানাব, তিনি নিশ্চয়ই একটা উপায় করে ফেলবেন।"

রাসবিহারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "জানো মা, বাঙ্গালী সৈন্য হতে পারে না! ইংরেজ বাঙ্গালীকে সৈন্য করে না!"

কথাটার সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া মা বলিলেন—"তা সৈন্য নাই করুক। তোমার তাতে কি এসে যায় ?"

রাসবিহারী তখন বলিলেন—"জানো মা, আমি সৈন্য হ'তে গিয়েছিলাম। বাঙ্গালী বলে তারা আমায় নিল না। পরে আমি নাম ভাঁড়িয়ে অন্য পরিচয়ে ঢুকতে চেষ্টা করি। আমি ধরা পড়ে মার খাই। সেপাইরা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।"

রাসবিহারীর কথা শুনিয়া মা ভীত হইলেন, কিন্তু সে কথা বহু দিন পর্য্যন্ত গোপন রাখিয়াছিলেন।

রাসবিহারী কিছুতেই স্কুল যাইবেন না। বেশী বকাবকি করিলে পলাইয়া বেড়াইতেন। পিতামহ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন কড়া শাসন দরকার। শাসনে বাঘে বলদে একত্র জল খায়, রাসবিহারী তো কোন ছার। রাসবিহারীকে দিনে ছাদে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা দুরূহ ব্যাপার। তিনি শীঘ্রই ছাদ হইতে পলাইবার পথ আবিষ্কার করিলেন। তিনি গোপনে ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিতেন, আবার সময় বুঝিয়া ছাদে ফিরিয়া আসিতেন। পিতামহ জানিতে পারিয়া মোটা শিকল হারের মত করিয়া গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাতে এক বৃহৎ তালা ঝুলাইয়া দিলেন। রাসবিহারী এই শিকল লইয়াই পৃথিবী জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে রাসবিহারী সিঁড়ীর মধ্যে বন্ধ হইলেন। কালীচরণ পুত্রকে বিস্তারিত পত্র লিখিলেন।

রাসবিহারীর বিমাতা রাসবিহারীর এই শাস্তিতে বড়ই কাতর

হইয়া শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। কালীচরণ পুত্রবধূকে দেখিয়া চশমা নামাইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে চাহিলেন। পুত্রবধূ ধীর শান্ত স্বরে বলিলেন—"একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি বাবা।"

কালীচরণ বলিলেন—"বল।"

পুত্রবধূ বলিলেন—"আমায় কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।"

কালীচরণ সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন—"কেন মা? এখানে কি কষ্ট হচ্ছে?"

পুত্রবধূ উত্তর দিলেন—"হাঁ, বাবা"। কালীচরণের মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কি কষ্ট হচ্ছে মা?"

পুত্রবধূ কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "কোন্ মা ছেলের কষ্ট চোখের উপর দেখতে পারে বাবা?"

কালীচরণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ছেলে যে তোমার দুষ্ট হয়ে উঠেছে মা।" তারপর কি ভাবিয়া সিঁড়ীর দরজার চাবি ও শিকলের চাবি পুত্রবধূর হাতে তুলিয়া দিলেন।

পুত্রবধূ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কালীচরণ গমনোন্মুখ পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে স্বর্গীয় হাসি।

রাসবিহারী সিঁড়ীর ঘর হইতে মা ও পিতামহের মধ্যে যে আলাপ হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ শুনিয়াছিলেন, মা গলার শিকলের তালা খুলিতে আসিলে প্রশ্ন করিলেন—

"তুমি আমার জন্যই চলে যাচ্ছিলে মা?"

মা বলিলেন—"তুই আমায় কি কষ্ট দিস্, তুই কি বুঝতে পারিস, রাসি !"

রাসবিহারী আস্ফালন করিয়া বলিলেন "কিন্তু আমার একটুও কষ্ট হয় না মা।"

সেই দিন হইতে রাসবিহারী নিয়মিত স্কুল যাইতে লাগিলেন। মনে হইল, মাথায় যে ভুতটা চাপিয়াছিল এতদিনে সেটা রাসবিহারীকে নিস্কৃতি দিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল সকলেই ভুল বুঝিয়াছিলেন।

একদিন রাসবিহারীর মাতা সংসার খরচের হিসাব ও বাক্স গুছাইতেছিলেন। রাসবিহারী মাকে সাহায্য করিতেছিলেন। রাসবিহারীর মাথায় তড়িৎ দুষ্ট বুদ্ধি খেলিয়া গেল। এই সুযোগে মায়ের অজ্ঞাতসারে রাসবিহারী কিছু টাকা বাহির করিয়া লইয়া একেবারে অন্তর্ধান করেন। রাসবিহারী পূর্ব্বেও অদৃশ্য হইয়াছিলেন সুতরাং দুই একদিন কোন অনুসন্ধান হইল না। কিন্তু রাসবিহারী ফিরিল না দেখিয়া মা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাসবিহারীর মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। পরিচিত অপরিচিত সকল স্থানেই অনুসন্ধান হইতে লাগিল। চন্দনগর, সুবলদহ, কলিকাতা কোথাও রাসবিহারী নাই। তবে কি রাসবিহারী সৈন্য বিভাগে যোগ দিল? রাসবিহারী বলিয়াছিলেন বাঙ্গালীকে সৈন্য বিভাগে লয় না। তাহা হইলে কোন নামে তাহার অনুসন্ধান হইবে? প্রকৃত সংবাদই বা কিরূপে পাওয়া যাইবে? বাড়ীতে রন্ধন, আহার

বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই এই বিপদে মুহ্যমান। কালীচরণ নিরুপায় হইয়া পুত্রকে সকল সংবাদ দিলেন। রাসবিহারীর মাও বিনোদবিহারীকে পত্র দিলেন।

এদিকে রাসবিহারী পশ্চিম ভারতের কয়েকটী সৈন্যাবাস ঘুরিয়া বম্বে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে একেবার নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কোন উপায় নেই দেখিয়া পিতাকে তার করিলেন—"একেবারে সহায় সম্বল শূন্য। আসুন বা টাকা পাঠান।" বিনোদবিহারী টাকা পাঠাইয়া দেন। রাসবিহারী পূর্ব্বাপেক্ষাও হীনভাবে চন্দননগরে পৌঁছিলেন। এ কাহিনী বলিতে বলিতে "রাসবিহারীর মা" শিহরিয়া উঠিতেন। এইবার রাসবিহারী পড়াশুনা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন।

স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন মনে জাগে রাসবিহারী সৈন্যবিভাগে যোগ দিবার জন্য এত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন? তিনি কি সৈনিক জীবনের বীরত্বের কথা ভাবিয়া সৈনিক হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন? ব্যায়াম চর্চ্চায় রাসবিহারীর দেহ লৌহের মত কঠিন হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে নায়কত্ব করিয়া তাঁহার বীরোচিত কার্য্যের জন্য একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ইহা ছাড়াও তাঁহার মনের মধ্যে এক গূঢ়তম উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসে তিনি চন্দ্রগুপ্তের গোপনে ও ছদ্মনামে গ্রীক যুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষার কথা পড়িয়াছিলেন। তিনি সেই প্রকারে ইংরাজের যুদ্ধনীতি আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন যাহাতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে তিনি পরবর্ত্তীকালে সেই যুদ্ধ কৌশল

ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁহার বিফল হইয়া যায়। একবার তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন তাহা সফল করিবার জন্য তিনি কোন কষ্টকর পরিশ্রমে বিমুখ হইতেন না। ডেরাডুনে অবস্থানকালে তিনি সমর সম্বন্ধীয় বহুপুস্তক সংগ্রহ করেন ও সেই সকল পুস্তক পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করিতেন।

বিনোদবিহারী রাসবিহারীর পৌঁছান সংবাদ পাইয়া দেশে আসিলেন। তিনি পিতা, পত্নী, পুত্র সকলেরই উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নিজের আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতার জন্য যে দুঃখ তাহাও পুত্রকে জানাইলেন। পুত্রের মধ্য দিয়া সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্নের কথা উত্থাপন করিলেন। কিন্তু রাসবিহারীর এক কথা—"আমি পড়িব না।" অবশেষে বিনোদবিহারী সপরিবারে সিমলা গেলেন এবং সঙ্গে রাসবিহারীকেও লইয়া গেলেন।

সরকারী প্রেসে বিনোদবিহারী রাসবিহারীর চাকুরী করিয়া দিলেন। রাসবিহারী কপি হোল্ডারের চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি এই সুযোগ পাইয়া ইংরাজী উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। এই সময় রাসবিহারী অবসর পাইলেই টাইপ শিখিতে থাকেন। চক্ষুতে কাপড় বাঁধিয়া দিলেও তিনি দ্রুত নির্ভুল টাইপ করিতে পারিতেন। রাসবিহারী মন দিয়া কাজ করিতেছেন দেখিয়া বিনোদবিহারী হৃষ্ট হইলেন।

বিনোদবিহারী সিমলায় বহু জনহিতকর বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান

ও নাগরিক সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন। সামান্য কেরাণী হইয়াও নিজের নৈতিক চরিত্র গুণে তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধার আসন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্রমে নানা প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সঙ্গে তিনি রাসবিহারীকেও পরিচিত করিয়া দিলেন। রাসবিহারী মাতিয়া উঠিলেন। রাসবিহারী নাগরিক সঙ্গীত সমিতিতে যোগ দিয়া সঙ্গীত ও বাদ্য অভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি ধ্রুপদ সঙ্গীত ও বেহালায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। রাসবিহারীর সঙ্গীত-গুরু ছিলেন উত্তরপাড়া নিবাসী ললিত বন্দোপাধ্যায় ও বেহালা শিক্ষক ছিলেন বিপিনবাবু। ইঁহারা উভয়েই সিমলায় চাকুরী করিতেন।

এই সিমলাতেই সমবয়স্কদের অনুরোধে নাট্য সমিতিতে যোগ দিয়া রাসবিহারী "চন্দ্রশেখরে" লরেন্স ফষ্টরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই ভূমিকায় তিনি এরূপ নিখুঁত অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাহাতেই তিনি সিমলার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত হইয়া পড়েন। এই অভিনয় দেখিয়া কোন ভারতীয় বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী মন্তব্য করেন "নকল ফষ্টর যদি এই হয়, না জানি আসল ফষ্টর কি ভয়ানক ছিল?" সিমলার নাট্যগুরু ছিলেন ললিতবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু। ইঁহারা রাসবিহারীর নাট্য প্রতিভার প্রশংসা করিয়া বলিতেন—"রাসবিহারী যদি অভিনয় চর্চ্চা করিতেন, তাহা হইলে রাধিকানন্দন মুখোপাধ্যায়ের (ইনি প্রসিদ্ধ জগদানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র—ইঁহার হ্যামলেট অভিনয় দর্শনে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ রো সাহেব

মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং পরে ইনি কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেন) সমকক্ষ অভিনেতা হইতে পারিতেন। এই নাট্য সমিতিতে অভিনয় করিবার জন্য রাসবিহারী মেঘনাথবধ কাব্যকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয়োপযোগী করেন, কিন্তু ইহা কখনও অভিনীত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। এই পাণ্ডুলিপিখানি চন্দননগর বাটী খানাতল্লাসীর সময় অন্তর্হিত হয়। সম্ভবতঃ বিদ্রোহপ্রমাণের অঙ্গবোধে পুলিশ এইখানি অন্যান্য বহুবস্তু ও কাগজপত্রের সহিত লইয়া যায়।

বিনোদবিহারীর সংবাদপত্রে কিছু টীকা টিপ্পনী ও প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস ছিল। রাসবিহারীও লিখিবার চেষ্টা করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার এক সহকর্ম্মী তাঁহার সহিত যোগ দেন। উভয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ রচনা করিতেন। নিজেরাই পড়িতেন নিজেরাই সমালোচনা করিতেন। কখনও কখনও এই সকল প্রবন্ধ লইয়া বন্ধুমহলে পাঠ ও সমালোচনা হইত। কখনও বন্ধুরা প্রশংসা করিতেন, বেশীর ভাগ সময়ই উপহাস করিতেন। সাংবাদিক হইবার আগ্রহে রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু এমন একটী কাজ করিয়া বসিলেন যাহার ফলে পিতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল তো বটেই, পরন্তু রাসবিহারীর জীবন নূতনখাতে প্রবাহিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাসবিহারীর এই বন্ধু এসোসিয়েটেড প্রেসের কে, সি, রায়।

সরকারী ছাপাখানায় বিশেষ গোপনীয় বিষয়ের নথীপত্র ছাপা

হইতেছিল। সহসা এই নথীপত্র হইতে কোন গোপনীয় বিষয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল। আফিসে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অনুসন্ধানে বিশেষ কিছু জানিতে পারা গেল না। কিন্তু বিনোদবিহারী বুঝিলেন এ কার্য্য রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর দ্বারা হইয়াছে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই রাসবিহারীর জন্য দুই এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়াছিলেন। এবার তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন ও রাসবিহারীকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া তখনই পদত্যাগ করিতে বলিলেন। রাসবিহারী পদত্যাগ করিয়া বাটীতে আসিয়া বসিলেন। রাসবিহারী বাহিরের ঘরে পড়িয়া থাকেন, অফিস যান না; পিতা বা অন্য কাহারও সমক্ষে বাহির হন না। মা রাসবিহারীকে প্রশ্ন করিয়া একে একে সকল বিষয় অবগত হইলেন। রাসবিহারীকে ক্ষমা করিবার জন্য মা, বিনোদবিহারীকে ধরিয়া বসিলেন। বিনোদবিহারী কিছুতেই নরম হইলেন না। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে রাসবিহারীর জন্য তাঁহার সুনাম তো নষ্ট হইতই, চাকুরী পর্য্যন্ত যাইতে পারিত। তিনি রাসবিহারীকে নিজ অফিসে তো রাখিবেনই না, অন্যত্রও তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দিবার চেষ্টাও করিবেন না।

রাসবিহারী বুঝিতে পারেন নাই যে ব্যাপারটা এরূপ গুরুতর রূপ গ্রহণ করিবে। তিনি বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাতো আর ফিরিবে না। রাসবিহারী ঘরের মধ্যে অর্গল বন্ধ করিয়া দিবারাত্র পড়িয়া রহিলেন। বন্ধুবান্ধব আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া ফিরিয়া যায়। আহার

দিয়া ডাকাডাকি করিয়াও তাঁহার সাড়া পাওয়া যায় না। রাসবিহারী চোরের মত থাকেন।

মা না পারিয়া উঠেন পিতার সঙ্গে, না পারিয়া উঠেন পুত্রের সঙ্গে। বাটীর মধ্যে সব সময় একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

সহসা রাসবিহারী অদৃশ্য হইলেন। মা কাঁদিয়া কাটিয়া বিছানা লইলেন। আবার বিছানা হইতে উঠিলেন। রাসবিহারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রাসবিহারীর মাতা ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং দেশে পিত্রালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। একদিন বিনোদবিহারী অফিস হইতে ফিরিয়া পত্নীর হস্তে এক পত্র দিলেন। পত্রে লেখা—"বাবা! আমি ভাল আছি, মাকে ভাবিতে নিষেধ করিও।"

জানা গেল রাসবিহারী আছে, কিন্তু কোথায় আছে? মা কিন্তু তাইতেই খুসী। ভারতীয় নারীর এই মাতৃমূর্ত্তির তুলনা আর কোথাও আছে কি না জানি না।

বহু উপন্যাস ও নাটকে বিমাতার কদর্য্য ঈর্ষাপরায়ণ মূর্ত্তি রচনা করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং সমাজেরও বহু ক্ষতি করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র যে বিমাতা মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন তাহা তৎকালে বাস্তব ছিল। সে যুগে নারী ছিলেন, কেবল যে স্বামীর ধর্ম্মসঙ্গিনীই তাহা নয়, স্বামীর কল্যাণের জন্য স্বামীর পরিবার-

বর্গের সকলের শুশ্রূষাকারিণী, সকলের মঙ্গলবিধায়িনী। তখন স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, তা নিজ গর্ভস্থই হউক আর সতীন গর্ভস্থই হউক, সমান আদরণীয়, সমান স্নেহের পাত্র ছিল; স্বামীর আত্মজ, স্বামীর সেবার অঙ্গীভূত ছিল। সে যুগে নারীর পূর্ণবিকাশ ছিল মাতৃত্বে। পরবর্ত্তীযুগে নারী এ আদর্শ হইতে ধীরে ধীরে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন। অসৎ সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক ও সিনেমার দৃষ্টান্ত এই আদর্শচ্যুতিতে বহুল ভাবে সাহায্য করিয়াছে। সমাজে দৈত্য আছে, দেবতাও আছে। দুই চিত্রই অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন আছে সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু দৈত্য চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় সর্ব্বত্র পশ্চাতে চালচিত্রে থাকিবে একটা সুস্পষ্ট সতর্ক সাবধান বাণীর ইঙ্গিত, নতুবা সে চিত্র যতই মনোজ্ঞ হউক, যতই বাস্তবের নিকটবর্ত্তী হউক, যতই মনস্তত্ত্বপূর্ণ হউক, তাহা সমাজের কল্যাণসাধন না করিয়া সমাজকে নিম্নগামী করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য সেরূপ চিত্রের সার্থকতা নাই, বরং তাহা অহিতকারিতারই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। এতকথা বলিবার কারণ, রাসবিহারীর বিমাতা, রাসবিহারীর মা বলিয়া পরিবার মধ্যে, আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসবিহারীর মা বলিয়াই নিজকে পরিচিত করিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। সেকালে নারী পুত্রগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন, পুত্র পরিচয়ে পরিচিত হইতেন, একালের মত শ্রীমতী বা মিসেস বসু ছিলেন না। সমাজের অন্যান্য কল্যাণকর বিধানের মত সে বিধান ধীরে

ধীরে বিলীন হইয়াছে। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে বিষয় বাঙ্গালী সমাজের বিচার্য্য।

বহুদিন রাসবিহারীর আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ক্রমেই সকলে রাসবিহারীকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভুলিল না কেবল দুটী প্রাণী এক বিনোদবিহারী, দ্বিতীয় তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাসবিহারীর বিমাতা। রাসবিহারীর অজ্ঞাতবাস মাছের কাঁটার মত মধ্যে মধ্যে দুইজনকে বেদনা দিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এ কথা আলোচনা পতি পত্নীর মধ্যেও বন্ধ। উভয়েই উভয়ের নিকট হইতে মর্ম্মান্তিক বেদনা সন্তর্পণে গোপন করিয়া রাখিতেন। অন্তরে উভয়েরই এক বেদনা—কিন্তু রূপ ভিন্ন। বিনোদবিহারীর অনুশোচনা—তাঁহার একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্নী ভাবেন যে তিনি যদি একটু শক্ত হইতেন তাহা হইলে পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদটা এত নিদারুণ হইত না; কে আর বিশ্বাস করিবে তাঁহার আন্তরিক স্নেহের কথা, তাঁহার মর্ম্মান্তিক আঘাতের কথা, সকলে তাঁহাকেই দোষ দিবে, তাঁহারই নিন্দা করিবে, হয়ত পতিও মনে মনে তাহাই ভাবেন।

বহুদিন পরে বিনোদবিহারী হয় দেশে যাইতেছেন অথবা দেশ হইতে ফিরিতেছেন (কথাটা এতদিন পরে ঠিক স্মরণ নাই ; বিনোদবিহারী দেহত্যাগ করিয়াছেন ১৯২১ সালে)। কাল্কা শিমলা রেলের এক ষ্টেশনে একটী পাঞ্জাবী যুবক বিনোদবিহারীর

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের বেঞ্চে উপবেশন করিল। বিনোদবিহারী যুবককে একবার নিরীক্ষণ করিয়া অন্যত্র মনোনিবেশ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে যুবকের উপর দৃষ্টি পড়িতে বিনোদবিহারী দেখিলেন যুবক মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বিনোদবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"মহাশয় কি আমায় চেনেন?"

যুবক আসিয়া পদস্পর্শ করিল—"বাবা! তুমি আমায় চিনতে পারলে না? আমি কিন্তু তোমায় দূর থেকে দেখেই চিনেছিলাম।"

বহুদিন পরে পিতাপুত্রের মিলন হইল। এতদিনের রুদ্ধ অশ্রু বিনোদবিহারীর গণ্ড বহিয়া দর দর ধারায় ঝরিতে লাগিল। বিনোদবিহারী ক্রমে শান্ত হইয়া বহু প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু রাসবিহারী কি করিতেছে ও কোথায় আছে কিছুতেই বলিলেন না। বিনোদবিহারী অবশেষে রাসবিহারীকে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী মাতার সহিত পরে সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

একে একে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। রাসবিহারীর দেখা নাই। রাসবিহারীর মাতা অপেক্ষা করিয়া করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। তারপর একদিন মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাসবিহারী উপস্থিত।

গভীর শীতের রাত্রি। কয়েকদিন পূর্ব্বে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে। হু হু করিরা উত্তরে বায়ু বহিতেছে। বহু অশ্বতরের পদধ্বনি ও বহুলোকের মিলিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল। পরক্ষণেই দ্বারে সজোরে করাঘাত হইতে লাগিল—

"মা ! ও মা ! মা ! আমি ! দরজা খোল।"

রাসবিহারীর মাতা অসুস্থ ছিলেন—প্রায় উত্থানশক্তিরহিত। ব্যস্ততাসহকারে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায়, পড়িতে পড়িতে তিনি দ্বারের দিকে ছুটিলেন। বহুদিন পরে হারানিধি পাইয়া আনন্দ উথলিয়া উঠিল। মায়ের দুইচক্ষু দিয়া আনন্দধারা ছুটিল। অশ্রুসিক্ত মুখে হাসি ফুটাইয়া মা বলিলেন—"গর্ভধারিণী মাই শুধু মা, তা না হলে আর মা কি হয় না বাবা ? কিন্তু ভগবান আমায় তোমার মা করেই পাঠিয়েছেন বাবা ! তুমি সে অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেই কি কেড়ে নিতে পার ?" মা এই প্রথম রাসবিহারীকে 'তুই' পরিত্যাগ করিয়া 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

রাসবিহারী অপ্রতিভ, রাসবিহারী লজ্জিত। মা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাসবিহারী মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—"তুমি কি বলছো মা ! তুমিই তো আমার মা, তোমাকেই তো আমার মা বলে জানি।"

মা রাসবিহারীর মাথায় ও মুখে হাত বুলাইতেছিলেন, বলিলেন "এখনও ঠিক জান না রাসি।"

রাসবিহারী অনুনয় করিয়া উঠিলেন—"এবারের ভুল মাপ কর মা ! আর কখনও ভুল হবে না।"

দুরন্ত রাসবিহারী, অবিনীত রাসবিহারী, সে ভুল আর জীবনে করেন নাই। সেই দিন তিনি মাতৃ নামের যে আস্বাদ পাইয়াছিলেন সে আস্বাদ চিরদিন তাঁহার মনে ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই

মা কে হারাইয়া তিনি আর এক মা পাইয়াছিলেন। যে অঙ্কুর এই মাতৃস্পর্শে জাগরিত হইয়াছিল তাহাই পরবর্ত্তী মায়ের স্পর্শে পত্রপুষ্পে শোভিত বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছিল। যথা স্থানে আমরা সে মাকে দেখিব।

এই প্রথম সকলে জানিল, রাসবিহারী কসৌলীতে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে কর্ম্ম করিতেছেন।

রাসবিহারী এ কর্ম্মও বেশী দিন করেন নাই। তিনি অল্প দিনের মধ্যে ডেরাডুনের বনবিভাগ দপ্তরের কেরানীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ডেরাডুনে রাসবিহারী এক বাঙ্গালী বৃদ্ধের সংস্রবে আসেন। আজ আর তাঁহার নাম স্মরণ নাই। ইনি স্বদেশ ভক্ত ছিলেন। ইহার এক পুত্র তখন বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। এই বৃদ্ধই রাসবিহারীকে সংযত করিয়া তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ব্যয়িত শক্তিকে একত্রিত করিয়া একমুখী ও একাগ্র করিয়া তুলেন। তাঁহারই পরামর্শে সম্ভবতঃ রাসবিহারী উত্তর ভারতীয় ভাষা সমূহ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। এই সময় হইতেই রাসবিহারীর লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অমৃতবাজার প্রমুখ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে লিখিত "আর্ম্মস এক্ট" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ইংরাজ সরকার মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্ত্তীকালে—সম্ভবতঃ ১৯৩৭।১৯৩৮ সালে লিখিত তাঁহার আর একটী প্রবন্ধ "রাস্‌কেলি পিস অব্ লেজিসলেচার" অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতে

লিখিত ও জাপানে লিখিত রাসবিহারীর প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশিত করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু এ কাজ কে করিবে? আজও বাঙ্গালী রাসবিহারীর স্মৃতিরক্ষা করিবার কোন প্রকৃত চেষ্টা করে নাই। টোকিও রাসবিহারীর স্মৃতি বক্ষে করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে কিন্তু বাঙ্গলা আজও এই কৃতি সন্তানের প্রতি অর্ঘ্যদান করে নাই—ভাবিয়া দেখে নাই। অথচ বাঙ্গলায় সাতকোটী সন্তান!

এই সেদিন (জুন ১৯৫৪) কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক চন্দননগরে রাসবিহারীর পিতৃভবন দেখিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—

জানি না বাঙ্গালী কিরূপ জাতি। জাপান হইলে জাপানী এ বাটী মার্ব্বেল দিয়া মুড়িয়া দিত—ইহাকে পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করিত। আর এ বাটী ধ্বংস হইয়া যাইতেছে কাহারও লক্ষ্য নাই। এমন কি এ বাটীতে প্রবেশ করিবার গলিপথটুকুও সংস্কৃত হয় না। এযে জাতীয় ইতিহাসে কত বড় গৌরবের জিনিস, বাঙ্গালী তাহা বুঝে না—জানে না। ম্যাটসিনী গ্যারিবল্ডির পাশেই রাসবিহারীর স্থান!

সেদিন ডাক্তার অশোয়ার সহিত যখন বিজনবিহারীর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিজনবিহারীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"তোমরা তোমাদের মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য কি করিয়াছ? তোমরা কি এটুকুও জান না

বিনোদ বিহারীর চন্দননগরস্থ বসতবাটী
রাসবিহারীর বিপ্লব দীক্ষা আগার।
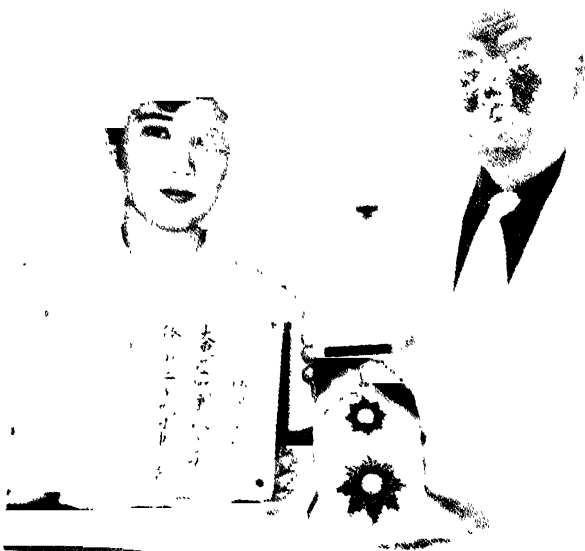
রাসবিহারীকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ জাপানী সম্মান পত্র ও পদক
রাসবিহারীর কন্যা শ্রীমতী তেতসুকো ও তাঁহার স্বামী শ্রীহিগুচি

যে জাতীয় উন্নতির মূলে জাতীয় মহাপুরুষের পূজা, তাঁদের স্মৃতি-তর্পণ? তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের কি সম্পদ দিয়া যাইতেছ যদ্দ্বারা তাহারা উত্তরকালে মহান হইয়া উঠিবে? কিসে তাহাদের আভিজাত্য গড়িয়া উঠিবে? স্পষ্টই বুঝা যায়, তোমাদের স্মৃতি ও ধীশক্তি রাহুগ্রস্ত, কারণ তোমরা জান না, রাসবিহারী, সুভাষ কত বড়! দেশের মুক্তির জন্য তাঁদের কি বিপুল স্বার্থত্যাগ, কি অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ!"

বিজনবিহারী ডাক্তার অশোয়ার এই প্রথম সাক্ষাতে এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অধোবদনে নীরবে ডাক্তার অশোয়ার বক্তব্য শুনিয়া চলিয়াছেন। প্রত্যেকটী কথা তাঁহাকে গভীরভাবে আঘাত করিতে লাগিল। ডাক্তার অশোয়া সেই একই সুরে বলিয়া চলিয়াছেন—"তোমরা জান না রাসবিহারী সুভাষ হইতেও বড়,—দরিদ্র রাসবিহারী, সহায় সম্পদহীন রাসবিহারী—দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েও, কি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন তাঁর মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্য! তাঁর প্রতিদিনের সাধনা ছিল দেশমুক্তি। রাসবিহারীর ভাববিলাস ছিল না। তিনি ছিলেন নীরব কর্ম্মবীর!"

বিজনবিহারী ডাক্তার অশোয়ার কথা নীরবে শুনিতেছিলেন। ডাক্তার অশোয়ার প্রশ্নে বিজনবিহারী সজাগ হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার অশোয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি রাসবিহারীর ভাই, তুমি রাসবিহারীকে দেশে প্রচারিত করিতে কি করিয়াছ? তুমি তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গলের জন্য তাদের কি আদর্শ দিয়াছ?"

বিজনবিহারী লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলেন না। নতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমার ক্ষমতা কতটুকু? আমায় চেনে কে? তার উপর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে, আর সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে আমি চূর্ণ বিচূর্ণ। মনে করিয়াছিলাম, দেশের নব যুবকদের শিক্ষা দিয়া মানুষ তৈয়ারী করিব। কিন্তু ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া একটীও মানুষ তৈয়ারী করিতে পারি নাই। আমার নিজ চরিত্রেই এমন অসংখ্য দুর্ব্বলতা আছে যার ফলে যেটুকু দেশের জন্য করিব মনে করিয়াছিলাম তাহা করিতে পারি নাই। তার উপর ভাষা কোথায়?"

অশোয়া হাসিয়া উঠিলেন। তীব্র বিদ্রূপের মত সে হাসি। হাসি থামিলে অশোয়া বলিলেন—"এক সামান্য নারী, তার শিক্ষা দীক্ষাই বা কতটুকু, তিনি জাপানে বসিয়া, জাপানী ভাষায় রাসবিহারীর জীবনী রচনা করিয়া, জাপানী জাতিকে সে জীবনী উপহার দিলেন, আর তুমি রাসবিহারীর ভাই হইয়া বলিতেছ তোমার শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, ভাষা নাই! রাসবিহারীর ভাইয়ের এ নিষ্ক্রিয়তা শোভা পায় না। বেশ, তুমি বাঙ্গলায় রাসবিহারীর জীবনী লেখ। তোমার যে ভাষা আছে, তাহাতেই লেখ, শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখ, প্রাণ ঢেলে দিয়ে লেখ। বলতে পারি, তুমি নিষ্ফল হবে না। তুমি লেখ, আমি লিখছি, তোমার আমার দেখাদেখি আরও পাঁচজন লিখবার চেষ্টা করবে।"

বিজনবিহারী বলিলেন "আমি যা' লিখব, তাতো শোনা কথাই বেশী—সে তো আর ইতিহাস হবে না।"

অশোয়া অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—"শোনা কথা? তুমি রাসবিহারীকে দেখ নাই? তোমার মা, বাবা, ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুরমার কাছে রাসবিহারীর কথা শুন নাই? এ সব কথা সকলেই শুনিয়া লেখে, তুমিও শোনা কথাই লেখ। সেটা ইতিহাসের চেয়ে ছোট নয়। সন তারিখ আর বড় বড় ঘটনা ইতিহাস নয়। ইতিহাস ঘটনা সংঘাত, ঘটনা সংঘাতের পিছনে যে চিন্তাধারা, যে বাধা বিপত্তি, যে ব্যক্তিত্ব তাহাই ইতিহাস। তাজমহলকে দেখিলে হইবে না, তাজমহলের পিছনে যে প্রেম ভালবাসা আছে, যে ব্যক্তিত্ব আছে, যে মানুষটা আছে, যে স্মৃতি আছে, সে সমস্তই দেখা চাই। নতুবা তাজমহল শুধু প্রস্তর-স্তূপ, বড়জোর কলা-বিদ্যার একটা নিদর্শন মাত্র বলে প্রতিভাত হবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অশোয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"জানো, পবিত্র রোমরাজ্যের একটী প্রাচীরও আজ দাঁড়াইয়া নাই? জানো? যাহারই আকার আছে তাহাই নশ্বর, তাহারই পরিণতি দুঃখময় ও বিভীৎস, যদিও একদিন তার ঔজ্জ্বল্য জগৎকে আকৃষ্ট করিত? কিন্তু মহামানবের জীবন-চিত্র অবিনশ্বর, সদা সৌন্দর্য্যময়। রাসবিহারী, নেতাজী এরা কালবিজয়ী পুরুষ। যতদিন যাইবে, ততই এদের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"

অশোয়া আরও অনেক প্রকার উৎসাহ দিবার চেষ্টা করেন।

বিজনবিহারী চিন্তা করিতে লাগিলেন—নানাসাহেব ও ঝান্সীর রাণীর সম্পত্তি ইংরাজ লুণ্ঠন করিয়া কি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে

তাহাদের নাম লুপ্ত করিতে পারিয়াছে ? নন্দকুমারের নামে গাঢ় কালিমা লেপিয়া, তাঁহাকে ফাঁসী দিয়া কি ইংরাজ তাঁহাকে মানব স্মৃতি হইতে মুছিয়া দিতে পারিয়াছে ? ডাক্তার অশোয়া সত্যই বলিয়াছেন,—"মহামানব কাল বিজয়ী।" কিন্তু ?—বিজন বিহারী ভাবিতে লাগিলেন, আমার অক্ষম লেখনীতে রাসবিহারীর মহান্ চরিত্র কিভাবে ফুটিয়া উঠিবে ? ঘোর সন্দেহ-দোলায় তিনি দুলিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল, কারণ তাঁহার পুত্র বিমানবিহারীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

১৯০৫।১৯০৬ সাল। রাসবিহারী চন্দননগরে আসেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন আরম্ভ হইয়াছে কি না মনে নাই। রাসবিহারী দুই তিনটী চরকা, তূলা, বিড়ির পাতা ও মশলা লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। পিতামহী ও মা রাসবিহারীর কাণ্ড দেখিয়া অবাক। পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কি হইবে ?"

রাসবিহারী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"সূতা পাকাইবে, বিড়ি তৈয়ারী হইবে।"

পিতামহী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া কালীচরণ ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। কালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?"

পিতামহী বলিলেন—"তোমার নাতির কাণ্ড দেখ ? এবার

আমরা সবাই সূতা কেটে, বিড়ি পাকিয়ে সংসার চালাইব।” বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

কালীচরণ সপ্রশ্নদৃষ্টিতে রাসবিহারীর দিকে চাহিলে, রাসবিহারী অঙ্গুলী সঙ্কেতে একতাল অম্বুরী তামাক দেখাইয়া বলিলেন—

“ঐ তামাক খাইবেন, ও সূতা তৈয়ারি তদারক করিবেন।” কালীচরণ প্রশ্ন করিলেন “সূতা কি হইবে?”

রাসবিহারীর উত্তর আসিল—“কাপড় বোনা হইবে, আর ঐ বিড়ী তৈয়ারি হইবে।”

কালীচরণের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন “বেশ! দোষ কি?”

বহুদিন নিয়মিতভাবে এই সূতা কাটা ও বিড়ী তৈয়ারি চলিয়াছিল।

এইখানে একটী ছোট গল্প বলিয়া রাসবিহারীর জীবনের এই অংশ শেষ করিব।

১৯০৮।১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাস। বিজনবিহারী প্রমোশন পাইয়া নূতন পুস্তকের তালিকা আনিয়া মাকে দিলেন। মা বলিলেন—“পুরাণ বইয়ের বাক্স খুলিয়া দেখ, কোন বই পাওয়া যায় কি না?”

বিজনবিহারী পুরাণ ভাঙ্গা বাক্সটী খুলিয়া বই বাছিতে বসিলেন। তিনি দুই একখানি পুস্তক বাছিয়া একদিকে রাখিয়া তখনও পুস্তক বাছিতেছেন, এমন সময়ে রাসবিহারী ভিতরে

প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কর্চ্ছিস্ রে ?"

বিজনবিহারী মাতৃ আদেশ জানাইলেন। রাসবিহারী হুঙ্কার দিয়া ডাকিলেন—"মা ?"

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, ত্বরিত গতিতে বাহিরে আসিলেন। রাসবিহারী অঙ্গুলী সঙ্কেতে প্রশ্ন করিলেন—"এটা কি ?"

মা বুঝিতে না পারিয়া রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাসবিহারী পুস্তকগুলি উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ডাল ভাতের পুঁটলী পড়ে শিখবে কি ? ও দেখলেই তো মন দমে যায়, তো পড়বে কি ?"

মা প্রতিবাদের সুর তুলিতেই রাসবিহারী বলিলেন—"ও তুমি উনানে আগুন দিও মা, শীঘ্র উনান ধর্ব্বে, ওতে আর কিছু হবে না।" মা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

রাসবিহারী ভ্রাতার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেইদিনই ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় নূতন বই, জলছবি এবং ভ্রাতার জন্য নূতন জামা কাপড় কিনিলেন। তাহার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আহারাদি সমাপনান্তর ভ্রাতাকে লইয়া পরমোৎসাহে জলছবি আঁটিতে বসিলেন। জলছবি আঁটা শেষ হইলে ভ্রাতার কাণ ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—

"এইবার এই মলাটের এ দিক থেকে নিয়ে মলাটের শেষ পর্য্যন্ত পড়বি। সব মুখস্থ কর্ব্বি। না হ'লে মাথাটা ভেঙ্গে ছাতু কর্ব্বো।"

মা শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রাসবিহারী মার হাসি দেখিয়া মন্তব্য করিলেন—

"বেটী! তোমার বাবা কখনও লেখাপড়া করেছিল যে তুমি লেখাপড়ার মর্ম্ম বুঝবে ?"

মা জবাব দিলেন—"না—সে তো দেখতেই পারছ"।

দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রাসবিহারী কোড়লা গ্রামে (আন্দুলের নিকট) ভগিনী সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই ভগিনী বাল বিধবা। সকল কার্য্যের মধ্যেই তাহার জন্য রাসবিহারীর অন্তর কাঁদিত। মৃত্যুর দিনেও এই ভগিনীর কথা ভাবিয়া রাসবিহারীর অন্তর কাঁদিয়াছিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাসবিহারী এক বন্ধুর সহিত সাইকেলে কোড়লা গিয়াছিলেন। সুশীলার দেবর শ্রীমন্মথনাথ সরকার ও তাঁহার মাতা, রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর বহুসমাদরের ক্রুটী করেন নাই। রাত্রির আহারাদির পর রাসবিহারী সকলের সহিত আলাপ করিতে করিতে কার্য্য বিশেষের জন্য দ্বিতলের ছাদে উঠিলেন। তথা হইতে ফিরিয়াই তিনি বলিলেন—

"এইবার আমায় বিদায় দিন। আমি এখনই যাইব। বহুদূরদেশে যাইবার পূর্ব্বে কেবল আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।"

রাসবিহারীর বন্ধু বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিবার উদ্‌যোগ

করিতেছিলেন। রাসবিহারী তাঁহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পুলিশ সমগ্র বাটী ঘিরিয়া ফেলে। গ্রামময় একটা আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশ এখানে অতি তীব্রভাবে খানাতল্লাসী চালাইয়াছিল।

রাসবিহারীর জীবনে এইটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি বহুবার মৃত্যুর মুখ হইতে অতি অসম্ভবরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। কতটা তাঁহার সহজ বুদ্ধি ও সতর্কতা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে আর কতটা দৈব নিজ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহা বলা সত্যই কঠিন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় অঙ্ক

রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ভারতের ললাটে দাসত্বের উল্কি মুদ্রিত করিয়া দেয়। ইংরাজ সন্তান ক্লাইভ ও মুসলমান সন্তান মির্জ্জাফর তখন পরম বন্ধু। এই বন্ধুত্বের পরিণামে প্রত্যেক ভারতীয়ের সর্ব্বাঙ্গে উল্কির মসীলেখা মুদ্রিত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস হইতে লর্ড ডালহাউসী পর্য্যন্ত সকল শাসন-কর্ত্তাই প্রায় বিনা ব্যয়ে ও প্রভূত লাভে ভারতে এক বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। ভারতের কুটীর শিল্প ও জাতীয় শিল্প, যাহার আকর্ষণে ইংরাজ একদিন ভারতে বণিক বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই শিল্পেরও

মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সমগ্র দেশকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিলেন। জগতে তাহারা প্রচার করিলেন, ভারত শুধু কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতের অধিবাসীরা অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য। ভারতকে সুশিক্ষিত করিবার দায়িত্ব ঈশ্বর তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সে দায়িত্ব তাঁহারা বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহন করিতেছেন। ইহা যে ঈশ্বরের নামে শয়তানের শপথ, তাহা বলাই বাহুল্য।

১৮৫৭ সালে এই নির্বিবচার শোষণ-নীতির ফল ফলিল। হিন্দুমুসলমান একযোগে স্বাধীনতা লাভের জন্য ও স্ব স্ব অধিকার রক্ষণের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন প্রদানে কাতর হইল না। হিন্দু-মুসলমান তখন একই বৃক্ষের দুই শাখা—একই মায়ের দুই সন্তান। দুই ভাই তখন প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে ইংরাজ তার শোষণ-নীতি পরিবর্ত্তন করিল না, পরিবর্ত্তন করিল মাত্র শোষণের পন্থা। ইংরাজ অসি ও গোলাগুলির পরিবর্ত্তে যে অস্ত্র ব্যবহার করিলেন, তাহা ভারতের সভ্যতার ভিত্তি ও কৃষ্টিকে সবলে আঘাত করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিল। ইংরাজ, ক্লাইভ ও মির্জাফরের মৈত্রী ভুলিয়া গেল।

রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রকে ভারতের ম্যাগ্নাকার্টা (Magna Carta) বলা হয়। সত্যই মাগ্নাকার্টা—তবে চির-দাসত্বের মাগ্নাকার্টা। পূর্ব্বে এক বণিক সম্প্রদায় ভারত লুণ্ঠণ করিতেছিল; এই পত্রের ফলে সমগ্র ইংরাজ জাতির এই লুণ্ঠণে

যোগ দিবার সুযোগ হইল। ভারতের প্রজার উপর অত্যাচার যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ইংরাজ বণিকের হস্তে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হইল। ইংরাজ চাণক্য বর্ণিত চাতুর্য্য নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। সম, দম, ভেদ ও দান নীতির মধ্যে দমন ও ভেদ নীতি পুরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইল। সপ্ত কৃষ্ণস্তম্ভের উপর ভারত রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইল। এই সপ্তস্তম্ভ—

(১) বিরাট সৈন্য বিভাগ
(২) সরকারী কর্ম্মচারী বিভাগ
(৩) ইংরাজ চালিত বিচার বিভাগ
(৪) ইংরাজী প্রথায় শিক্ষা বিভাগ
(৫) শাসন বিভাগ ও শাসন পরিষদ
(৬) স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ
(৭) উপাধিদান বিভাগ

১৮৫৮ সালের রাণীর ঘোষণাপত্র, ১৮৯৭ সালে রাণীর অঙ্গীকার, ১৯০১ সালে রাজা এডওয়ার্ডের অঙ্গীকার সমনীতির পরিচায়ক। বিশিষ্ট রাজভক্তদের বড় বড় পদ দানে, নানা অন্তঃসারশূন্য উপাধি দানে দাননীতির আত্ম-বিকাশ। স্কুল কলেজের শিক্ষাদ্বারা ভারতীয়কে ভারতীয় নীতি, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধা শিক্ষাদান, পুরাতন আভিজাত্যের মূলে আঘাত ভেদনীতির অভিনব অভিনয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ,

১৯০৬ সালে মুসলমানদের হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করণ, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণের ঈর্ষার বীজ রোপণ এই ভেদ-নীতির অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ। নূতন ইংরাজ-অনুগৃহীত অভিজাত বংশ, পুরাতন ও সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দলিত করিয়া অভূতপূর্ব্ব কিম্ভূত কিমাকার একটা সমাজ গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ফলে চারিদিকে ঈর্ষা, দলাদলি বিশৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়িল।

ইংরাজ প্রথমে বাঙ্গালায় প্রথম রাজাসন পাতিয়া বসে। আর সেই বাঙ্গালার ব্যারাকপুরেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মেঘগর্জ্জন শ্রুতিগোচর হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার সুরেন্দ্রনাথ (Surrender Not) সেই বাঙ্গলায় প্রথম এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। একদিন এই সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত নেহেরু এই সুরেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাঁর 'ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়ায়' সুরেন্দ্রনাথকে স্থান দিতে পারেন নাই। ইহা ভ্রমবশতঃ উহ্য বলিয়া অনেকেই গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের ফলে ভারতের নানাস্থানে আন্দোলনের সুরু হইল। বাঙ্গলায় বিদেশী-বস্ত্র-বর্জ্জন-সঙ্ঘ ইহার অন্যতম ফল। ক্রমে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। ইংরাজ দলে দলে আন্দোলনকারীদের ধৃত করিয়া

কারাগারে আবদ্ধ করিয়া নানারূপে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। ফল হইল অধিকতর বিষময়।

অরবিন্দ ও বারীন্দ্র বিলাত হইতে বরদায় আসিলেন এবং অরবিন্দের পরামর্শে বারীন্দ্র বরোদা হইতে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। স্থানে স্থানে গোপনে বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিল। এই সকল দল ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় বিপ্লবকার্য্য চালনা করিতে লাগিল। কলিকাতায় যুগান্তর, ঢাকায় অনুশীলন, চন্দননগরে প্রবর্ত্তক, মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রবসুর সমিতি ইত্যাদি সঙ্ঘ ইহার পরিচয় স্থল। অচিরে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিল। সেই সময়ের সংবাদপত্র হইতে কয়েকটী মূল ঘটনার সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ডিসেম্বর ১৯০৭—(১) নারায়ণগড়ের নিকট বাঙ্গলার রাজ-প্রতিনিধির স্পেশ্যাল ট্রেণ লাইনচ্যুত করিয়া ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা বিফল হয়।

(২) গোয়েন্দা মিঃ এলেনের উপর বোমা নিক্ষেপ। এ চেষ্টাও বিফল হয়। বোমাটি নিতান্তই অনভিজ্ঞের দ্বারা প্রস্তুত।

মার্চ ১৯০৮—(১) চন্দননগরের নিকট বাঙ্গলার রাজপ্রতিনিধির ট্রেন ধ্বংসের প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা নিষ্ফল।

(২) কুষ্টিয়ায় হিগিনবথামকে গুলি করিবার চেষ্টা। অনভ্যস্ত হস্ত।

২১শে এপ্রিল ১৯০৮—চন্দননগরের মেয়রের উপর নিস্ফল বোমা নিক্ষেপ।

৩০শে এপ্রিল ১৯০৮—মুজাফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ীর মধ্যে বোমা নিক্ষেপ। বোমা নিক্ষেপকারী বালক ক্ষুদিরাম ধৃত হইয়া ফাঁসী যায় এবং অন্যতম বোমানিক্ষেপকারী প্রফুল্ল চাকী ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করে। এই বোমানিক্ষেপের ফলে ইংরাজ সচেতন হইয়া উঠে ও গুপ্ত বিভাগ অতিশয় তৎপর হইয়া ওঠে। বহু বিপ্লবী ধরা পড়ে। শ্রীঅরবিন্দও বিপ্লবী বলিয়া ধৃত হন।

আগষ্ট ১৯০৮—জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্র গোঁসাইকে গুলির দ্বারা বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত হত্যা করেন। চন্দননগরস্থ কানাইলাল ও মেদিনীপুরস্থ সত্যেন্দ্রের ফাঁসী।

৬ই নভেম্বর ১৯০৮—কলিকাতা টাউনহলে রাজপ্রতিনিধিকে হত্যার নিষ্ফল চেষ্টা।

৯ই নভেম্বর ১৯০৮—পুলিশ ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়কে হত্যা।

৯ই নভেম্বর ১৯০৮—পুলিশের গুপ্ত সংবাদ প্রেরক স্থকুমারকে হত্যা।

ফেব্রুয়ারী ১৯০৯—উকিল আশুবিশ্বাসকে পুলিশ-কোর্টের মধ্যে হত্যা।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকটীর সহিত রাসবিহারীর যোগ ছিল। মুরারীপুকুর বোমা কারখানার সহিতও রাসবিহারীর যোগ ছিল। কিন্তু রাসবিহারী তখনও সম্মুখে আসেন নাই, নায়কত্বও গ্রহণ

করেন নাই। রাসবিহারী তখন একজন কর্ম্মীমাত্র, তিনি কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। মুরারীপুকুর বোমার কারখানা আবিস্কৃত হইবার পর রাসবিহারী আত্মগোপন করেন। তিনি তখন ডেরাডুনে বনবিভাগে কর্ম্ম করিতেছিলেন।

মানিকতলা বা মুরারীপুকুর বোমার কারখানা আবিষ্কারের পর একটি বিষয়ে ইংরাজ সরকারের চক্ষু উন্মিলীত হইল। তাহারা পরিষ্কার বুঝিলেন বিপ্লবীরা অপরিণত বয়স্ক হইলেও চরিত্রবান ও নির্ভীক এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে এমন একদল চিন্তাশীল আদর্শবাদী শিক্ষিত লোক আছেন যাঁহারা এই বিপ্লববাদীদের শিক্ষা, দীক্ষা ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, দেশের লোকে এই স্বদেশ-সেবকদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেছেন।

ইংরাজ সরকার গুপ্তচর বিভাগের উপর চাপ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; তাঁহারা উন্মত্তের মত চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া যাহাকেই সন্দেহ হইল তাহাকেই নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র বসুর নির্ভীকতা দর্শনে নিখিল বঙ্গ যুবকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সাংবাদিক মহলেও একটা নির্ভীকতার সুর বাজিয়া উঠিল। সাংবাদিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় অভিযুক্ত হইয়া প্রকাশ্য আদালতে বলিলেন—"আমার জন্মভূমির মুক্তির জন্য আমার যে সামান্য শক্তি ব্যয় করিয়াছি—আমি বিদেশীয় রাজশক্তির নিকট তাহার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।"

ইংরাজ রাষ্ট্রনায়করা দিশেহারা। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া তাঁহারা, যাঁহার মধ্যে স্বাধীন চিন্তা দেখিলেন, তাঁহাকেই কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এইরূপে প্রথমে কারারুদ্ধ হইয়া দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন :—

(১) অশ্বিনীকুমার দত্ত (২) সুবোধচন্দ্র মল্লিক (৩) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (৪) কৃষ্ণকুমার মিত্র (৫) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (৬) পুলিনবিহারী দাস (৭) সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৮) শচীন্দ্র প্রসাদ বসু (৯) ভূপেশচন্দ্র নাগ (১০) চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি। ইংরাজ সরকার সভা সমিতি ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন ও বহু সংবাদপত্র জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞরা এতদিন হিন্দু-মুসলমান-ভেদ প্রশ্ন লইয়া মাতিয়া ছিলেন। এইবার হিন্দুর বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির জন্য তাঁহারা নানারূপ পন্থা উদ্ভাবনের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গলার বিপ্লব প্রাঙ্গনে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব

বাঙ্গলার বিপ্লবীরা বিপর্য্যস্ত হইয়াও কোনমতে তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় ক্ষীণ শিখা প্রজ্বলিত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিপ্লব প্রাঙ্গণে দেখা দিলেন এক অসীম তেজস্বী ব্রাহ্মণ। অচিরে বিপ্লবের কর্ণধার হইয়া বসিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী,

একজন সাংকেতিক লেখক (Stenographer)। দাম্ভিক ইংরাজের কৃষ্ণকায় বিদ্বেষ তাঁহার মনকে বাল্য হইতেই পীড়া দিত। কর্ম্মপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন ভারতীয়ের প্রতি অন্যায় অপমানকর ব্যবহার তাঁহাকে ইংরাজ-বিদ্বেষী করিয়া তোলে। তিনি নিজেও পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইয়া সঙ্কল্প করিলেন যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন অত্যাচারী ইংরাজের উচ্ছেদ সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিপ্লবে যোগ দিলেন। তিনি অল্পদিনেই কলিকাতায় বিপ্লব পন্থীদের নেতা হইয়া বসিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার বহু যুবক বিপ্লবদলেই শুধু যোগ দিল না, মৃত্যুবরণও করিল। যতীনের পশ্চাতে রহিলেন শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্ত্তী। অবিনাশ ছিলেন অর্থবান ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তিনি সরকারী পদ পরিত্যাগ করেন ও সমস্ত অর্থ বিপ্লবের জন্য ব্যয় করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়া লন। আরও একজন বিপ্লবীর নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ইনি শ্রীযদু গোপাল মুখোপাধ্যায়। ইনিও যতীনের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহারই চেষ্টায় সমগ্র বাঙ্গলার বিপ্লবীরা দলবদ্ধ হয়। যতীন বাঙ্গলার সেচ্ছাসৈন্যবাহিনী প্রস্তুতে মনোযোগ দেন। সৈন্যের নানাবিভাগের জন্য তিনি বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ ও গঠনের চেষ্টা করেন। এইসকল বিভাগের কার্য্যপ্রণালীও তিনি বিধিবদ্ধভাবে চালিত করেন। তিনি জার্ম্মাণী হইতে অর্থ সাহায্য ও বিশেষজ্ঞ আনয়নেরও ব্যবস্থা করেন এবং

রাসবিহারীর পিতা পরলোকগত
বিনোদ বিহারী বসু

দেশের মধ্যেও অর্থ ও সস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এদিকে 'ভারতের মুক্তি কোন্ পথে', 'ভারতের রণনীতি' প্রভৃতি পুস্তক যুগান্তর কর্ত্তৃক রচিত হইয়া দেশে প্রচারকার্য্য ও লোকশিক্ষা চালাইতে লাগিল।

বাঙ্গলার এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ স্মরণ করিয়ে দেয় মহারাজ নন্দকুমারকে, মনে পড়িয়ে দেয় পাটলিপুত্রের চাণক্যকে। এঁরা সমগোত্রজ, এঁরাই যুগে যুগে আনিয়াছেন নব জাগরণ।

রাসবিহারীর বিমাতার মৃত্যু ও বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী

রাসবিহারীর বিমাতা রাসবিহারী হইতে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। রাসবিহারীর পিতা উপযুক্ত স্ত্রী মনোনয়নে ভুল করেন নাই। এই অল্পবয়স্কা পল্লী-কিশোরী সহজেই মাতৃহীনা সন্তানদের মাতৃস্থান অধিকার করিয়া লয়েন। তিনি রাসবিহারীকে নিজ পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করিতেন। রাসবিহারীও বিমাতার সামান্যমাত্র ইচ্ছাও পূরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। রাসবিহারীর বিমাতা মৃত্যুকালে রাসবিহারীকে শ্রাদ্ধাধিকারী করিয়া যান। বিমাতার মৃত্যু-শয্যায় রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমায় কিছু তোমার আদেশ আছে?"

"মাতার মৃত্যুক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—আছে। হরিদ্বারে আমার শেষ কার্য্য কোরো। আজ ওরা তোমারই মত অভাগা হ'ল। ওদের দেখো। তোমার ব্রতের

কথা জানি—আশীর্ব্বাদ।" মায়ের হাত ঈষৎ উঠিয়াই বিছানার উপর পড়িয়া গেল। রাসবিহারী মায়ের হাত তুলিয়া নিজ মাথায় রাখিলেন। ধীরে ধীরে মায়ের শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইল। প্রাণহীন দেহ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

মানুষের জীবনে ক্ষুদ্রতম ঘটনা সময়ে সময়ে জীবনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত করে। রাসবিহারীর জীবনেও এই ঘটনা সংঘাত, জীবনের পথ ও গতি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাসবিহারীর বিমাতার মৃত্যুর তুইদিন পূর্ব্বেই তাহার তৃতীয় ভ্রাতা আগুনে পুড়িয়া যান। রাসবিহারীর বিমাতা স্বামীর ক্রোড়ে মাথা ও রাসবিহারীর ক্রোড়ে পদদ্বয় রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইহারই তুইদিন পরে রাসবিহারীর কোলের ভিতর তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা দেহত্যাগ করেন। সমগ্র পরিবারটীর উপর দিয়া একটা বিরাট ঝড় বহিয়া গেল। যে বৃক্ষটীর শাখার পল্লবের নীচে একটী পরিবার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা আজ সমূলে উৎপাটিত। আর সে শ্যামল স্নেহছায়া নাই। সকলেই বিভ্রান্ত—সকলেই বিষাদগ্রস্ত। বিনোদবিহারী ভগ্নোদ্যম। প্রথম পত্নীর বিয়োগে তিনি এমন কাতর হইয়া পড়েন নাই। সে বিয়োগ ঘটিয়াছিল যৌবনের মধ্যাহ্নে—তাই সে ক্ষত শুকাইতে বিলম্ব হয় নাই। সে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছিলেন দ্বিতীয়া পত্নী নিজ আদর্শ চরিত্রে, দয়া দাক্ষিণ্যে, স্নেহমমতায় ও মহত্ত্বে, তাই বার্দ্ধক্যের আগমনের সহিত সেবাপরায়ণা সতীর বিয়োগ-বেদনা তাঁহাকে অভিভূত

করিয়াছিল—একেবারে দিশেহারা করিয়া দিয়াছিল। আর রাসবিহারী ?

উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণে ও দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে রাসবিহারীর সর্ব্বশরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে। অবসন্ন দেহ রাসবিহারীর চক্ষে গভীর ঘন কৃষ্ণমেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ছোট ছোট মাতৃহারা ভাই বোনেরা গভীর ব্যথায় বাক্‌হারা। সমগ্র পরিবারটী যেন ব্যাকুল নয়নে তাঁহারই নিকট সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সমগ্র বাটীতে রাসবিহারীর গোপনে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবার স্থান কোথাও নাই! পিতাকে, ভাই বোনদের সকলকেই এই পরম মুহূর্ত্তে সান্ত্বনা দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। ভাঙ্গিয়া পড়িলে রাসবিহারীর চলিবে না। রাসবিহারী ধীর ও স্থির। রাসবিহারী কখনও মাতৃহারা ভাই বোনকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, কখনও পিতার নিকট বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

একদিন বিনোদবিহারী বাহিরের ঘরে একা বসিয়া আছেন। এক হাতে গড়গড়ার নল ধরিয়া আছেন। তুই চক্ষু দিয়া অবিরলধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। কখন তামাকু পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি জানেন না। রাসবিহারী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে নীরবে বসিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়ে নীরব। হঠাৎ রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন—

"বাবা! আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? মার মৃত্যু,

পুলিনের মৃত্যু সবই তো ভগবানের দেওয়া। সবই তো ভগবানের নির্দ্দেশে ঘটেছে। তবে?”

বিনোদবিহারী নলে টান দিলেন। গড়গড়া হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনোদবিহারী নল ফেলিয়া দিলেন। রাসবিহারী বলিলেন—

“আপনি কি ভগবানের নির্দ্দেশ খুঁজে পাচ্ছেন না? আমি কিন্তু পাচ্ছি।”

বিনোদবিহারী পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। তখনও তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। সেই ব্যথা ভরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি রাসবিহারী সহ্য করিতে পারিলেন না। ঘর হইতে নিস্ক্রান্ত হইতে হইতে বলিলেন—

“আমিত্ব ভুলুন। মনে করুন নিজকে তৃতীয় পুরুষ একবচন, উত্তমপুরুষ একবচন নয়। আমি যে মুহূর্ত্তে নিজকে তৃতীয় পুরুষ একবচন মনে করিয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছি, এ বন্ধন ছিন্ন একান্ত আবশ্যক ছিল। ভগবানের উদ্দেশ্য বড়ই গূঢ়, বড়ই গুরুতর। আপনি তো ভগবৎ ভক্ত, ভগবানে বিশ্বাসী, আপনাকে……”

রাসবিহারীর স্বর শূন্যে মিলাইয়া গেল। রাসবিহারীর পিতা দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুখের দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায় কেহ বুঝিতে পারে না; আর দুঃখের দিন পার হয় অতি ধীরে, কিন্তু

সেও গত হয়। এই পরিবারেরও দিন কাটিতে লাগিল। বিনোদবিহারীও উঠিয়া বসিলেন। মৃতপত্নীর শ্রাদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাসবিহারী নূতন প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। রাসবিহারী বলিলেন—

"বাবা! মা আমায় শ্রাদ্ধাধিকারী ক'রে গেছেন। তিনি শেষ অনুরোধ করে গেছেন, যেন তাঁর শ্রাদ্ধ হরিদ্বারে হয়। আমি হরিদ্বারেই মার শ্রাদ্ধ করবো।"

বিনোদবিহারী বলিলেন—"কিন্তু"—

রাসবিহারী বলিলেন—"কোন কিন্তু নেই বাবা! মার শেষ ইচ্ছা আমি যদি পূরণ কর্ত্তে না পারি, তা হ'লে আমি শান্তি পাবো না।"

হরিদ্বারে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। অতএব সপরিবারে প্রথমে রাসবিহারীর কর্ম্মস্থান ডেরাডুনে যাওয়াই স্থির হইল। বাটীর ব্যবস্থা করিবার জন্য রাসবিহারী অগ্রে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পরে বিনোদবিহারী সপরিবারে ডেরাডুনে পৌঁছিলেন। রাসবিহারী তখন ডেরাডুনে ঘোষী মহাল্লায় একখানি দ্বিতল বাটীর দ্বিতলে বাসা বাঁধিয়াছেন।

রাসবিহারীর বিছানা দেখিয়া বিনোদবিহারী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ঘরের মেঝের উপর একখানি সাধারণ দেশী কম্বল পাতা, গায়ে দিবার জন্যও একখানি কম্বল। বালিশ নাই, বেহালার বাক্সটাই বালিশের কাজ চালাইয়া দেয়। টেবিলের উপর দুইখানি সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান ও নানা বিষয়ক পুস্তক।

রাসবিহারীর বিছানার পাশেই দৈনিক অমৃতবাজার, ডেলি নিউজ, উদ্বোধন, স্বামীজীর কর্ম্মযোগ, ম্যাটসিনীর জীবনী। রান্নাঘরে দুইটী লৌহ কেতলী, ও গোটা দুই কেরোসিন তৈলের টিন, একখানি কলাইয়ের থালা, গোটা দুই চায়ের পিয়ালা ও ডিস। বিনোদবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার রান্নাই বা কিসে হয় আর তুমি খাওই বা কিসে ?"

রাসবিহারী হাসিতে লাগিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন— "ঐ কেতলীতেই ফুটিয়ে নিই। হবিষ্যি বইতো নয়।"

"এখন না হয় হবিষ্যি—কিন্তু তার আগে ?" রাসবিহারী বলিলেন—"ঐ কেতলীতেই চলে যায়।"

শ্রাদ্ধ যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। বিনোদবিহারীর ছুটী ফুরাইয়া আসিতেছে। এইবার তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে ফিরিতেই হইবে। রাসবিহারীর ইচ্ছায় ভাই বোনেরা তাঁহার নিকট রহিয়া গেল। বিনোদবিহারী একা তাঁহার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

কয়েকদিন রাসবিহারী ভাই বোনদের লইয়া ডুবিয়া রহিলেন। রাসবিহারীকে কেন্দ্র করিয়া ভাই বোনেরা ঘুরিতে লাগিল। আর মায়ের অভাব তাহাদের পীড়া দেয় না। তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে দিন শনিবার। অফিস হইতে ফিরিতেই সিঁড়ীর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। রাসবিহারী কাপড় ছাড়িতেছিলেন। তিনি বারান্দা হইতে উঁকি দিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন ও দুইজন

ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। অনেকক্ষণ ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা আলাপ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাসবিহারী জলপান করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় নয়টা—কিন্তু তখনও তিনি ফিরিলেন না। ভাই বোনেরা আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। রাসবিহারীর আহার্য্য একস্থানে চাপা দিয়া রাসবিহারীর মাসীমা অপেক্ষা করিতে করিতে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রাসবিহারী রাত্রিতে ফিরিলেন না। তিনি ফিরিলেন পরদিন অপরাহ্নে। রাসবিহারীর মুখ গম্ভীর, কপালে গাঢ় চিন্তার রেখা। কেহ কিছুই প্রশ্ন করিলেন না, রাসবিহারীও কোন কথা বলিলেন না।

ইহার পরই দেখা গেল, নানালোকে রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কখনও তাঁহারা থাকিয়া যান দুই একদিন। তাঁহারা কে, তাঁহাদের সহিত রাসবিহারীর কি কাজ, কিছুই বোঝা যায় না। ইহাদের মধ্যে দুইজনের কথা বিজনবিহারীর বেশী করিয়া মনে পড়ে। একজন প্রায়ই আসিতেন—তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একজন তরুণ ব্রহ্মচারী, আর দ্বিতীয় অতি কৃষ্ণকায় ও খর্ব্বদেহ ছিলেন। ইনিও ব্রহ্মচারী ছিলেন, ইহাঁকে বিজনবিহারী দেখেন লচমন-ঝোলায়। ইনি কোন্ দেশীয় লোক ছিলেন বলা শক্ত, ইনি প্রায়ই ইংরাজীতে অতি দ্রুত কথা বলিতেন। ইহার বিশেষত্ব ছিল ইহার অপূর্ব্ব চক্ষুজ্যোতি, মনে হইত, যেন চক্ষুদুটীর মধ্যে সহস্র বাতির তেজময় জ্বালা।

রাসবিহারী ইহার পর হইতেই চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ভাই বোনেরা আর রাসবিহারীর সঙ্গ পায় না। ছোট বোনটী তখন মাত্র একবৎসরের—রাসবিহারীর অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু তাহাকেও রাসবিহারী দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। যে দাদাকে দেখিলে ভাই-বোনেরা আনন্দে আত্মহারা হইত, এখন তাহারা সেই দাদাকে ভয় করে। যে দাদাকে তাহারা চিনিত, সে এ দাদা নয়।

রাসবিহারীর চিন্তা চরমে উঠিল। নিদ্রা ক্রমশঃ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি অবিরত দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বহুরাত্রি তিনি পদচারণ করিয়া ভোরের দিকে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। কখনও রাত্রিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বেহালার সঙ্গে 'মা, মা' চীৎকার করিতেন। রাসবিহারী প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হইলেন। জ্বরের ঘোরেও এই 'মা, মা' ধ্বনি। জানি না এ আহ্বান তাঁর কোন্ মা কে, এ ব্যাকুল করুণা ভিক্ষা কোন্ মার কাছে।

কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর রাসবিহারী সুস্থ হইলেন। মস্তিষ্কের প্রবল চাপ প্রশমিত হইল। রাসবিহারীর সকল সঙ্কট, সকল সন্দেহ, সকল দ্বিধা ও দ্বন্দ দূর হইল। যে দুর্ব্বলতা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেশ সেবায় ব্রতী হইলেন। এইবার বোধ হয় তাঁহার সকল সংসার বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি সকল পরিবারকে চন্দননগরে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া পিতাকে লিখিলেন। ১৯১১সালের জুলাই মাসে রাসবিহারীর ভ্রাতা ও ভগ্নীরা চন্দননগরে আসিলেন।

সংসারের কর্ত্তা ও কর্ত্রী হইলেন মামা ও মাসী। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটিল। পথে নিক্ষিপ্ত কুকুর বিড়ালের মত রাসবিহারীর ভাইয়েরা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিয়মিত অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহারা পীড়িত হইয়া পড়িল।

রাসবিহারী প্রতিবেশীদিগের পত্রে এ সংবাদ পাইলেন। তিনি আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ছুটী লইয়া দেশে আসিলেন ও সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ দিলেই রোগ সারে না, পথ্য চাই, সেবা চাই। রাসবিহারী তাহার কি করিবেন ? কোন উপায় নাই।

যখন বাঙ্গলার বিপ্লবীরা যতীনের অধিনায়কত্বে প্রায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় রাসবিহারী বিপ্লব আকাশে সহসা উদিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই ভারত জার্ম্মান ষড়যন্ত্রে তিনি গোপনে কাজ করিতেছিলেন। এখন বাঙ্গলার বিপ্লবী নায়ক যতীনের সঙ্গে তাঁহার যোগসূত্র স্থাপিত হইল। রাসবিহারী তখন ছিলেন ডেরাডুনের বনবিভাগ দপ্তরের বড় বাবু।

বাঙ্গলা হইতে বসন্ত বিশ্বাস বলিয়া এক যুবক রাসবিহারীর নিকট আসিয়া জুটিল ও তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিল। বাহিরে প্রকাশ রহিল, বসন্ত চাকুরী অন্বেষণে রাসবিহারীর নিকট আসিয়াছে এবং এতই দুস্থ যে রাসবিহারী কেবল দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে নিজ রন্ধন ও অন্যান্য কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন। বসন্ত বোমা প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত ছিল। হার্ডিঞ্জ বোমা ব্যাপারে এই বসন্তবিহারীর ফাঁসি হয়। এই হার্ডিঞ্জ বোমা ব্যাপারের পর

রাসবিহারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া উত্তর ভারতে পূর্ণ উদ্যমে বিপ্লবকর্ম্ম চালাইতে ছিলেন।

ইন্দো জার্ম্মান ষড়যন্ত্র ব্যাপারে বহুবার রাসবিহারী ও যতীন একত্রিত হন। কখনও তাঁহারা চন্দননগরে, কখনও কাশীতে, কখনও ডেরাডুনে, কখনও বা অন্যত্র মিলিত হইয়া কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করিতেন। ক্রমে রাসবিহারীর সংগঠন-শক্তি, তাঁহার বহুভাষাজ্ঞান, তাঁহাকে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তিনি বিপ্লব পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বারানসী কেন্দ্রে পূর্ব্ব হইতেই শচীন সান্যাল কাজ করিতেছিলেন। তিনি রাসবিহারীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রাসবিহারী প্রত্যেক সৈন্যাবাস পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ বীজ বপন করিতে লাগিলেন।

পাঞ্জাবের গদ্দর নেতা হরদয়াল ও রাসবিহারী একত্রিত হইলেন। হরদয়াল ছিলেন প্রতিভাবান ছাত্র। তিনি বৃত্তি লইয়া বিলাত গমন করেন ও সেখানে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া গদ্দর ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব করিতে থাকেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি বাঙ্গালী বিপ্লবীদের সংশ্রবে আসেন ও তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমেরিকায় 'যুগান্তর আশ্রম' স্থাপিত করেন। বিপ্লবী পিঙ্গলে ও সত্যেন সেন এই সময় ভারতে ফিরিয়া আসেন। পিঙ্গলে রাসবিহারীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া রাসবিহারীর সহিত যোগ দিলেন, সত্যেন বাঙ্গলায় রহিয়া গেলেন। পিঙ্গলে ভারতের

উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, অবিরত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন সকল কেন্দ্রের যোগসূত্র। এই বীর মারাঠি যুবক কলিকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে প্রভৃতি কেন্দ্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

১৯০৮ সালের উপর্য্যুপরি বাঙ্গলা রাজপ্রতিনিধি, ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের উপর আক্রমণের ফলে নূতন গুপ্তচর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই গুপ্তচর বিভাগ প্রভূতভাবে বর্দ্ধিত হয়। পুলিশও সাধারণ চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীদের পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লবীদের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যেকটী ভদ্র শিক্ষিত যুবককে পুলিশ ছায়ার মত অনুসরণ করিতে লাগিল। চুরি ডাকাতি ধরিলে আর পুলিশ কর্ম্মচারীর উন্নতি নাই, কিন্তু কোন শিক্ষিত যুবকের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিলেই নিশ্চয় উন্নতি। এরূপ অবস্থায় বিপুল পুলিশ ও গুপ্তচরবাহিনীকে অতিক্রম করিয়া বিপ্লব চালিত করা কিরূপ দুরূহ, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উপর দেশদ্রোহী অর্থলোভীর সংখ্যাও অল্প নয়। প্রভূত ধনবল ও বিপুল গুপ্তচরবাহিনী লইয়া রাজশক্তি এই মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের নিষ্পেষণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। পক্ষান্তরে রাসবিহারীও এই বাহিনীকে পরাস্ত করিবার জন্য এক গুপ্ত সংবাদ প্রেরক-বাহিনী রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পোষ্ট অফিসে, রেল অফিসে, পুলিশ অফিসে, সরকারী অন্যান্য বিভাগে রাসবিহারীর গুপ্তচর দেশভক্তির দ্বারা

প্রণোদিত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইত। রাসবিহারীর সংবাদ-বাহক ও কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী ছিলেন। একদিকে ইংরাজের প্রভুত অর্থবল ও সস্ত্রবল—অপরদিকে রাসবিহারী ও রাসবিহারীর মত বিপ্লবীদিগের অসীম দেশভক্তি, নৈতিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব।

বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় রাসবিহারী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

রাসবিহারী ছিলেন দ্বিতীয় নানাসাহেব এবং বিপ্লবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিপ্লবী রাসবিহারীর সংগঠন-শক্তি নানাসাহেব হইতেও শ্রেষ্ঠ। নানাসাহেবের যে ত্রুটী ছিল, রাসবিহারী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিয়া, সে সকল ত্রুটী দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলেন না। অপর বিপ্লবীর তো কেহ কাহাকেও চিনিতেন না জানিতেন না,—সাঙ্কেতিক শব্দ ও চিহ্ন যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

দেশমাতৃকার সেবায় যাঁহারা জীবনোৎসর্গ করেন, তাঁহাদিগকে "সহিদ" বল, আর "বিপ্লবী" বল, একই কথা। রাসবিহারী বিপ্লবী ছিলেন, কিন্তু হঠকারী ছিলেন না। তিনি প্রত্যেক পদক্ষেপের পূর্ব্বে যথেষ্ট চিন্তা করিতেন। আর একটি তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল, নিজ ভুল বুঝিতে পারিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ সাবধান হইতেন, ভুল সংশোধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া

উঠিতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠ দয়ার্দ্র হৃদয়ের একটি পরিচয় উল্লেখযোগ্য।

কাশী বিপ্লব-কেন্দ্রে প্রিয়নাথ বলিয়া এক বিপ্লবী যুবকের সহসা মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। প্রিয়নাথ বিপ্লব বিষয়ক গোপনীয় কথা যত্রতত্র প্রকাশ করিতে থাকে। বিপ্লবীরা এ সংবাদ কেন্দ্রে জানাইল, কেন্দ্র রাসবিহারীকে জানাইল। রাসবিহারী বিপ্লবীকে গুপ্তস্থানে আটক করিয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দিলেন ও মস্তিষ্ক চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। বিপ্লবীরা কিছুদিন প্রিয়নাথকে আটক রাখিয়া, চিকিৎসা করাইয়া বিশেষ ফল না পাইয়া আবার কেন্দ্রে সংবাদ প্রেরণ করিল—

"পুলিশ বড়ই তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। কোন উন্নতি নাই। প্রিয়নাথকে পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত করা প্রায় অসম্ভব।"

রাসবিহারী বিপ্লবী বৈঠকের সভাপতির আসন হইতে আদেশ দিলেন—"প্রাণদণ্ড—নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাণদণ্ড।" বিপ্লবী নিয়মানুসারে ঘাতকও নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং সে আদেশও বাহির হইয়া গেল। হত্যার কিছু পূর্ব্বে রাসবিহারী এই হতভাগ্য বিপ্লবীকে সচক্ষে দেখিতে গিয়া বুঝিলেন—প্রিয়নাথ এখন অতি স্বাভাবিক, মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন লক্ষণ নাই। কিন্তু আদেশ পালন করিবার জন্য হত্যাকারী ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছে। সে কে এবং কোথায় রাসবিহারী জানেন না। হত্যাকারীও রাসবিহারীকে জানেন না। তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আদেশ প্রত্যাহার করিবার সময় নাই।

রাসবিহারী বিপ্লবী প্রিয়নাথকে লইয়া পলায়ন করিলেন এবং গঙ্গা সন্তরণে পার হইয়া প্রিয়নাথকে নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি কেন্দ্রে ফিরিয়া সে আদেশ প্রত্যাহার করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রাসবিহারী ছুটি লইয়া ১৯১১ সালের আগষ্ট বা সেপ্‌টেম্বর মাসে দেশে আসেন। এই সময় একদিন রাসবিহারী প্রাতে আহারাদি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, ফিরিলেন প্রায় রাত্রি নয়টায়। তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীশ চন্দ্র ঘোষ। রাসবিহারীর অঙ্গ একখানা চাদর দিয়া মোড়া, রাসবিহারীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা, তাহার চক্ষে অপরিসীম বেদনা। রাত্রে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তাঁহার নিকট শয়ন করিত। তিনি প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"তুমি আজ অন্যত্র শোও। শ্রীশ আমার কাছে থাকবে।" তাহার পর রাসবিহারী আহার্য্য বহির্ব্বাটীতে চাহিয়া পাঠাইলেন। পরদিন সকলে জানিল, রাসবিহারীর অঙ্গুলীতে তীব্র আঘাত লাগিয়াছে। রাসবিহারী তখন কতকটা প্রকৃতিস্থ। প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে রাসবিহারী ব্যথিতভাবে বলিলেন, তাড়াতাড়ি ট্রেনের দরজা চাপিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিচিত কোন চিকিৎসক ডাকা হইল না। তিন মাইল দূর হইতে সন্ত পাশ করা ডাক্তার নগেন বাবুকে ডাকা হইল। প্রত্যহ গোঁদল পাড়া হইতে নগেন বাবু আসিয়া ক্ষত ধৌত করিয়া দিয়া যাইতেন। তখন একথা কেহ সন্দেহ করে নাই রাসবিহারীর

অঙ্গুলীতে এরূপ আঘাত কিরূপে সম্ভব হইল। ক্ষত শুকাইল, কিন্তু অঙ্গুলীতে এক সূক্ষ্ম ছিদ্র অঙ্কিত হইয়া গেল। জানি না, এ ছিদ্র তিনি কি উপায়ে গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে দিন, যে দিন তিনি লাহোর হইতে ট্রেনে পলায়ন করিতেছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া গিয়াছে, চারিদিকে ধরপাকড় চলিয়াছে, পুলিশ শহর তোলপাড় করিতেছে, পলায়নের প্রত্যেক পথে পুলিশ পাহারা বসিয়াছে, তাহারই মধ্য দিয়া রাসবিহারী পলায়ন করিতেছেন। একই গাড়ীতে, একই কামরায় সামনাসামনি দুইখানি বেঞ্চ, একখানিতে ধূর্ত্ত গোয়েন্দা যতীনবাবু, অপরখানিতে পাঞ্জাবী বেশে রাসবিহারী হস্তে একখানি উর্দ্দু পত্রিকা। কিছুদূর একত্রে আসার পর রাসবিহারী কামরা পরিবর্ত্তন করেন ও কাশী পর্য্যন্ত ঐ ট্রেনেই আসেন। তিনি কাশীতে নামিয়া মোগলসরাই আসেন ও সেখান হইতে নানা পথে ঘুরিয়া চন্দননগর উপস্থিত হন। যতীন বাবুর মত সুচতুর ও দক্ষ গোয়েন্দা তাঁহার ছদ্মবেশ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ছদ্মবেশ সম্বন্ধে রাসবিহারী বলিতেন—"সব বিষয়ে 'অতিটা' খারাপ, আর ছদ্মবেশ সম্বন্ধে 'অতিটা' একেবারেই খারাপ, ছদ্মবেশ যত স্বাভাবিক হয় এবং অতিরঞ্জিত না হয়, ততই ভাল। প্রত্যেক মানুষের দুইটা রূপ আছে, কাহারও কাহারও দুইয়ের অধিকও রূপ আছে। মানুষের বাহিরের রূপটা একটা ছদ্মবেশ, আর সেই ছদ্মবেশেই মানুষ অবিরত ঘুরিতেছে। তাই সবাই

রাসবিহারী বিপ্লবী প্রিয়নাথকে লইয়া পলায়ন করিলেন এবং গঙ্গা সন্তরণে পার হইয়া প্রিয়নাথকে নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি কেন্দ্রে ফিরিয়া সে আদেশ প্রত্যাহার করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রাসবিহারী ছুটি লইয়া ১৯১১ সালের আগষ্ট বা সেপ্‌টেম্বর মাসে দেশে আসেন। এই সময় একদিন রাসবিহারী প্রাতে আহারাদি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, ফিরিলেন প্রায় রাত্রি নয়টায়। তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীশ চন্দ্র ঘোষ। রাসবিহারীর অঙ্গ একখানা চাদর দিয়া মোড়া, রাসবিহারীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা, তাহার চক্ষে অপরিসীম বেদনা। রাত্রে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তাঁহার নিকট শয়ন করিত। তিনি প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"তুমি আজ অন্যত্র শোও। শ্রীশ আমার কাছে থাকবে।" তাহার পর রাসবিহারী আহার্য্য বহির্ব্বাটীতে চাহিয়া পাঠাইলেন। পরদিন সকলে জানিল, রাসবিহারীর অঙ্গুলীতে তীব্র আঘাত লাগিয়াছে। রাসবিহারী তখন কতকটা প্রকৃতিস্থ। প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে রাসবিহারী ব্যথিতভাবে বলিলেন, তাড়াতাড়ি ট্রেনের দরজা চাপিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিচিত কোন চিকিৎসক ডাকা হইল না। তিন মাইল দূর হইতে সদ্য পাশ করা ডাক্তার নগেন বাবুকে ডাকা হইল। প্রত্যহ গোঁদল পাড়া হইতে নগেন বাবু আসিয়া ক্ষত ধৌত করিয়া দিয়া যাইতেন। তখন একথা কেহ সন্দেহ করে নাই রাসবিহারীর

অঙ্গুলীতে এরূপ আঘাত কিরূপে সম্ভব হইল। ক্ষত শুকাইল, কিন্তু অঙ্গুলীতে এক সূক্ষ্ম ছিদ্র অঙ্কিত হইয়া গেল। জানি না, এ ছিদ্র তিনি কি উপায়ে গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে দিন, যে দিন তিনি লাহোর হইতে ট্রেনে পলায়ন করিতেছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া গিয়াছে, চারিদিকে ধরপাকড় চলিয়াছে, পুলিশ শহর তোলপাড় করিতেছে, পলায়নের প্রত্যেক পথে পুলিশ পাহারা বসিয়াছে, তাহারই মধ্য দিয়া রাসবিহারী পলায়ন করিতেছেন। একই গাড়ীতে, একই কামরায় সামনাসামনি দুইখানি বেঞ্চ, একখানিতে ধূর্ত্ত গোয়েন্দা যতীনবাবু, অপরখানিতে পাঞ্জাবী বেশে রাসবিহারী হস্তে একখানি উর্দ্দু পত্রিকা। কিছুদূর একত্রে আসার পর রাসবিহারী কামরা পরিবর্ত্তন করেন ও কাশী পর্য্যন্ত ঐ ট্রেনেই আসেন। তিনি কাশীতে নামিয়া মোগলসরাই আসেন ও সেখান হইতে নানা পথে ঘুরিয়া চন্দননগর উপস্থিত হন। যতীন বাবুর মত সুচতুর ও দক্ষ গোয়েন্দা তাঁহার ছদ্মবেশ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ছদ্মবেশ সম্বন্ধে রাসবিহারী বলিতেন—"সব বিষয়ে 'অতিটা' খারাপ, আর ছদ্মবেশ সম্বন্ধে 'অতিটা' একেবারেই খারাপ, ছদ্মবেশ যত স্বাভাবিক হয় এবং অতিরঞ্জিত না হয়, ততই ভাল। প্রত্যেক মানুষের দুইটা রূপ আছে, কাহারও কাহারও দুইয়ের অধিকও রূপ আছে। মানুষের বাহিরের রূপটা একটা ছদ্মবেশ, আর সেই ছদ্মবেশেই মানুষ অবিরত ঘুরিতেছে। তাই সবাই

অভিনেতা। কিন্তু সেই বড় অভিনেতা যে অতিটা বর্জ্জন করিয়া চলে। সেই প্রকৃত অভিনেতা যে ভূমিকার সঙ্গে নিজকে মনে প্রাণে মিশাইয়া দিতে পারে এবং সেই অভিনয়ই সহজ, সরল, ও হৃদয়গ্রাহী।" প্রত্যেক বিষয় রাসবিহারী বৈজ্ঞানিকের চক্ষু দিয়া অনুসন্ধান করিতেন, প্রত্যেক বিষয়ের ধর্ম্মাধর্ম্ম তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে নিরীক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া তিনি ধৈর্য্যের সহিত অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিতেন।

রাসবিহারীর চরিত্রের আর একটা দিক দেখিবার আছে। রাসবিহারীকে দেখিতে হইলে ও বুঝিতে হইলে তাঁহার সরল বালসুলভ চপলতাকে পৃথক করিয়া দিয়া তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রকার হাস্যরসাত্মক একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া সেইদিকটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

রাসবিহারী তখন চন্দন নগরে। রাসবিহারীর মাথায় এক সুদীর্ঘ টিকি। রাসবিহারীর বিমাতা গোশালার মধ্যে একটী গাভীর বন্ধন অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে বড়ই বিষন্ন হইয়া পড়েন। গোশালায় বন্ধন অবস্থায় গোমৃত্যু হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে গুরুতর পাপ। রাসবিহারী মাকে বিষন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন—

"রাসি, মনটাতে একটুও সুখ নাই বাবা ! একটুও শান্তি পাচ্চি না। গরুটা হঠাৎ মরে গেল। কিছুই তো আগে জানতে পারি নাই। বাড়ীতে গো মৃত্যু আমাকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছে, বাবা।"

রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। দীর্ঘ টিকিগুচ্ছ আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিমাতা রাসবিহারীর মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া আরও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। সহসা রাসবিহারী লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"উপায় আছে, অতি সোজা, একেবারে জলের মত সোজা। তুমি 'অষ্টপ্রহর' লাগিয়ে দাও মা, সব বিপদ কেটে যাবে।"

মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াই আবার ম্লান হইয়া গেল। তিনি মলিন মুখে বসিয়া রহিলেন। রাসবিহারী উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আর কি? লাগিয়ে দাও না মা। একেবারে শুভস্য শীঘ্রম্।"

মা কিন্তু হতাশচক্ষে রাসবিহারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাসবিহারী অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—"আবার মুখ ভার করে বসে? বলি, ব্যাপার কি?"

মা মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অষ্টপ্রহরের খরচ পাই কোথায় বাবা?"

রাসবিহারী হাসিয়া খুন। হাসি থামিলে বলিলেন "আরে বেটী! দেবে গৌরী সেন। আমি চল্লাম বায়না কর্ত্তে।"

বায়না হইল, পাল টাঙ্গান হইল, প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রিত হইল, গায়কেরা কোমরে লাল শালু বাঁধিয়া, চামর ছুলাইয়া পালা সুরু করিল। কিন্তু যে এতটা করিল, তাহার জ্বর আসিয়া পড়িল। সে দ্বিতলের ঘরে জ্বরের যন্ত্রনায় ছটফট করিতে লাগিল। মা গান বন্ধ করিবার কথা উত্থাপন করিতেই

রাসবিহারী ক্ষেপিয়া উঠিলেন। অতএব পালা পুরা উদ্যমে চলিতে লাগিল।

রাসবিহারীকে দেখিবার ভার পড়িল রাসবিহারীর দ্বিতীয় ভ্রাতার উপর। পাখা টানিতে টানিতে বেচারী প্রাণান্ত। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবুও জ্বরের প্রকোপ প্রশমিত হইল না। সহসা রাসবিহারী "কাঁচি, কাঁচি" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভ্রাতা কাঁচি আনিতে ছুটিল। বহু অনুসন্ধানের পর রাসবিহারীর ভ্রাতা কাঁচি লইয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতাকে কাঁচি হস্তে আসিতে দেখিয়াই রাসবিহারী বিছানার উপর উঁচু হইয়া বসিলেন ও দুই হাতে টিকিগুচ্ছ উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন—

"শিগগির কাট, একেবারে বুঁচিয়ে কাট।" ভয়ে ভয়ে ভ্রাতা টিকি কাটিল। রাসবিহারী বিছানায় শুইয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। জ্বরও আধঘণ্টার মধ্যে ছাড়িয়া গেল। রাত্রি দশটার পর রাসবিহারী আসরে গিয়া বসিলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না।

প্রাতে টিকি প্রহসন সুরু হইল। টিকি লইয়া প্রশ্ন হইলে রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া উত্তর দিলেন—

"টিকি দিয়া ইলেকট্রিক পাস করিতেছিল বলিয়া শরীরটা বড় আনচান কর্চ্ছিল। যাই টিকি কাটা—ব্যস্—জ্বর বাছাধন কুপকাৎ"। সকলে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন ও নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। রাসবিহারীও গরম হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি গম্ভীর মুখে প্রতিবাদ করিলেন—

"মান কি না বাঙ্গলার মাটি জলে ভরা, বাঙ্গলার আবহাওয়া জলীয়। মান কি না পৃথিবী অবিরত বিদ্যুৎসাম্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। মান কি না নানা দ্রব্যের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্চে। মান কিনা অঙ্গুলী দিয়া, নাক দিয়া, কান দিয়া অবিরত বিদ্যুৎ আকৃষ্ট হইয়া পা দিয়া পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে। তবে মানিবে না কেন, টিকি দিয়া বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। জানো? তুমি আমায় স্পর্শ করিলে আমার তোমার মধ্যে বিদ্যুৎ বিনিময় হয়। আমি যদি অসৎ হই আর তুমি সৎ হও, আমার অসৎ গুণের অংশভাগী তুমি হও, আর তোমার সৎগুণের অংশভাগী আমি হই।"

রাসবিহারী চুপ করিয়া একবার সকলের দিকে তাকাইলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন—

"হিন্দু ঋষিরা যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধ বেঁধে গেছেন, সেগুলাকে হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া পালন করিয়া দেখ, লক্ষ্য কর, ফলাফল লিখিয়া রাখ, দেখিবে যে তাঁরা কতকগুলা ভূয়া নিয়ম রেখে যাননি, তাঁরা তোমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতই পর্য্যালোচনা করেছিলেন। জান? তারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তবে সে দিনের কৃষ্টির পর অনেক ময়লা, অনেক আবর্জ্জনা কালের আঘাতে জমে উঠেছে, তাকে ধুয়ে সাফ কর সোনা বেরিয়ে পড়বে, চাইকি মানিকও বেরিয়ে পড়তে পারে। তা নয় কেবল চিমটি কাটতে পার, আর দাঁত বের করে হাসতে পার?"

রাসবিহারীর উত্তরে সকলেই চুপ। মা শুধু হাসিয়া বলিলেন—"ক্ষেপাকে তোরা ক্ষেপাস কেন?"

এই সেই রাসবিহারী যাঁহার জন্ম হইয়াছিল গোশালায়, এই সেই রাসবিহারী যাঁহাকে সংযত করিতে শুধু তাঁহার বিমাতাই পারিতেন, এই সেই রাসবিহারী যাঁহার বিষয় সিডিশন কমিটী রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইংরাজ Notorious Rash Behari বা দুষ্ট রাসবিহারী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এই সেই রাসবিহারী যাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ইংরাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, এই সেই রাসবিহারী যাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইংরাজ আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জাপানী জাহাজের উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছে, এই সেই রাসবিহারী যাঁহার রক্তের জন্য ইংরাজ জাপানে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছে। ভাবিতেও বিস্ময় সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়।

ডেরাডুনে অবস্থানকালে রাসবিহারী বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজে তিনি সামান্য কেরাণী ছিলেন এবং তাহার বেতনও অল্প ছিল বটে, তথাপিও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সামান্য অর্থ রাখিয়া, বাকী সমুদয় অর্থই তিনি দান করিয়া দিতেন। ডেরাডুনের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসালয় ও প্রাইমারী বিদ্যালয় তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইত। ইহা ছাড়া তিনি কোন কোন ছাত্রেরও স্কুল কলেজের বেতনও দিতেন।

দান প্রবৃত্তি রাসবিহারী তাঁহার পিতার নিকট হইতে

পাইয়াছিলেন। বিনোদবিহারী যতদিন চাকুরী করিতেন, নিয়মিত ভাবে দুস্থ আত্মীয় স্বজন ও বিধবাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। রাসবিহারী বলিতেন—

"ধনীর লক্ষ মুদ্রা দানের অপেক্ষা দরিদ্রের মুষ্টিভিক্ষা অধিক মূল্যবান। ধনীর দান নামের জন্য, দরিদ্রের দান শ্রদ্ধার দান, সমবেদনার দান। ধনীর দান দরিদ্রকে রক্ষা করে না, দরিদ্রের মুষ্টি ভিক্ষা একত্রিত হইয়া বহু দরিদ্রকে রক্ষা করে। যদি সব দরিদ্র একত্র হইয়া প্রত্যেকে মাত্র একমুষ্টি দান করে পৃথিবীতে অনাহারে কেহ মরিবে না, যদি ভারতের প্রত্যেক পরিবার বৎসরে সৎপ্রতিষ্ঠানে এক মুদ্রা দান করে তবে বিরাট প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহার ফলে বহু ধন সৃষ্টি হইতে পারে ও বেকার সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে। আসলে চাই প্রকৃত সমবেদনা ও ত্যাগ, অনাবশ্যক আরাম বর্জ্জন, বিশাল হৃদয়।"

ডেরাডুনে পি, কে, ঠাকুরের বিস্তৃত বাগানের মধ্যে সুসজ্জিত বাড়ী ছিল। ইহারই তত্ত্বাবধান করিতেন শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ। এই বাটী প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকিত। স্থানটী নির্জ্জন। রাজপথ হইতে বহু দূরে উদ্যানের মধ্যে এই বাটী। এখানেই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই খানেই অতুলচন্দ্র জ্ঞান, অবোধবিহারী প্রভৃতি বহু বিপ্লবী রাসবিহারীর সহিত মিলিত হইতেন। হার্ডিঞ্জ বোমার পর এ কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া যায় ও অবিরত কেন্দ্র একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইতে হয়।

সার মাইকেল ওডায়ার লাহোর ষড়যন্ত্র বিষয়ে তাঁহার

"ভারতকে আমি যেমন জানিতাম" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"এই সময় বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী লাহোর বিপ্লব চালনা করিবার জন্য তাঁহার কেন্দ্র পাঞ্জাবে সরাইয়া আনিলেন ও সঙ্গে আনিলেন পুণার দুঃসাহসী ব্রাহ্মণ যুবক ইউ, জি, পিঙ্গলেকে। এই পিঙ্গলে শিখ বিপ্লবীদের সহিত আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পিঙ্গলে রাসবিহারীর এক অতি নির্ভীক সহকারী। তাসুমার নামক জাহাজ ও তাহার বিপ্লবীরা আমাদের হস্তে পড়িবার পর হইতেই পিঙ্গলে রাসবিহারীর একজন প্রধান সহচররূপে কার্য্য করিতে থাকে। লাহোর আর্য্যসমাজ কলেজের অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ শিখ ও হিন্দু বিপ্লবীদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিতেছিলেন। ভাই পরমানন্দ যুদ্ধের পূর্ব্বেই আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী আমরা গোয়েন্দা মুখে সংবাদ পাইলাম রাসবিহারী ও পিঙ্গলে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র লাহোরে স্থাপিত করিয়াছেন। রাসবিহারী ও পিঙ্গলে সন্দেহ করেন যে, আমরা তাহাদের সকল মতলব জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা বিদ্রোহ তারিখ একদিন অগ্রে নির্ধারিত করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতেই তাহারা বিদ্রোহ করিবে স্থির করিয়া ফেলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই সংবাদ ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ও সৈন্যাবাসে প্রেরণ করেন। আমাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া কার্য্যে অবতরণ করিতে হয়।

সেই দিন বিদ্রোহীদের চারখানি বাড়ী পুলিশ খানাতল্লাসী

করিয়া বহু বোমা ও বোমা প্রস্তুত করণের মাল মশলা, সরঞ্জাম, বিপ্লব প্রচারমূলক পুস্তক ও বিপ্লবী পতাকা সহ ১৩ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু রাসবিহারী ও পিঙ্গলে ধরা পড়িল না।

কয়েকদিন পরে পিঙ্গলে মিরাটে ধরা পড়েন। তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গলা হইতে আনিত প্রচুর বোমা ছিল। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে এই সকল বোমার সাহায্যে একটী সৈন্য বিভাগ ধ্বংস করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।"

উপরোক্ত বিবৃতি সাক্ষ্য দিবে রাসবিহারীর সংগঠন শক্তির ও প্রভূত আয়োজন শক্তির। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেদিন যদি বিশ্বাসঘাতকতা রাসবিহারীকে পঙ্গু না করিত তাহা হইলে হয়ত বহু পূর্ব্বেই ভারত স্বাধীন হইতে পারিত।

রাসবিহারীর স্মৃতি, পিঙ্গলের স্মৃতি এবং এই ১৩ জন দেশকর্ম্মীর স্মৃতিরক্ষা করিবার বিষয়ে ভারত কি অবহিত হইবে না? ইঁহারা কেহই দেশ ভক্তিতে, কর্ম্মশক্তিতে, ত্যাগধর্ম্মে কোন দেশীয় বা বিদেশীয় দেশভক্ত অপেক্ষা হীন নহেন।

বাঙ্গালী! যদি বীর সন্তান, বীর মাতা, বীর পিতা লাভের তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি সে দিনের মত আজও তোমার ভারতে অগ্রণী হইবার, পথপ্রদর্শক হইবার লিপ্সা থাকে তবে তোমার দেশকর্ম্মীর, দেশ সেবকের নিত্য পূজার ব্যবস্থা কর। ইঁহাদের লইয়া পল্লীগাথা রচনা কর, সে গান বাঙ্গালীকে শুনাইবার জন্য চারণ সৃষ্টি কর, পথে ঘাটে, গৃহস্থের অঙ্গনে, মেলার প্রাঙ্গণে সে কাহিনী গাহিয়া জাতির মধ্যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাও, একতা

শিখাও; তবেই বাঙ্গালী আবার জাগিবে। বাঙ্গলা শক্তি সাধকের দেশ, বাঙ্গলা মাতৃসাধকের জন্মভূমি। বাঙ্গালী একাগ্র হইয়া শক্তি সাধনা কর—মাতৃপূজা কর—অবশ্যই জগতে আবার বরেণ্য হইবে।

মাত্র ২৫ বৎসর যদি বাঙ্গালী সাহিত্যিক, অসার উপন্যাস ও রমন্যাস রচনা পরিত্যাগ করিয়া এই দিকে মন দেয়, যদি বাঙ্গালী আভিজাত্য গঠনে যত্নবান হয় নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে, বাঙ্গলার মাটীতে আবার সুবর্ণ ফলিবে। যে বাঙ্গালীর স্বদেশ-প্রেমিকতায়, মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠায় ও অনন্যসাধারণ আত্মোৎসর্গে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, যে বাঙ্গলার সম্বন্ধে একদিন ভারতের মহাপুরুষেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, "What Bengal thinks today others think to-morrow" (অর্থাৎ, আজ যাহা বাঙ্গলা চিন্তা করে, অন্যান্য প্রদেশের নিকট তাহা পরদিন প্রতীয়মান হয়) আজ সে বাঙ্গালীর অবস্থা কি? বাঙ্গালী আজ পরকৃপা ভিখারী, হীন পর্য্যায়ভুক্ত ও দাসত্বলোলুপ। প্রধানতঃ যে বাঙ্গলার প্রাণপাতে ও আত্মোৎসর্গে ভারত স্বাধীনতা লাভে সমর্থ, সে বাঙ্গলা আজি রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত, তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? কি অদৃষ্টের পরিহাস!

দ্বিতীয় স্তবক

জাপানে রাসবিহারী

অবশেষে রাসবিহারী জাপানে পৌঁছিলেন। তিনি কোবে বন্দরে অবতরণ করেন। রাসবিহারী একেবারে নিঃস্ব, সর্ব্বপ্রকারে রিক্তহস্ত। কিন্তু সেই মহামানব ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস, অসীম ধৈর্য্য ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় লইয়া তিনি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাঁহারাই কিছুমাত্র সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সত্যের পথে ছুটিয়াছেন আকুল আগ্রহে। কোন বাধা, কোন বিঘ্ন তাঁহাদের মধ্যপথে থামাইয়া দিতে পারে নাই, তাঁরা অবিচলচিত্তে সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে ছুটিয়াছেন, তাঁহাদের মনপ্রাণ সমর্পিত হইয়াছে সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য। এইখানেই মহামানবের সহিত সাধারণ মানবের পার্থক্য। মহামানব আত্মবিশ্বাসরূপ অপূর্ব্ব ধনের অধিকারী হইয়া সাধারণ মানব হইতে অতি উচ্চে অবস্থান করেন—কোন বিফলতাই তাঁহার গতিকে ব্যাহত করিতে পারে না। ইহাই মহাজনের নিকট শিক্ষনীয় .

রাসবিহারী জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছিয়াই অস্ত্র সংগ্রহার্থে সাংহাই যাত্রা করিলেন। চীন তখন অন্তর্বিপ্লব

লইয়া নিজেই বিব্রত, অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডিত, সুতরাং তাহার পক্ষে অস্ত্র সাহায্য অসম্ভব। ইহা ছাড়া বহু ইংরাজ গুপ্তচর সাংহাইয়ে সর্ব্বদাই বিশেষ কর্ম্মতৎপর। রাসবিহারী বিফল মনোরথ হইয়া টোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই জাপানের ভারতের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করিয়া, তিনি সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

টোকিওতে রাসবিহারীর এক তরুণ চীন বিপ্লবীর সহিত পরিচয় হয়। ক্রমে এই দুই বিপ্লবীর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। এই চীন যুবক জগৎ-বরেণ্য সানইয়ৎ সেন। এই চীন যুবকই নবচীনের শ্রষ্টারূপে জগতে বরেণ্য হইয়াছেন। দুই বিপ্লবীর আশা, আকাঙ্খা, আদর্শ, সত্য-দর্শন অনুরূপ, কাজেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্বে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। একজন আর একজনের উৎসাহের উৎস হইলেন। যাঁহার জগতে এরূপ বন্ধুলাভ ঘটে, তিনিই ধন্য।

এ জগতে অকৃত্রিম প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অতি দুর্লভ। অন্তরঙ্গ অকৃত্রিম, বন্ধুর সংখ্যাই সুখ শান্তি ও স্বাধীনতার পরিমাপক। মহৎ আদর্শ, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে প্রকৃত সুহৃদ লাভ হয় না। অকৃত্রিম বন্ধুলাভ প্রায় ব্রহ্মলাভের সমতূল্য। অন্তরঙ্গ বন্ধু তোমার অন্তরের প্রতিচ্ছবি, সেই জন্য এরূপ বন্ধুলাভে তোমার উৎসাহ তোমার কর্ম্মপ্রেরণা, তোমার ধীশক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়, তুমি অপরাজেয় হইয়া উঠ,

তোমার আদর্শ ও সঙ্কল্প দৃঢ় হয়। মার্কস্ যে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া বহু বিপ্লবী পুস্তক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিলেন তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু এফ্, ইঙ্গলেস। জন ও চার্লস ওয়েসলি মেথডিস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে সমর্থ হয়েছিলেন, তাহাদের মূলে ছিল পরস্পরের সহায়তা।

ভাবিয়া দেখ—প্রায় ৪০ কোটী ভারতীয় ভাই বোন তোমার চারিদিকে অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ তুমি নিঃসঙ্গ, তুমি একাকী, তোমার মনের দ্বার রুদ্ধ। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর তোমার পরাধীন জীবনের ভার তুমি একাকী বহন করিয়া চলিয়াছ! কি ভয়াবহ! এই ৪০ কোটীর মধ্যে এমন দুর্ভাগা বহু আছেন, যাঁহার একটী মাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুলাভ ঘটে নাই। তাঁহার কর্ম্মশক্তি, কর্ম্ম প্রবৃত্তি, সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ উদ্যম অকালে শুষ্ক হইয়াছে, তিনি যেন জীবনমৃত হইয়া কেবল বাঁচিয়া আছেন। সত্যই হতভাগ্য সে, দয়ার পাত্র সে, যে তার জীবন-সঙ্গিনীকেও অভিন্নহৃদয় বন্ধুরূপে লাভ করিতে পারে নাই।

সানইয়ৎসেন্ রাসবিহারীকে এতই স্নেহ করিতেন যে কয়েক মাস পরে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া রাসবিহারীর জীবন রক্ষা করেন। দুষ্ট স্বার্থান্বেষী আত্মীয় ও আদর্শবাদী অভিন্নহৃদয় বিদেশী বন্ধুতে কত পার্থক্য? কে বড়? ধর্ম্মচ্যুত, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভী আত্মীয়—না স্বার্থহীন নিষ্কাম পরদেশী বন্ধু? কে প্রকৃত আত্মীয়? কার পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবে?

ভারত জাপান মৈত্রী স্থাপনের জন্য, জাপানের জনসাধারণের কাছে ভারতের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ও ইংরাজ সরকারের অধীনে ভারতের পরিস্থিতি পরিচিত করিবার জন্য রাসবিহারী টোকিওর ভারতীয়দের সহিত জাপানী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার ফলে ২৭শে নভেম্বর ১৯১৫ সালে অর্থাৎ রাসবিহারীর টোকিও পৌঁছিবার পাঁচ মাসের মধ্যেই এক সভা আহুত হয়। ভারতের দিক থেকে এই সভার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়, আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবী প্রতিনিধি শ্রীহেরম্বলাল গুপ্ত ও শ্রীরাসবিহারী বসু এবং জাপানের পক্ষে প্রধান কর্ম্মী ছিলেন ডাক্তার সুমেই ওহকাওয়া। যুনো পার্কের প্রসিদ্ধ ভোজনালয় সিওকিনে এই সভার অধিবেশন হয়। সমগ্র দালানটী জাপানী চিত্রে ও পতাকায় সজ্জিত হয়। জাপানী জাতীয় সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন হয়। লালা লাজপৎ রায় ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে জাপানী নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়া পড়েন। প্রত্যেক বক্তাই ভারতের প্রতি ইংরাজের নিষ্ঠুর আচরণের বহু নিদর্শন প্রকাশ পূর্ব্বক তীব্র নিন্দা করেন।

এই সভার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাচ্যে ভারতের এই প্রথম আন্দোলন। এ আন্দোলনের সূত্রপাত রাসবিহারীর একান্ত চেষ্টার ফলে।

সভার সাফল্য যখন রাসবিহারীকে আরও অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিল, তখন অপরদিকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ

রাসবিহারীর মস্তকের উপর জমা হইতেছিল। সেই মেঘ অচিরে প্রবল ঝঞ্ঝারূপে রাসবিহারীর মস্তকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল, রাসবিহারী অতল তলে ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

সভার সংবাদ জাপানে অবস্থিত ইংরাজ দূতাবাসে পৌঁছিল। ইংরাজ দূতাবাস শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ও ভারতীয় বিপ্লবীদের অবিলম্বে জাপান হইতে নির্ব্বাসিত করার জন্য জাপানের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা অনুরোধ নয়, আদেশ। জাপানের বৈদেশিক বিভাগের কোন স্বাধীনতা ছিল না, নিরপেক্ষভাবে কোন কর্ম্ম করিবার শক্তি ছিল না। জাপানের বৈদেশিক বিভাগ তখন পাশ্চাত্য শক্তির চাপে পঙ্গু। সমগ্র নিপনজাতি এই বৈদেশিক দপ্তরের পাশ্চাত্য দাসত্বের অজস্র নিন্দা করিয়াও কোন ফল পায় নাই। জাপানের বৈদেশিক নীতি লইয়া বহু রক্তক্ষয়ও হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য দুঃসাহসিক ব্যক্তি জাপানের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া ইহার বিরূদ্ধে ঘৃণা কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, কিন্তু বৈদেশিক নীতি পাশ্চাত্যের অঙ্গুলী হেলনে চালিত হইয়া জাতির উপর নানা অত্যাচার করিতে বাধ্য হইত। আজ যেমন আমেরিকার অঙ্গুলী হেলনে জাপানী বৈদেশিক দপ্তর চালিত হইতেছে সে দিনে ইংরাজের অঙ্গুলী হেলনে সেইরূপ চালিত হইত।

সভার পরের দিন লালা লাজপৎ রায় জাপান ত্যাগ করিয়া আমেরিকা যুক্তরাজ্যে পলায়ন করিলেন। রাসবিহারী ও হেরম্বলালের ডাক পড়িল থানায়। অবিলম্বে তাঁহাদের উপর জারি

করা হইল নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা। অতি কঠিন দণ্ডাজ্ঞা—পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁহাদের জাপান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এ দণ্ডাজ্ঞার মাত্র একটী অর্থ এবং এতই সুস্পষ্ট সে অর্থ যে তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। বিদেশীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া বা তাহা প্রার্থনা করা দুইই রাজশক্তির অপব্যবহার। জাপান বৈদেশিক মন্ত্রী ভুলে গিয়েছিলেন যে সাধারণ তন্ত্রের অর্থ কি। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে মন্ত্রী জনসাধারণের অনুগৃহীত দাস মাত্র। মন্ত্রীর পক্ষে দেশের মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা সেচ্ছাচারীতার নামান্তর, প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার। মন্ত্রী বা রাজকর্ম্মচারী প্রজার প্রভু নয়—প্রজার দাস মাত্র।

হেরম্বলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, রাসবিহারীর অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়। কিন্তু এই দুই ভারতীয় যুবক অচঞ্চল—স্থির—নির্ভীক। কোটী কোটী মানবের দাসত্ব মোচনের ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি প্রাণের ভয়ে অভিভূত হওয়া সম্ভব? অত্যাচারীর খড়্গ তাহাদের জন্য সর্ব্বদাই উত্থিত। অধীর না হইয়া, অভিভূত না হইয়া, তাঁহারা কিংকর্তব্যম্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জাপানী জনসাধারণের নিকট আবেদন করিলেন—

"আমরা তো কোন অন্যায় করি নাই। আমরা তো জাপানীর মত স্বদেশ ভক্ত, স্বদেশের মুক্তির যুদ্ধ চালাইতেছি। জাপানের বিরুদ্ধে তো কোন অপরাধই আমরা করি নাই। স্বদেশকে ভালবাসা কি দোষ? অত্যাচারীর কবল থেকে

স্বদেশের উদ্ধার কোন্ অপরাধের মধ্যে পড়ে? তবে কেন এ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা?"

পরিচিত জাপানীদের তাঁহারা তাঁহাদের আবেদন জানাইলেন। প্রত্যেক সংবাদপত্রকে তাঁদের উপর যে অন্যায় দণ্ডাজ্ঞা ও তাহার পরিণাম কি, জানাইলেন। তাঁহাদের গভীর বিপদের কথা শুনিয়া এক ভদ্রলোক তাঁহাদের সহিত সামুরায় নায়ক বৃদ্ধ শ্রী এম্ টোয়ামার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীটোয়ামা এই অসহায় ভারতীয়দের সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। শ্রীটোয়ামা ছিলেন, আদর্শ সামুরাই। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত এই সামুরাই বংশের তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীটোয়ামা বলিলেন—

"আমি সামুরাই সন্তান—অহিংসার উপাসক। অহিংসার পথে যাহা সম্ভব আমি তাহাই করিব। ইহার অধিক আর কিছু পারিব না।"

পরের দিন সমস্ত জাপানী সংবাদপত্র গর্জ্জিয়া উঠিল। প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বৈদেশিক দপ্তর ও তাহার নীতিকে ভীষণভাবে আক্রমণ করা হইল, বৈদেশিক নীতির পরাধীনতাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র মন্তব্য লিখিত হইল। বহু খ্যাতনামা রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট আইনজীবী এই দুই ভারতীয়কে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। বৈদেশিক দপ্তর পাষাণের মতই বধির। বৈদেশিক দপ্তরের আদেশ কঠিনভাবে ঘোষিত

হইল—"ভারতীয়দ্বয়কে অবশ্যই জাপান পরিত্যাগ করিতে হইবে।" জাপান হইতে পূর্ব্বগামী কোন জাহাজ না থাকায় বৈদেশিক দপ্তর স্থির করিলেন ভারতীয়দ্বয়কে পশ্চিমগামী জাহাজেই তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং এই পশ্চিমগামী জাহাজ ভারতীয়দ্বয়কে সাংহাইএ নামাইয়া দিবে, অর্থাৎ বৃটিশ পুলিশ শিকারীর হস্তে, হস্তপদ বদ্ধ দুই শিকার তুলিয়া দেওয়া হইবে। পুলিশ অধ্যক্ষ নিসিকুরো ঘোষণা করিলেন—

"ভারতীয়দ্বয়কে ১৯১৫ সালের ২রা ডিসেম্বর ইয়াকোহামা বন্দর হইতে যাত্রাকারী জাহাজে বলপূর্ব্বক তুলিয়া দেওয়া হইবে।"

স্বদেশ-প্রেমী ভারতীয়দের স্থান ভারতেও নাই, স্বদেশ-প্রেমী জাপানেও হইল না। তবুও তাঁরা নির্ভয়ে স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে নিয়তির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিয়তি খড়্গ হস্তে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, প্রতিমূহূর্ত্তে নিকটতর হইতেছে, করিবার কিছু নাই, কোন উপায় নাই। এই সঙ্কটময় অবস্থায় তাঁদের মনোভাব কি ছিল, তাঁহাদের মনের মধ্যে কি উদিত হইতেছিল কে বলিতে পারে, কে তা বুঝিতে পারে? যদি কেহ এমন সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, এমনভাবে সরকারী রক্ষীর ঘৃণ্য নৃশংসতার সম্মুখীন হইয়া থাকেন, তবেই তিনি বুঝিতে পারিবেন। কোন ভাষা জগতে আজও আবিস্কৃত হয় নাই, কোন চিত্রকর আজও এমন রং আবিষ্কার করিতে পারেন নাই যে ভাষায় বা রঙ্গের তুলি দিয়া মনের এই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত

হইতে পারে। ইহা অনুভূতির বস্তু, হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়, তবুও তাহা যথাযথ অনুভব করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

যূপকাষ্ঠের প্রতীক্ষায়

১লা ডিসেম্বর। নিয়তির অপেক্ষায় রাসবিহারী ও হেরম্বলাল একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট। সরকারী রক্ষীদল নিকট হইতে নিকটতর। ভারতীয়দ্বয় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট—উভয়েই নির্বাক। কিই বা তাঁদের আর করিবার ছিল? দুটী নির্বান্ধব বিদেশী যুবক! অল্পদিনের মধ্যেই এই দুই যুবক জাপানের জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াও জাপানে পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের জন্য স্বদেশভক্ত জাপান হইতে নির্বাসিত হইতেছেন। ভাগ্যের কি পরিহাস! কোন পথই উন্মুক্ত নাই। তাঁদের অপরাধ—তাঁরা ভারতীয় হইয়া স্বদেশ প্রেমে আত্মহারা। তাঁদের অপরাধ—স্বদেশের মুক্তির জন্য তাঁরা যে কোন বিপদকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। তাঁরা অশ্রুতপূর্ব্ব দোষে দোষী, স্বদেশপ্রেমী বলিয়া অখণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী। মৃত্যুরূপী খড়্গাঘাতের প্রতীক্ষায় তাঁহারা নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। সেই সন্ধিক্ষণ ক্রমশঃ নিকটতর হইতেছে। কিন্তু তখনও তাঁদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁরা ধীর ও স্থির। গীতোক্ত স্থিরপ্রাজ্ঞ কি ইহাকেই বলে?

এই সন্ধিক্ষণের কথা মনে করিয়ে দেয় নানাসাহেবকে, লক্ষ্মীবাঈকে, তাঁতিয়া টোপীকে, কুমার সিংহকে, মহারাজ নন্দকুমারকে, ক্ষুদিরাম বসুকে ও কানাই দত্তকে। মৃত্যুর সম্মুখে এঁরা প্রত্যেকেই দাড়িয়েছিলেন অচঞ্চল চিত্তে, নির্ভীকভাবে। তাঁদের নিকট মানুষের অন্তরের অন্তরমস্থানে যে অমরত্বের বীজ আছে, তাহা সত্যের স্পর্শে জাগরিত হইয়া তাঁদের মৃত্যুভয় দূরীভূত করিয়াছে। তাঁরা মৃত্যুজয়ী।

যাঁহার ইঙ্গিতে আকাশ কৃষ্ণ মেঘে আবৃত হয়, প্রবল বাত্যা উত্থিত হয় আবার তাঁহারই ইঙ্গিতে কৃষ্ণ মেঘ অদৃশ্য হইয়া মুক্ত আকাশ দৃষ্টিভূত হয়। এ লীলা আমরা দেখিয়াও দেখি না—ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। দ্বিপ্রহরে কোন কোন সাংবাদিক রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এই সময় একখানি শকট তাঁহাদের বাস গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং এক জাপানী ভদ্রলোক শকট হইতে অবতরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই ভারতীয়দ্বয়কে শকটে উঠাইয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। পরবর্ত্তী আট বৎসর একটী জাপানী বালিকা ও তাঁহার মাতা ব্যতিরেকে কেহ জানিতেও পারেন নাই রাসবিহারী কোথায় অদৃশ্য হইলেন। এই দুই জাপানী নারী বিদেশীর জন্য, ভারতীয়ের জন্য যে আত্মত্যাগ করিয়াছেন তাহা যে কোন আধুনিক বঙ্গনারীর অনুকরণীয়। এই দুই নারী স্বীয়গুণে ভারতের জনসমাজের শ্রদ্ধাই কেবল আকর্ষণ করেন নাই, সমগ্র

ভারতীয় পূজ্যা নারীর সঙ্গে সমভাবে পূজা পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মাদাম কোকো এই নাটকের প্রধান অভিনেত্রী। তিনি 'পরিবর্ত্তনশীল জগৎ' নামক পত্রিকায় যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি রোমাঞ্চকর। এই বাস্তব কাহিনী, যে কোন কাল্পনিক উপন্যাসের কাহিনী হইতে কম বিস্ময়কর নহে।

রাসবিহারী ও হেরম্বলালের অন্তর্ধান

টোকিওর সিঞ্জিকু ষ্টেশন রাজধানীর পশ্চিম দ্বারের নিকট অবস্থিত। এইখানে 'নাকামুরায়া' নামে একটী রুটীর দোকান আছে। তখন এই দোকানের স্বত্বাধিকারী শ্রীআইজো সোমা ছিলেন। সংবাদপত্রে এই দুই বিপ্লবীর নির্ব্বাসন দণ্ড পাঠে শ্রী সোমা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়েন। ১লা ডিসেম্বর এক সম্ভ্রান্ত ক্রেতাকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই দুই হতভাগ্য বিপ্লবীদের কোন বিশেষ নূতন সংবাদ আছে কিনা তিনি প্রশ্ন করিলেন। এই ক্রেতা তাঁহাকে অতি গোপনীয় সংবাদের কিঞ্চিৎ আভাস দেন। তিনি জানাইলেন সামুরাই নেতা শ্রীটোয়ামা বিপ্লবীদ্বয়কে রক্ষা করিবার জন্য ও লুকাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তখন শ্রী সোমা চুপিচুপি ক্রেতাকে বলেন যে তিনি বিপ্লবীদের অনায়াসে তাঁহার পুরাতন অব্যবহৃত শিল্পাগারে লুকাইয়া রাখিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি অবশেষে বলিলেন "ভাবিয়া দেখুন!—আমার পক্ষে

তাঁহাদের লুকাইয়া রাখা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। আমি সামান্য রুটীওয়ালা এবং বিপ্লবীদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া তাঁহাদের লুকাইয়া রাখা আমার পক্ষে কত সহজ। তাই নয় কি?"

এই ক্রেতা নিরোক পত্রের সম্পাদক শ্রীনাকামুরা। তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, সহৃদয় শ্রী টোয়ামা বিপ্লবীদের রক্ষা করিবার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। নাকামুরা অবিলম্বে সেই বন্ধুর সন্ধানে বাহির হইলেন এবং বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া শ্রী টোয়ামার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রী টোয়ামা তখন সরকারের শেষ মন্তব্য ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নাকামুরার নিকট শ্রী সোমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি রাসবিহারী, হেরম্বলাল ও শ্রী সোমাকে নিজ বাটীতে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

টোয়ামার বাটী গোয়েন্দা ও পুলিশ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া সোমা, রাসবিহারী ও হেরম্বলাল টোয়ামার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থান হইতে সন্ধ্যার কিছু পরেই অন্ধকারের মধ্যে রাসবিহারী ও হেরম্বলাল অন্তর্ধান করিলেন।

২রা ডিসেম্বর ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়ের নির্ব্বাসন দিন। সেই দিন টোকিওর সংবাদপত্র সমূহ বিপ্লবীদের নির্ব্বাসন সংবাদের পরিবর্ত্তে ইঁহাদের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা প্রচার করিল। জনসাধারণ স্তম্ভিত! পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী বিপর্য্যস্ত! পুলিশ অধ্যক্ষ

বজ্রাহত! ইংরাজ দূতাবাসের গর্জ্জনে জাপানের বৈদেশিক দপ্তর কম্পিত। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। পুলিশ ও গুপ্তচর সহর কর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাসবিহারী বা হেরম্বলালের কোন সংবাদ তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিল না।

রাসবিহারী ও হেরম্বলাল নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে নাকামুরার পুরাতন বাটীর কারখানায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল বৈদেশিক দপ্তর ও পুলিশ ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন শ্রী টোয়ামা এই অন্তর্ধানের প্রধান সহায়ক। নিষ্ফল হইয়া বৈদেশিক দপ্তর শ্রী টোয়ামার নিকট প্রস্তাব করিলেন—রাসবিহারী ও হেরম্বলাল স্বেচ্ছায় জাপান ত্যাগ করুন। বলা বাহুল্য শ্রী টোয়ামা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

হেরম্বলালের বিরুদ্ধে ইংরাজের অভিযোগ তত গুরু নহে, কিন্তু রাসবিহারীর বিরুদ্ধে ইংরাজের অভিযোগ শুধু গুরুতরই নহে, রাসবিহারীর উপর ইংরাজের জাতক্রোধ। ইংরাজ রাসবিহারীকে পৃথিবীর কোন নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব কোনে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কংগ্রেস নেতাদের ইংরাজ বহুবার বন্দী করিয়াছে, দুর্গম কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের পৃথিবীর বুক হইতে অপসৃত করিবার জন্য ব্যাকুল হয় নাই। ইংরাজের কাছে কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও রাসবিহারীতে পার্থক্য এইখানে। তাই যতক্ষণ না রাসবিহারী পৃথিবী হইতে অপসৃত হন ততক্ষণ ইংরাজ ভারতে নিরুপদ্রব নহে। রাসবিহারী জাপানে পৌঁছিয়াই জাপানের

মনোভাব বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই রাসবিহারীর মৃত্যু একান্ত আবশ্যক। শিকার মুখবিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল দেখিয়া ইংরাজের ক্ষোভের সীমা রহিল না। ইংরাজ জাপান সরকারের উপর চাপ দিতে লাগিল। এইখানে মাদাম কোকো রাসবিহারীর পলায়ন সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। শ্রীমতী সোমা লিখিয়াছেন—

সে দিনের তারিখ ২৮শে নভেম্বর ১৯১৫ সাল। শুনিলাম জাপান একজন ভারতীয় বিপ্লবীকে নির্ব্বাসিত করিতেছে। হুকুম জারি হইয়াছে মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে নির্ব্বাসিতকে জাপান ত্যাগ করিতে হইবে। এক তরুণ দেশভক্ত ভারতীয় পলাতক বিপ্লবীকে শুধু নির্ব্বাসনই নয়, রক্তলোলুপ বৃটিশ সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। ইহার অর্থ বিপ্লবীর নিশ্চিত মৃত্যু।

এই সময় আমি সর্ব্বদা স্বামীর সহিত আমাদের দোকানেই থাকিতাম। কখনও রুটীর মোড়ক বাঁধিতাম, কখনও ক্রেতার নিকট রুটীর মূল্য বুঝিয়া লইতাম, কখনও ক্রেতাদের সুবিধা অসুবিধা দেখাশুনা করিতাম। আমার স্বামী এই ভারতীয় বিপ্লবীর প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড-সংবাদ পাঠ করিয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার অন্তিম দশার কথা চিন্তা করিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। প্রাতে তিনি আমাদের দোকানের জনৈক ক্রেতা নিরকু সংবাদ পত্রের সম্পাদককে এই নির্ব্বাসিতের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে থাকেন। তিনি বলিলেন—"বড়ই দুঃখের কথা এই ভারতীয় যুবককে যাইতেই হইবে। নয় কি ?"

নাকামুরা উত্তর দিলেন—"সত্যই বড় দুঃখের কথা। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বৃটিশ সরকারের প্রতি দাস মনোভাব বড়ই লজ্জাকর……। আরও দুঃখের কথা শ্রী টোয়ামা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এই যুবককে রক্ষা করিবার কোন পথই খুঁজিয়া পাইতেছেন না।"

আমার স্বামী অতি আগ্রহের সহিত নাকামুরার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমি দোকানের অপরাংশে ব্যস্ত থাকায় তাঁহাদের মধ্যে কি কথোপকথন হইল জানিতে পারিলাম না। নাকামুরার নিকট তিনি যে প্রস্তাব করেন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ইহার পর আমার স্বামী কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়া গেলেন।

কয়েক ঘণ্টার পরেই নাকামুরা আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের দোকানে পুনরায় প্রবেশ করিলেন এবং তখনই আমি জানিতে পারিলাম আমার স্বামীর প্রস্তাবের কথা। আমরা জানিতাম না আমার স্বামী কোথায় গিয়াছেন। টেলিফোনে যেখানে যেখানে তাঁহার যাওয়ার সম্ভাবনা আমরা খোঁজ করিতে লাগিলাম।

অকস্মাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, আমার স্বামীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল। আমি টেলিফোন ধরিলাম—"তুমি? ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা তোমার অনুসন্ধান করিতেছি। কোথায় তুমি? এখনই তোমার ফিরিয়া আসা দরকার। আজ সকালেই তুমি নাকামুরার নিকট গুরুতর প্রস্তাব করিয়াছ।

মনে আছে ? তিনি এখনই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। শীঘ্র এস।”

“আসিতেছি”। তাঁহার উত্তর শেষ হইবার পূর্ব্বেই টেলিফোন কাটিয়া গেল।

দৈনন্দিন আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপ্ত করিতে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার স্বামী পথিপার্শ্বস্থ এক ভোজনাগারে কিছু আহার করিতেছিলেন। হঠাৎ নাকামুরার সহিত কথোপকথন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আহার অসমাপ্ত রাখিয়াই আমায় টেলিফোন করিলেন। পরদিন টোকিওর সংবাদ পত্র রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর নিরুদ্দেশ বার্ত্তা ঘোষণা করিল। আমরা আর মাত্র সংবাদ-পত্র পাঠক নহি। আমরা আন্তর্জাতিক ঘূর্ণিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

আমার স্বামী একজন সামান্য রুটীওয়ালা। শ্রী টোয়ামা একজন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বুঝিয়া উঠিতে পারি না সামান্য রুটীওয়ালার প্রস্তাবে কেন শ্রী টোয়ামা সম্মত হইয়াছিলেন।

বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে টোকিওর কেন্দ্রস্থলে শ্রী টোয়ামার প্রাসাদতুল্য বসতবাটী। পার্শ্বেই অধ্যাপক টেরাওর বাটী। রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু টোয়ামার বাটীতে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই, তাঁহারা উদ্যানের ভিতর দিয়া অধ্যাপক টেরাওর বাটীতে নিমন্ত্রিত হইলেন। তাঁহারা ছদ্মবেশ গ্রহণ করিলেন। রাসবিহারী টোয়ামার কিমানো (জাপানী টোগা) ও টুপি পরিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু শ্রী টুকুডার বৃহৎ ওভারকোট পরিয়াছেন।

ইনিই জাতীয় আন্দোলনের শক্তিমান তেজস্বী সর্ব্বজন পরিচিত টুকুডা। রাসবিহারী ও হেরম্বলাল, টুকুডা ও মায়াগোয়ার সহিত অধ্যাপক টেরাওর বাটীর সংলগ্ন উদ্যান পার হইয়া, অব্যবহৃত পশ্চাৎ দ্বার দিয়া অপেক্ষমান মোটরে গিয়া উঠিলেন। আমার স্বামী সম্মুখের গাড়ীবারান্দা দিয়া ঘুরিয়া পশ্চাৎদ্বারে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন ও বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

টোয়ামার বাটীর ঠিক সম্মুখেই পুলিশ অধ্যক্ষের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই নিকট যে গাড়ীতে রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু টোয়ামার বাটীতে আসিয়াছিলেন সে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। বহু পুলিশ ও সাধারণ বেশে বহু গুপ্তচর টোয়ামার বাটী ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে। অপরাহ্ন পার হইয়া গেল। কিন্তু রাসবিহারী ও তাহার বন্ধুর কোন দেখা নাই।

সন্ধ্যার পর শ্রী টোয়ামার বাটীর জানালা ক্রমে বন্ধ হইল। পুলিশ আর কত অপেক্ষা করিবে? পুলিশ গাড়ীবারান্দায় উঠিয়া নির্ব্বাসিত বিপ্লবীদের সন্ধান করিল। একজন ভৃত্য ভিতর হইতে উত্তর দিল যে নির্ব্বাসিত ভারতীয়রা তো কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। পুলিশ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। পুলিশ সমস্ত বাহিনী লইয়া টোয়ামার বাটীর চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু কেহই শ্রী টোয়ামার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। টোয়ামার উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা পুলিশের অজ্ঞাত নহে। কাজেই তাহারা

আর অধিক অগ্রসর হইল না। বাটীর গাড়ীবারাণ্ডায় পলাতকদের দুই জোড়া জুতা তখনও পড়িয়াছিল।

শ্রী টোয়ামা তাঁহার পাঠাগারে ছিলেন। বাহিরের গোলমাল শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"সত্যই ব্যাপার বড় গুরুতর এই ব্যাপারে যদি বেচারীদের চাকুরী যায় তা' হ'লে তো উহাদের জন্য আমায় কিছু করিতেই হয়………"

রাসবিহারীর গাড়ী তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। শ্রী টোয়ামা ভাড়া দিয়া গাড়ীকে বিদায় দিলেন। রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুকে লইয়া যে মোটর প্রস্থান করে তাহার মত দ্রুতগামী মোটর তখন জাপানে আর দ্বিতীয় ছিল না। মোটরখানি জাপানের প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুজিয়ামার।

রাত্রি প্রায় নয়টা। দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অন্য দিনের মত তখনও দোকানে বহু খরিদ্দার। তাহাদের বিদায় করিবার জন্য আমি ব্যস্ত; ভিতরে প্রবেশ করিলেন চার ব্যক্তি; রাসবিহারী ও হেরম্বলাল তখনও ছদ্মবেশে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চার ব্যক্তি বাহির হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কিন্তু এই চারজনের মধ্যে রহিলেন শ্রী টুকুডা ও আমাদের দোকানের একজন কেরাণী। ডাক্তার সুজিয়ামা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোটরের ড্রাইভার ফিরিবামাত্র তিনি রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ড্রাইভার জানাইল যে, সে প্রথমে টুকুডা ও তাহার তিন বন্ধুকে সিঞ্জিকি ষ্টেশনে লইয়া যায়, সেখানে তাঁহারা কয়েকটী দ্রব্য

ক্রয় করেন ও মটরে আসিয়া বসেন; তাহার পর তাঁহারা ইয়াটুয়া যান এবং সেখানে টুকুডা ব্যতীত সকলে নামিয়া যান; ড্রাইভার টুকুডাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে; পথে সে টুকুডার নিকট শুনিয়াছে যে তাঁহার অন্যান্য বন্ধুরা পদব্রজে ফিরিবেন।

পরদিনই আমার স্বামী তাঁহার নিজ ভৃত্যদের লইয়া এক গুপ্ত সভা আহ্বান করিয়া এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। সকলেই তাঁহার বহু পুরাতন ভৃত্য। আমার স্বামী বলিলেন—"তোমরা সকলেই আমার বন্ধু। আমি এক বিরাট দায়িত্ব ও বিপদ মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। জীবনে এরূপ বিপদের মধ্যে আর কখনও আমি পড়ি নাই। যে দুই ভারতীয় বিপ্লবীর উপর নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হইয়াছে আমি তাহাদের রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; আমি তাঁহাদের লুকাইয়া রাখিতে মনস্থ করিয়াছি। আমি তাঁহাদের আমাদের পুরাতন কারখানায় লুকাইয়া রাখিতে চাই! বড়ই বিপজ্জনক দুঃসাহস! কিন্তু উপায় কি? আর অন্য পথ কি আছে? আমরা স্বদেশভক্ত জাপানী হইয়া তাঁহাদের কোন্ অপরাধের জন্য চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিব।"

কেহ কোন আপত্তি তো তুলিলই না, বরং সকলেই আমার স্বামীর এই সঙ্কল্পে খুসীই হইল। তাহারা সকলেই বলিল "আপনি আমাদের প্রভু, অন্নদাতা। আপনার মতেই আমাদের মত। আপনাকে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমাদের

যেমন বিপদই হউক তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য, সে বিপদ আমরা মাথায় তুলিয়া লইব। আবশ্যক যদি হয় তো আমরা প্রাণ দিব। যদি কোনপ্রকার আক্রমণ হয় আমরা প্রবল বাধা দিব, আবশ্যক হইলে যুদ্ধও করিব। আপনি সেই সুযোগে তাহাদের অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাইবেন। দেখিবেন, যেন তাহারা রক্ষা পায়। আপনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন। কোন ভয় নাই।”

আমার স্বামীর ভৃত্যদের মুখ উৎসাহ ভরা, এমনই তাহাদের ভালবাসা! আমার একজন পরিচারিকাকে আমি রাসবিহারীর জন্য নিযুক্ত করিলাম।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের পরিবার বৃহৎ এবং দাস-দাসীও বহু। সব সময়ই আমাদের বাটীতে ও দোকানে বহু বন্ধু ও ক্রেতা। বিদেশীরা প্রায়ই আসা যাওয়া করে। সুতরাং বিদেশীর জন্য যদি আমরা কিছু বিদেশীয় প্রিয় ও আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করি সেজন্য কেহই আমাদের সন্দেহ করিতে পারে না।

আমাদের বাটীতে আসিয়া রাসবিহারী খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমাদের বাসগৃহ অংশ ঠিক আমাদের গুদামের পিছনেই। আমাদের পরিবারও বৃহৎ। আমাদের যাবতীয় কর্ম্মচারী, কেরাণী, ভৃত্য এবং আত্মীয় সকলেই আমাদের পরিবারের অন্তর্গত। এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে নিজকে সে যে একান্ত একাকী মনে করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাসবিহারীও তখন জাপানী ভাষা জানিত না। কিছুই তো তিনি বুঝিতে পারিতেন না।

আমাদের সমগ্র পরিবার রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট দেখিয়া আমি সত্যই বড় খুসী হই। আমি সামান্য সামান্য ইংরাজী বলিতে পারিতাম। কিন্তু সব সময় তো রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম না। আর যখন দেখা হইত, তখন তাহার নিকট এক সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকিতেও পারিতাম না। দোকানে সারাদিনে আমার সহস্র কাজ। তবুও সময় সময় আমি দোকান হইতে অদৃশ্য হইতাম। আমাদের ক্রেতারা নানা প্রশ্ন করিত—"মাদাম কোকো কোথায়? তাঁকে দেখছি না তো? আজকাল যে তাঁর দেখাই পাওয়া যায় না? মাদাম কোকো মাঝে মাঝে কোথায় ডুব মারেন? মাদাম যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলেন?" সুতরাং শত ইচ্ছা স্বত্তেও দোকানের নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে আমায় থাকিতেই হইত। মধ্যে মধ্যে রাসবিহারীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ছোট চিরকুট আমায় রাসবিহারীকে লিখিতে হইত। কখনও লিখিতাম সেদিনের আকাশের ভাবগতিক, কখনও লিখিতাম সেদিনের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের কথা, নয়ত বৈকালে কি পরদিন সকালে রাসবিহারী কি খেতে চায় জিজ্ঞাসা করিতাম? কিন্তু ইংরাজীতে কিছু লেখাও তো অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক। দোকানের খরিদ্দারদের সম্মুখে দিনের বেলায় আমাদের ভৃত্যদের দিয়াও তো চিরকুট পাঠান যায় না। কাজেই রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ

রাখা ও মধ্যে মধ্যে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া বড়ই শক্ত ছিল। খুব গোপনে ও অনেক সাবধানে আমি পত্র বিনিময় করিতাম। এমন কি তাহাদের আহার্য্য আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য দিয়া তাহাদেরই গুপ্তাবাসে প্রস্তুত করাইতাম।

সংবাদপত্র পাঠ হইতে বুঝিতে পারিতাম পুলিশ ক্রমশঃই অধীর হইয়া উঠিতেছে। পলাতকদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বহু বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ব্যক্তির উপর কড়া নজর রাখা হইয়াছে—কাহাকেও বা পুলিশ সন্দেহ করিয়া আটক করিয়া রাখিতেছে। ইংরাজ বৈদেশিক দূতাবাস জাপানী পররাষ্ট্র কার্য্যালয়ের উপর তীব্র আক্রমণ চালাইতেছেন এবং বিপ্লবীদের পলায়নের জন্য সমস্ত দোষ তাহাদের উপর চাপাইতেছেন। নানাপ্রকার গুজব চারিদিক হইতে উঠিতেছে ও সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। একদিন ওয়াসডা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক আচার্য্য আমাদের দোকানে আসিয়াছেন। নানাপ্রকার আলাপ হইতে লাগিল। কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি হঠাৎ বলিলেন—"আমি জানি কোথায় রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু নিরাপদে লুকাইয়া আছেন।" আমার স্বামীর হৃৎপিণ্ডে প্রবল ধাক্কা লাগিয়া হৃৎক্রিয়া বুঝি বন্ধ হইয়া যায়! আত্মসংবরণ করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কোথায়?" আচার্য্য উত্তর করিলেন—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি তাঁহার বাড়ীতেই উহাদের লুকাইয়া রাখিয়াছেন।" আমার স্বামীর হৃৎপিণ্ডের চাপ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল,

তাঁহার রক্তের গতি সরল ও স্বাভাবিক হইল। ভারত নিপন সমিতির মূল উদ্যোক্তা ও সভাপতি কাউন্ট ওকুমার উপরও সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পুলিশ সন্দেহ করিতে থাকে। পুলিশ অধ্যক্ষ নিশিকিটোর উপর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এত চাপ দেন যে তাঁহার গুপ্তচরেরা টোকিওর মাংসের দোকানের উপর পর্য্যন্ত তীব্র নজর রাখিতে বাধ্য হয়। ভারতীয়রা যে মাংস খায় না সে কথা তখন কেহ জানিত না।

এক বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ, হংকংগামী এক ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিয়া ছয়জন নিরীহ ভারতীয় যাত্রীকে ডাকাতি করিয়া লইয়া যায়। এ সংবাদ যখন জাপানে প্রকাশিত হইল, তখন জাপানী জনসাধারণ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তর নীতির পরিবর্ত্তন করিল। বিপ্লবীদের প্রতি যে নির্ব্বাসন দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল প্রায় সাড়ে চার মাস পরে পররাষ্ট্র দপ্তর তাহা প্রত্যাহার করিল। এতদিনে রাসবিহারী মুক্তি পাইল। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসের এক প্রভাতে রাসবিহারী নির্জ্জন গুপ্তাবাস হইতে বাহিরে আসিল। সে দিন আমি রোগ শয্যায়। আমার এক শিশুসন্তানের মৃত্যুতে শোকে কাতর হইয়া পীড়িত হইয়া পড়ি ও শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হই।

রাসবিহারী আমাদের আশ্রয়ে আসিবার একপক্ষের মধ্যেই আমার শিশুটী বিনষ্ট হয়। স্নায়ু কেন্দ্রের উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় আমার বুকের দুগ্ধ শুকাইয়া যায়। আমি শিশুটীকে

যথেষ্ট দুগ্ধ দিতে পারি নাই। তারপর একদিকে অবিরত দিনের পর দিন পুলিশ গুপ্তচরের ভয় অপরদিকে মৃতশিশুর জন্য শোক, তাহার উপর প্রত্যহ আমাদের মাননীয় দুই অতিথিকে রক্ষা করার বিরাট দায়িত্ব! আমার সমস্ত শক্তি ভাবনায় ভয়ে শোকে নষ্ট হইয়া যায়।

যে দিন রাসবিহারী আমাদের গৃহত্যাগ করে সেই দিন রাসবিহারী দ্বিতলে আমার কক্ষে প্রবেশ করে। নীচে নামিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার মত শক্তি আমার ছিল না।

সামুরাইরা শুভ কর্ম্মের জন্য যে কিমানো পরিধান করে এই বিশেষ দিনটীর অপেক্ষায় আমরা রাসবিহারীর জন্য সেইরূপ একটী কিমানো পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। রাসবিহারী সেই কিমানোটী পরিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। রাসবিহারীকে কি সুন্দর দেখাইতেছিল! মনে হইতেছিল এক মহাপুরুষ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

রাসবিহারী কথা কহিল—"মা! জানিনা সে ভাষা, যে ভাষায় তোমার অপার স্নেহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি! আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া মা, তুমি তোমার গর্ভজাত সন্তান হারাইয়াছ! কৃতজ্ঞতা জানাইবার মত কোন ভাষাই আমার জানা নাই!"

রাসবিহারী আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে! আমি মূক, আমি আত্মহারা। একটী কথাও আমি বলিতে পারি নাই। আমরা হাতে হাত রাখিয়া শুধু অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

আমি নীচে নামিয়া তাহাকে বিদায় দিতেও পারিলাম না। রাসবিহারী নীচে মোটরে উঠিতেই মোটর ছাড়িয়া দিল। গবাক্ষ পথ দিয়া আমার অশ্রুসজল নয়নদুটী রাসবিহারীর গাড়ীর অনুসরণ করিতে লাগিল। গাড়ী অচিরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমার যে শিশুকে হারাইয়াছি তাহাকে আজও ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু সেইদিন! সেইদিনই ভারতমাতার আত্মার সহিত আমি যুক্ত হইয়া গেলাম!"

শ্রীমতী সোমার বিবৃতির কয়েক স্থানের টীকা প্রয়োজন। শ্রীমতী সোমা লিখিয়াছেন, ভারতীয়রা মাংস খান না। কথাটা সত্য নহে। ভারতীয় হিন্দুদের অনেকেই ছাগ বা মেষ মাংস খান। তবে হিন্দুরা নিষিদ্ধ মাংস স্পর্শ করেন না। রাসবিহারী মাছ, মাংস ও ডিম ভাল বাসিতেন। ইহাদের মধ্যে একটী না একটী তাঁহার প্রতিদিনের আহার্য্যের মধ্যে থাকিত। তবে গো-মাংস বা অন্য নিষিদ্ধ মাংস তিনি স্পর্শ করিতেন না। শ্রীমতী সোমা কোন্ মাংসের কথা লিখিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। তবে রাসবিহারীর সহজ বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি সম্ভবতঃ জাপানের মাংস বিচার সম্বন্ধে অজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাসবিহারী নিজে এক রহস্যজনক কাহিনী 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত করেন। রাসবিহারী তখন নবদ্বীপে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। এক বৈষ্ণব বাবাজীর দ্বিতলের একখানি ঘর লইয়া বাস করিতেছিলেন। এইখানে কখনও কখনও বিশেষ গোপনে

তাঁহার একান্ত বিশ্বাসী সহকর্ম্মীরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। বৈষ্ণবের বাটী, মাংসাহার নিষিদ্ধ। তাহাতে বাবাজী গোঁড়া বৈষ্ণব। কিন্তু রাসবিহারী মাংস ভালবাসেন। তাঁহার মাংস খাইবার ইচ্ছা হইলে, বন্ধুরা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং ঘরের জানালা, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মাংস রন্ধন ও ভোজন চলিত। রন্ধনকালীন মাংসের সুঘ্রাণ বাবাজীর নাসিকায় প্রবেশ করিয়া বাবাজীকে সন্দিগ্ধ ও বিচলিত করিত। একদিন রাসবিহারী বিশেষ দক্ষিণা দিবার লোভ দেখাইয়া বাবাজীর নিকট মাংস আনাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। প্রথমে ঘোর আপত্তি জানাইলেও শেষে অর্থলোভে বাবাজী মাংস আনাইয়া দিতে স্বীকৃত হন। পরবর্ত্তী-কালে বাবাজী নিজেই মাংস প্রসাদ করিয়া দিতেন, এবং সেইদিন হইতে আর মাংস ভোজনের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। রাসবিহারী এই সূত্রে গুরু জাতীয় মিথ্যাচারীদের উল্লেখ করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পাপ করিয়া অধর্ম্ম করিয়া, সমাজ ও শাস্ত্র বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থমূল্য দান করিলেই পাপমুক্তি, এই যে প্রথা অর্থলোভী পুরোহিত ও গুরু দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা জাতির ভিত্তিতে আঘাত করিয়া জাতিকে ক্রমাগত দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে।

আর এক প্রশ্ন স্বতঃই উঠে। রাসবিহারী মাত্র জাপানে পাঁচ মাস পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে জাপানের জনসাধারণ বিশেষ কিছুই জানেন না। সামান্য কিছু হয়তো সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়া থাকিবে রাসবিহারী কর্ত্তৃক আহুত সভা সম্বন্ধে।

শ্রী টোয়ামা, আইজো সোমা প্রভৃতি সহসা রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের সমূহ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন কেন? রাসবিহারীর ব্যক্তিত্ব এমন কিছু ছিল না, অথবা রাসবিহারী ভারতের কোন প্রসিদ্ধ জননেতাও ছিলেন না। তবে কেন? এ প্রশ্ন ডাক্তার অশোয়াকে বা জাপানের প্রসিদ্ধ আচার্য্য হিতোকাকে করিয়াও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা বলেন, জাপান ভারতের নিকট হইতে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছে। সে ঋণ জাপান ভুলিতে পারে না, তাহারা ভারত ও ভারতীয়কে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। হইতে পারে সে কথা সত্য, কিন্তু সেইকারণে অজ্ঞাত কুলশীল বিপ্লবীকে আশ্রয় দিতে যাইয়া আপনাদের সমূহভাবে বিপন্ন করা স্বতন্ত্র।

শ্রী টোয়ামা রাসবিহারীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার মহত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ন্যায়সঙ্গত বা আইন সঙ্গত ভাবে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অতিরিক্ত তিনি কেন করিলেন? শ্রীযুক্ত সোমা রাসবিহারীকে জানেন না, দেখেনও নাই, মাত্র তাঁহার নির্ব্বাসনের আদেশ দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেনই বা কেন এবং বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন কেন? তাঁহার দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন সকলেই রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন বিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর কেন? বহু প্রকারে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য চিন্তা করিয়া মাত্র একটী উত্তর পাওয়া যায়—সেটী জাপানের প্রত্যেকটী স্ত্রী পুরুষের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ।

সেই প্রকৃত দেশভক্ত যে অপরের দেশভক্তিকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করে। নেপোলিয়ান নিজে অতি মাতৃভক্ত ছিলেন বলিয়াই সামান্য সৈনিকের মাতৃভক্তিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বদেশ প্রেমের কষ্টিপাথর দিয়াই তাঁহারা রাসবিহারীর স্বদেশ-প্রেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা নিজদের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতা স্বদেশ-প্রেমে দীক্ষিত, তাই অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন সামান্য দাসদাসীও রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্য বারংবার নিজদের বিপন্ন করিয়াছে।

হেরম্বলালের অধৈর্য্য ও জাপান ত্যাগ

রাসবিহারী ও হেরম্ব তাঁহাদের গুপ্তাবাস হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন। ক্রমে হেরম্বলালের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে লাগিল। তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। নির্ভীক রাসবিহারী তখনও সম্পূর্ণ অচঞ্চল। যে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, যে নিজেকে ভগবানের যন্ত্রমাত্র জ্ঞান করে, তাহার অধীরতা থাকে না, তাহার সর্ব্বাবস্থায় সমভাব। সে হয় স্থির, ধীর, গম্ভীর—সুখে ও দুঃখে অনভিভূত। কিন্তু হেরম্ব রাসবিহারীর মত এমন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রীয় জীবনযাপন করিতে পারিতেছিলেন না। রাসবিহারী তাঁহাকে বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন,

বহু সান্ত্বনা বাণী শুনাইলেন। কিন্তু হেরম্বের হৃদয় মুক্তির জন্য উদ্বেলিত—তিনি বাহিরের আলো বাতাসের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যে কোন মূল্যে তিনি মুক্তি ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত। একদিন রাত্রিতে হেরম্বলাল বাতায়ন পথ দিয়া গুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভাবিতে পারিলেন না যে, তিনি যদি ধরা পড়েন, তাঁহার কি হইবে, রাসবিহারীর পরিণাম কি হইবে। যদি হেরম্ব ধরা পড়িতেন, তাহা হইলে রাসবিহারীর নিস্তার ছিল না, সোমা পরিবারেরও বিপদের অন্ত থাকিত না। হেরম্বলাল পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আবিস্কার করিবার জন্য শ্রী টোয়ামার অনুচরেরা তৎপর হইয়া উঠিল।

পুলিশ ও গুপ্তচর সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য সকল স্থানেই এই বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া শ্রী টোয়ামার পক্ষে বিপ্লবী হেরম্বলালের অনুসন্ধান কঠিন ও বিপজ্জনক। বহু চেষ্টা করিয়াও হেরম্বলালকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকল অনুসন্ধান নিষ্ফল হইল। উদ্বেগ ও আশঙ্কায় দিন কাটিতে লাগিল।

চারিদিন পরে বন্ধুবর শ্রী ওহকাওয়া শ্রী টোয়ামার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে হেরম্বলাল তাঁহার বাটীতে আত্মগোপন করিয়া আছেন। সকলেই স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। হেরম্বলালের জন্য রাসবিহারীর জীবনে যে ঘোর বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল। হেরম্বলাল সোমার শিল্পাগার

হইতে পলাইয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কয়েকটী বাটীর পরই এক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের বাটী। তিনি অধিক অগ্রসর হইতে না পারিয়া এই খৃষ্টানধর্ম্মযাজকের শরণাপন্ন হন। এই সরল হৃদয় ধর্ম্মযাজক হেরম্বকে রাত্রির জন্য আশ্রয় দেন। কিন্তু দরিদ্র ধর্ম্মযাজকের বাটীটি অতি ক্ষুদ্র, একান্ত স্থানাভাব। সেখানে অধিক দিন হেরম্বলালের পক্ষে থাকা কষ্টকর। তিনি ওহকাওয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। ওহকাওয়ার সহিত হেরম্বলালের বিশেষ পরিচয় ছিল না। কয়েকমাস পূর্ব্বে পথে ওহকাওয়ার সহিত সামান্য আলাপ হয়। সেই সময় ওহকাওয়া নিজ নামের একখানি কার্ড দিয়া হেরম্বকে নিজ আবাসে নিমন্ত্রণ করেন। এতদিন পরে ওহকাওয়ার সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হেরম্বলাল উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেদিনে আর এদিনে কত পার্থক্য। সেদিনের নিমন্ত্রণ ছিল শিষ্টাচার, এদিনের আশ্রয়দানের অর্থ নিজকে বিপন্ন করা। তথাপি ওহকাওয়া পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি বিপন্নকে রক্ষা করিতে নিজ মস্তকে বিপদভার তুলিয়া লইয়া ছিলেন। ওহকাওয়া তখন নিখিল এশিয়া সমিতির সভাপতি।

শ্রী টোয়ামা শ্রী ওহকাওয়াকে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও হেরম্বলালকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করেন ও শ্রী ওহকাওয়া নিজের সমূহ বিপদ জানিয়াও হেরম্বলালকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। হেরম্বলাল পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পলায়ন করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থবান শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বীয় আত্মীয় স্বজন বা স্বজাতি রক্ষার জন্য হস্তপ্রসারণ করেন, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়পদে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হন, বা সামান্য ক্ষতি স্বীকার করেন? কয়জন আছেন বিপন্ন বিদেশীকে বা পরধর্ম্মীকে (বিপদ বরণ না করিতে হইলেও) একদিনের বা একরাত্রির জন্য আশ্রয় দান করেন? পক্ষান্তরে কয়জন আছেন যাঁহারা উপকারীর উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন ?

জাপানী আরোহী জাহাজের উপর ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজের গুলী বর্ষণ—ফলে রাসবিহারীর প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের প্রত্যাহার

শ্রীমতী সোমার বিবৃতিতে প্রকাশ, ইংরাজ কি ভাবে গোলাবর্ষণের সাহায্যে জাপানী জাহাজ হইতে ছয়জন নিরপরাধ ভারতীয়কে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া লইয়া যান। এই অত্যাচারের সংবাদ যখন টোকিওতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, জাপানী জনসাধারণ তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঘোর আন্দোলন সমগ্র দেশ আলোড়িত করিল। সমগ্র নিপনজাতি পররাষ্ট্র দপ্তরের দুর্ব্বলতার তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই এই আক্রমণ ভীষণ আকার ধারণ করিল। আন্তর্জাতিক নিয়মভঙ্গ করিয়া জাপানী জাহাজ আক্রমণের জন্য, জনসাধারণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও দপ্তরকে কঠিন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিক ইংরাজ দূতাবাসে উপস্থিত হইয়া জাতীয় প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন। সমগ্র নিপন আকাশে এক বিপুল বৈদ্যুতিক চাপ জমা হইল, এখনই বুঝি ঝঞ্ঝা নামিয়া আসিবে। নিপন জাতির এই ঐক্যবদ্ধ আবেদন উপেক্ষা করিবার সাহস বৈদেশিক সচিবের রহিল না। বৈদেশিক মন্ত্রী বিপ্লবী ভারতীয়ের প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করিলেন। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রায় সার্দ্ধ চারি মাসের পর রাসবিহারী প্রথম মুক্ত আকাশ দেখিলেন। রাসবিহারীর স্বভাব-সুন্দর ব্যবহার এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে সোমা পরিবারের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

রাসবিহারী এই সার্দ্ধ চারি মাস নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই অজ্ঞাতবাস কালে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে ও জাপানী জনসাধারণকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইলে জাপানী ভাষায় ভারতের কৃষ্টি ও ইতিহাস, জাপানকে শুনাইতে হইবে; ইংরাজ ক্ষমতাবলে কিভাবে ভারতের জনসাধারণকে লাঞ্ছিত ও লুণ্ঠিত করিতেছে, তাহাও জাপানে প্রচার করিতে হইবে। সুতরাং তিনি জাপানী ভাষা আয়ত্ত করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি এই ভাষায় এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, জাপানী জনসাধারণ তাঁহার ভারত বিষয়ক বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহুদূর হইতে টোকিওতে সমবেত হইতেন। আচার্য্য হিতোকা কথা প্রসঙ্গে বলিয়া-

ছিলেন—পরবর্ত্তীকালে রাসবিহারী টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ও এশিয়ার ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরামর্শ সভার সভ্য নিযুক্ত হন।

যাঁহার মাথার উপর সূক্ষ্ম সূতায় ক্ষুরধার তরবারী দোদুল্যমান, তাঁহার পক্ষে আত্মনিষ্ঠ হইয়া নিবিষ্ট মনে মাতৃভূমির সেবার জন্য এক কঠিন বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শিক্ষা করিবার প্রয়াস, প্রকৃতই প্রত্যেক চিন্তাশীল স্বদেশভক্তকে শুধু বিস্মিত করিবে না, কর্ম্মযোগ শিক্ষা করিতেও উৎসাহিত করিবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, রাসবিহারী প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে তিনি প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করিয়া নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য প্রতিভাবান পুরুষ ভারতের উর্ব্বর ভূমিতে অপ্রতুল নহে। প্রতিভা মানুষকে সুপথ কুপথ উভয় পথেই চালিত করিতে পারে। ভারতে বহু প্রতিভা শুধু যশঃ লাভের জন্য, অর্থলাভের জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিদিন ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। রাসবিহারীর প্রতিভা তাহাকে বড় করে নাই, রাসবিহারীর আত্মত্যাগ, অনন্যসাধারণ নির্লোভ একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধনা ও অপরিসীম দেশভক্তি তাহাকে বড় করিয়াছে।

যাঁহারা রাসবিহারীর সঙ্গে একত্র বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই রাসবিহারীর একনিষ্ঠ সমাহিত রূপ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। রাসবিহারী যখন আসন

করিয়া বসিয়া সুর সাধনা করিতেন তাঁহার সেই ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি উপস্থিত সকলকেই অভিভূত করিত—তাঁহার মুখে শ্যামা-সঙ্গীত বা 'বন্দেমাতরম্' এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিত।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"বড় হইবার একমাত্র উপায় ক্ষুদ্রতা বর্জ্জন। মানুষের দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষাকে ত্যাগ কর, সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে ক্ষুদ্রত্ব তোমাকে স্পর্শ করিবে না।" রাসবিহারী বিবেকানন্দের এই বাণীকে জীবনে সার্থক করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য কিছুই নয় যে, এরূপ এক ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীমতী সোমা ও তাঁহার পরিবারবর্গ রাসবিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবেন, ভারতবাসীর সম্বন্ধে তাঁহারা উচ্চ ধারণা পোষণ করিবেন ও ভারতের প্রতি তাঁহারা সশ্রদ্ধ হইবেন।

যে সকল ভারতীয় কার্য্যোপলক্ষে বা বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রবাসে গমন করেন, রাসবিহারীর নৈতিক চরিত্র তাঁহাদিগের অনুকরণীয়। তাঁহারা প্রবাস-বাস কালে সর্ব্বদা যেন স্মরণ রাখেন, তাঁরা স্বাধীন ভারতের জীবন্ত প্রতীক। বিদেশীরা মাত্র দুই একজন ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং যাঁহাদের সংস্রবে সমাগত হন, তাঁহাদের ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র দ্বারাই সমগ্র ভারতবাসীর সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকেন। এই সকল প্রবাসী ভারতসন্তান ভারতের কৌলিন্যের দাবী পরিস্ফুট করিতে পারেন আবার বিনষ্টও করিতে পারেন। ভারতের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ জগতে শ্রেষ্ঠ, ভারতীয়ের বাস্তব জীবন যেন সেই ভিত্তির উপর

গঠিত হইয়া ভারতীয়কে জগতে বরেণ্য করে। ভারতের দিগ্বিজয় যেন সেই পথেই সাধিত হয়।

রাসবিহারী ভাষাবিদ্ ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, জাপানী ভাষায় তাঁহার রচনা ও বক্তৃতা জাপানীকে কেবল মুগ্ধ করে নাই, তাঁহাদিগকে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং উত্তরকালে রাসবিহারী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া, কেবল ভারত নহে, সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তির জন্য প্রস্তুত ও বদ্ধপরিকর করিয়াছিল।

ইংরাজ দূত কর্ত্তৃক রাসবিহারীর পশ্চাদ্ধাবন।

রাসবিহারী উন্মুক্ত আকাশের তলে রহিলেন বটে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই। ইংরাজ মাত্রেরই রাসবিহারীর প্রতি অদম্য ক্রোধ। ইংরাজ তাঁহার ধ্বংসের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত হইতে ইংরাজ উচ্ছেদ করিবার জন্য রাসবিহারীর প্রচেষ্টা অতি গুরুতর। সুতরাং ইংরাজ, রাসবিহারী জীবিত থাকিতে, নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তাহারা রাসবিহারীর পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিল না। প্রকাশ্যে রাসবিহারীকে ধ্বংস করিবার পথ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু গুপ্তহত্যার চেষ্টা তীব্রতর হইয়া উঠিল। রাসবিহারী সতর্ক, রাসবিহারীর বন্ধুরা সতর্কতর, তবুও আত্মরক্ষার্থে রাসবিহারীকে পরবর্ত্তী নয় বৎসরের মধ্যে সতের বার বাসস্থান পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। কোথাও তিনি স্থায়ীভাবে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই।

কোথাও একরাত্রি, কোথাও কয়েক রাত্রি, কোথাও কয়েক মাস, কোথাও বা একবৎসর বাস করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। জাপানের ইংরাজ রাজদূত প্রচুর পুরস্কার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া বেসরকারী গোয়েন্দা ও হত্যাকরী নিযুক্ত করেন।

শ্রী টোয়ামা রাসবিহারীর গুণমুগ্ধ বন্ধু। একদিন তিনি রাসবিহারীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য বাক্‌দান করিয়াছিলেন। পক্ষী যেমন আপন শাবককে পক্ষাচ্ছাদনে রক্ষা করে শ্রী টোয়ামা তেমনই সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা রাসবিহারীকে রক্ষা করিতেন। তাঁহার বাক্‌দান নিরর্থক হয় নাই। তাঁহার কৌশলে ইংরাজ রাজদূত ও তাঁহার নিযুক্ত গুপ্তচর-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

রাসবিহারীর সহিত শ্রী টোয়ামার মত ক্ষমতাবান ও সম্ভ্রান্ত লোকের সর্ব্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা অতি কঠিন। তাঁহার কর্ম্মচারীদেরও সকলের অলক্ষ্যে এই যোগাযোগ রক্ষাও কঠিন। তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মচারীর উপর ইংরাজদূত ও তাঁহার গুপ্তচরদের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তবে কে এই যোগাযোগ রক্ষা করিত? চতুর দক্ষ অপরিচিত গুপ্তচরকে চতুরতায় পরাজিত করিতে সমর্থ এরূপ একজন বিশ্বাসী, নির্ভীক ব্যক্তির প্রয়োজন। এমন ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যায়? কে বিদেশীর জন্য এবম্প্রকার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? কে অর্থলোভ দমন করিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে? যে করিবে তাহার নিজের বিপদও কম নহে। এই বিপদসঙ্কুল গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার কাহার উপর ন্যস্ত করা যায়? এই চিন্তা শ্রী টোয়ামাকে পীড়া দিতে লাগিল।

অবশেষে শ্রী সোমার জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী তোসিকোর উপর এই ভার ন্যস্ত হইল।

শ্রী সোমা ও শ্রীমতী সোমা

যে কোন মুহূর্তে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইতে পারেন, এ কথা রাসবিহারীও জানিতেন, রাসবিহারীর বন্ধুরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্রমশঃই ইংরাজ দূতাবাস দ্বারা নিযুক্ত গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতকের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাসবিহারীর সঙ্গে রক্ষী হিসাবে একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রাসবিহারীর বন্ধুরা অনুভব করিতে লাগিলেন। চাপ এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, শ্রী সোমা স্থির করিলেন, অবিলম্বে একজন পার্শ্বচর ও রক্ষী নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসী লোক কোথায়? শ্রী টোয়ামাও এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। শ্রী টোয়ামা একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ শ্রী টোয়ামার মস্তিষ্কে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! এক উপায় আছে, কিন্তু—? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? তবুও চেষ্টা করিতে দোষ কি? তিনি শ্রী সোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সহায় সম্বলহীন. দীন ভারতীয় রাসবিহারীর জন্য সোমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ভিক্ষা করিয়া বসিলেন! তিনি বলিলেন—"রাসবিহারীর জীবন প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক? সে যে ভারত-জাপান মৈত্রীর একটী ক্ষীণ সূক্ষ্ম সূত্র! এখন প্রশ্ন এই সূত্রকে রক্ষা

করিবার জন্য শ্রী সোমা ও শ্রীমতী সোমা, প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলি দিতে প্রস্তুত কি না ?”

বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন স্বামী স্ত্রীতে। জাপানীরা শুধু স্বদেশভক্ত নহে, রক্ষণশীলও বটে। নিজেদের জাতীয় নীতি ও কৃষ্টির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাহারা আন্তর্জাতিক বিবাহকে অতি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

ধনী হউক, দরিদ্র হউক, বিশাল হৃদয় হউক, বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হউক, প্রভূত ক্ষমতাশালী হউক, রাজ রাজ্যেশ্বর হউক, যেই হউক না কেন, সে যদি স্বজাতি না হয় তাহা হইলে তাহাকে কন্যাদান গর্হিত সামাজিক অপরাধ। যদি কেহ এবংবিধ সামাজিক প্রথাকে উপেক্ষা করে, তবে সে সমাজের কলঙ্ক, অসীম ঘৃণার পাত্র—সমাজ তাহাকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য। ভারতীয়, চৈনিক বা ইন্দোনেশিয়ার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একেবারেই অসম্ভব। টোকিওর ধনী রুটীওয়ালার সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে এক কৃষ্ণকায় নির্ব্বাসিত সহায়-সম্বলহীন, কপর্দকশূন্য ভারতীয়ের বিবাহ কল্পনাতীত। অতি অসম্ভব প্রস্তাব। কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হয়। ইতিহাসে তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মানব সমাজে রাসবিহারীর প্রয়োজন শেষ হয় নাই। শ্রীভগবানই তাঁহাকে দুস্তর বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, আবার তিনিই সেই বিপদজাল ছিন্ন করিবার উপায়ও স্থির করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে রাসবিহারীকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করা,

সেও তো সেই শ্রীভগবানের কার্য্য। রাসবিহারী উর্ব্বর ক্ষেত্র, কিন্তু সে ক্ষেত্রকে সম্যকভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে নিক্ষিপ্ত অমূল্য বীজ অঙ্কুরিত হইয়া জগতকে বিস্মিত করিতে পারিবে। আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, এক অদৃশ্য শক্তি যে আমাদের প্রতি পদে চালিত করিতেছে, আমরা যে সেই পরম শক্তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র, রাসবিহারীর জীবনে তাহা পুনঃ পুনঃ প্রতীয়মান হইয়াছে। পুরুষকার হইতে দৈব বড়, কি দৈব হইতে পুরুষকার বড়, একথার মীমাংসা করা অতীব কঠিন। পুরুষকার তখনই সার্থক, যখন দৈব তাহার সহায়। ব্যর্থতাও সার্থক হইয়া উঠে দৈবের ইঙ্গিতে।

রাসবিহারীর জীবনের অবশিষ্ট অংশ, সোমা পরিবার দ্বারা প্রভাবান্বিত। রাসবিহারীর জীবনের প্রথমার্দ্ধ (২৯ বৎসর) ভারতে অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধ জাপানে। যদি শৈশব ও কৈশোর বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাসবিহারীর ভারতে কর্ম্মজীবন মাত্র ১৪।১৫ বৎসর হয়। কিন্তু ভারতের বাহিরে প্রায় ৩০ বৎসর। রাসবিহারীর এই ত্রিশ বৎসর নানাভাবে সোমা পরিবারের সহিত জড়িত। তাই শ্রীসোমাকে জানিবার বিশেষ প্রয়োজন। টোকিও নগরীর এই রুটীওয়ালাকে পৃথক করিয়া দিয়া রাসবিহারীকে সম্পূর্ণভাবে জানা অসম্ভব।

এই সোমা জাপানের বিশিষ্ট সামুরাই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। আমরা ভারতবাসী জাপানের সামুরাই সম্প্রদায় কি তাহা বুঝি না। কাজেই সামুরাই সম্প্রদায়ের পরিচয় আবশ্যক। কোন

কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন, এই সামুরাই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয় ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত। তাঁহারা অনুমান করেন, শ্রীকৃষ্ণ পুত্র শাম্ব তাঁহার পরিবারবর্গ ও অনুচরবর্গ লইয়া এই সূর্য্যোদয়ের দেশে বাস করেন। শাম্ব হইতেই সামুরাই শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং শাম্বের বংশধরগণই সামুরাই নামে অভিহিত। ভারতই হ'ল প্রাচ্য সভ্যতার জন্মদাত্রী। সামুরাই হইল তাহারা, যাহারা ন্যায় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অধিষ্ঠাতা ও প্রচারক। ভারতে ও জাপানে এই যে যোগ সূত্র, ইহার সত্যতা নির্ণয় করা প্রত্নতত্ত্ববিদ গবেষকদের বিষয়ীভূত।

শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত—পরম কৌশলী যোদ্ধা, সেনাপতি ও সারথী। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি দেশ রক্ষার্থে ধর্ম্ম যুদ্ধ। ইংরাজী soldier শব্দ অর্থে বুঝায় বেতনভুক সৈন্য—যে বেতন দিবে এই বেতনভুক সৈন্য তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিবে—সেখানে শত্রু মিত্রের প্রশ্ন উঠে না, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা উঠে না। ভারতে ব্রাহ্মণেরা সমাজের যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে ব্রতে ব্রতী ছিলেন সামুরাই সম্প্রদায় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারত যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করেন নাই, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ন্যায় ও ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ম্মে ব্রতী করেছিলেন। সামুরাইগণ সেই আদর্শ পুরুষের আদর্শ হইতে নিজেদের কোনদিন চ্যুত হইতে দেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজী soldier অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করে, যুদ্ধের ন্যায়-অন্যায়ের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব নাই। তাহারা অর্থলোভ দ্বারা চালিত, মূল্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তাহাদের আত্মবিক্রয়। কিন্তু সামুরাইদের শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রত্যেক সামুরাই বংশের শিশুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য, জীবনের অল্পতা, বিশ্বের নিয়ম ও ধর্ম্ম এবং সুখ ও শান্তির মূল তথ্য। ইহারই সহিত সমান্তরাল ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা ও বিনা বলপ্রয়োগে আত্মরক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা প্রদত্ত হয়। সামুরাইএর নিকট অপরকে স্বার্থ রক্ষার্থে আক্রমণ অধর্ম্ম, সুতরাং নিষিদ্ধ। তাহার পর জাপানী প্রথায় যোগ শিক্ষাও দেওয়া হয়। তারপর আসে সন্তরণ, অশ্বারোহণ, বর্শা ব্যবহার, অসি চালনা, কিছুই বাদ যায় না। মোট ষোলটী কলা, প্রতি সামুরাই সন্তানের শিক্ষণীয়। মূলতঃ সামুরাইয়ের শিক্ষার ভিত্তি—বিশ্বরহস্য, ন্যায় ও দর্শন।

আত্মত্যাগ ও আত্মনিষ্ঠার পটভূমিকায় শ্রী সোমার জন্ম, পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণ। তিনি স্বদেশভক্ত ও ন্যায় ধর্ম্মের প্রতীক। সুতরাং স্বদেশভক্ত রাসবিহারীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ অতি স্বাভাবিক। শ্রী টোয়ামার প্রস্তাব তাঁহাকে প্রথমে স্তম্ভিত করিলেও উভয় দেশের মঙ্গল ও মৈত্রীর বিষয় চিন্তা করিয়া আত্মজাকে রাসবিহারীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প শ্রী সোমা তাঁহার স্ত্রীকে জানাইলেন। শ্রীমতী সোমা প্রস্তাব শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একদিকে রাসবিহারী, যে রাসবিহারীর

মাতৃ সম্বোধনে তিনি আত্মহারা, যাঁহার একটী আহ্বানে তিনি ভারতমাতার সঙ্গে একাত্ম বোধ করিয়াছেন—অপরদিকে তাঁর সুন্দরী, শিক্ষিতা প্রথমা কন্যা এবং তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তিনি কি করিয়া কন্যাকে বলিবেন "তুমি রাসবিহারীর জন্য আত্মবলি দাও, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক নিঃস্ব ভারতীয়, যাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন, তাঁহার জন্য সমাজ চ্যুত জীবন বরণ করিয়া লও। ইহাই আমার ও তোমার পিতার যুক্ত আদেশ।" কিন্তু রাসবিহারীর মাতৃ আহ্বানে তাঁহার মধ্যে বিশ্বমাতৃরূপ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই বিশ্ব-জননীর আদেশে তিনি সমাজ বন্ধন, কন্যার ভবিষ্যৎ সুখসুবিধা, সকলই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যয় বাহুল্যের নিমিত্ত রাসবিহারীর পিতা দেশেই রাসবিহারীর মাতার শ্রাদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। রাসবিহারী পিতাকে বলিলেন, "মাতৃ আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারিব না। বাবা! মা নিজের জন্য কখনও কিছু চান নাই। তিনি দুই হাত তুলে দিয়ে গেছেন। শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁর আশীর্ব্বাদ রেখে গেলেন। তুমি অনুমতি দাও বাবা, হরিদ্বারে তাঁর কার্য্য হ'ক। না হলে তাঁর আত্মা দুঃখিত হবে।"

কিন্তু, এই রাসবিহারী তাঁহার বিমাতার ও পিতার একটী অনুরোধ কোনদিনও রক্ষা করেন নাই। তাঁহার বিমাতা বিবাহের অনুরোধ করিলেই হাস্য পরিহাস করিয়া সে কথা চাপা দিতেন। একবার বিমাতা বি.শষ অসুস্থ। রাসবিহারী মায়ের পথ্য

প্রস্তুত করিতে করিতে বলিলেন "আর তো পারিনা মা। সব কাজ কর্ম্ম গেল। কি কর্লে শীঘ্র সেরে উঠবে বলতো মা?"

মা বলিলেন "সে তো অনেক দিনই বলছি, রাসি।" রাসবিহারী পরিহাস করিলেন "মা, কলম লেগেছে বটে, কিন্তু কুড়ালীর ঘায়ে জোড় কেটে যেতে কতক্ষণ? আর যদি হুসিয়ার মেয়ে হয় ত করাত চালাবে, কখন জোড় কেটে গেলো টেরও পাবে না।" মা উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"তবে? তবে আমার সেবা?"

উভয়েই ক্ষণকাল মৌন। অনেকক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করিয়া মা বলিলেন—"কিন্তু পরশ পাথরও আছে বাবা, লৌহও সোনা হয়।" রাসবিহারী চুপ করিয়া রহিলেন। মা বলিলেন "আমার সেবা, রাসি?"

রাসবিহারীর মুখ বেদনা-কাতর। তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আমি সেবা কর্ব্বো, ছেলের চেয়ে কি পরের মেয়ে বড় মা? আমার চেয়ে কে তোমার বেশী করে সেবা কর্ত্তে পার্ব্বে?"

মা আর কখনও রাসবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব করেন নাই। আজ রাসবিহারীর বিবাহ প্রস্তাব! তখন যে কারণে রাসবিহারী বিবাহ করেন নাই, আজ কি সে কারণ দূরীভূত হইয়াছে?

রাসবিহারীর পিতা, পিতামহ বাঙ্গলার বিশিষ্ট কায়স্থ সন্তান। তাঁহারা বাঙ্গলার বৈঁচি ও সিঙ্গুরের খ্যাত বসু বংশের শাখা। এ বংশ কোন দিন সমাজ অতিক্রম ও অগ্রাহ্য করিয়া

কোন কার্য্য করেন নাই। ধন, জন, পদ বা রূপসী শিক্ষিতা কন্যার মোহে পড়িয়া এই বসু বংশের কোন সন্তান কোন দিন অসামাজিক অসবর্ণ বিবাহ করেন নাই। এই বংশের চিরাচরিত প্রথা বাঙ্গলার কুলশীল মর্য্যাদা সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ পরিবার হইতে কন্যা গ্রহণ বা কন্যাদান। রাসবিহারীও যতদিন ভারতে ছিলেন ততদিন এই কুলপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রযত্ন করিয়া আসিয়াছেন। আজ কি তিনি প্রবাসে যাইয়া সে কুলপ্রথা নারীর মোহে ভঙ্গ করিবেন? ভাগ্যের চক্রান্তে দেশভক্ত রাসবিহারী, স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কি জাতীয় কৃষ্টি, জাতীয় কুলপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া বসিবেন এক নারীর রূপ ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে? আজ তিনি নির্ব্বাসিত কিন্তু একদিন কি তিনি দেশ-মাতার ক্রোড়ে নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফিরিবেন না? সে দিন তিনি সমাজের চক্ষে কি ঘোর অপরাধী প্রতিপন্ন হইবেন না? তিনি নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন নাই যে তাঁহার স্নেহময় পিতা ও পিতামহ তাঁহার অসামাজিক অসবর্ণ বিবাহে মর্মান্তিক আঘাত পাইবেন।

তিনি জানিতেন তাঁহার পিতা, পুত্রের প্রতি যতই স্নেহশীল হউন, যে পুত্র সমাজনীতি বিগর্হিত কার্য্য করিয়া সমাজকে দংশন করিয়াছে তাহাকে প্রশ্রয় দিবেন না, পুত্রকে পুত্রবধুকে কখনও স্বীকার করিয়া লইবেন না, বরং কীর্ত্তিমান পুত্রের অকীর্ত্তিকর কার্য্যে সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালায় অবিরত জর্জ্জরিত হইবেন। রাসবিহারীর সমস্যাও অতি কঠিন সমস্যা।

শ্রী টোয়ামার সমস্যা, শ্রী সোমার সমস্যা, শ্রীমতী সোমার সমস্যা, চারিদিকে দুরূহ সমস্যা। কিন্তু শ্রীমতী সোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তোষিকোর কি কোন সমস্যা ছিল না? রাসবিহারীর জীবন সূক্ষ্ম সূতায় দোদুলামান জানিয়াও কি কেহ সেই জীবনের সঙ্গে নিজ ভবিষ্যৎ গ্রথিত করিতে স্বীকৃত হয়? এই সুন্দরী শিক্ষিতা ধনীর কন্যাকে বধূরূপে বরণ করিবার জন্য বহু জাপানী শিক্ষিত ধনী যুবক আগ্রহান্বিত একথা জানিয়াও কি এক বিদেশী নির্ব্বাসিত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে বরণ করা তোষিকোর পক্ষে সম্ভবপর? কোথায় ধনী জাপানী কন্যার বিবাহ সবর্ণ ধনী শিক্ষিত জাপানী যুবকের সঙ্গে আর কোথায় এই ভবিষ্যৎ-হীন গাঢ়-অন্ধকারাচ্ছন্ন অসবর্ণ সমাজ-বিগর্হিত বিবাহ!

'বিচিত্র জগৎ' নামক পত্রিকায় শ্রীমতী সোমা লিখিত বিবরণী আমাদের সকল প্রশ্নের সমাধান কয়িয়া দিবে। সুতরাং নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাসবিহারী আমাদের বাটী পরিত্যাগ করিবার পর দেখা গেল বৃটিশ রাজদূতের গুপ্তচরের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। একমাত্র উপায় একজন সতর্ক পার্শ্বরক্ষী দিবারাত্র তাহার সহিত থাকিবে। প্রথমে ছদ্মবেশে আমার স্বামী তাহার সহিত থাকিতেন। কিন্তু বেশী দিন এরূপভাবে ছদ্ম-বেশে আমার স্বামী থাকিতেও পারিবেন না আর তাহা সম্ভবও নহে। রাসবিহারীও একাকী ঘরে বন্ধ থাকিতেও অস্বীকৃত। রাসবিহারীর নিকট টোকিও এখনও অপরিচিত।

বেশী ঘোরা ফেরা করিলে শীঘ্রই যে সে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। বৃটিশ দূতাবাসের গুপ্তচরের ও গুপ্ত ঘাতকের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা বদ্ধ-পরিকর বটে, কিন্তু কি উপায়ে যে তাহাকে রক্ষা করা যায় আমরা এখনও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা প্রায় দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছি।

একদিন শ্রী টোয়ামা আমার স্বামীর নিকট আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত রাসবিহারীর বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন!

আমরা এ প্রস্তাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। এরূপ প্রস্তাব আমরা একেবারেই আশা করি নাই।

কতদিন কাটিয়া গেল, মানসিক দ্বন্দ্বে। রাসবিহারীকে আমরা যে পুত্রাধিক স্নেহ করি তাহাতে সন্দেহ নাই। রাসবিহারী আমাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করে, আমার স্বামীকেও "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করে। রাসবিহারীর প্রতি আমাদের যে স্নেহ তাহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। আমরা যে শুধু রাসবিহারীকে ভাল বাসিতাম তাহা নহে আমরা তাহাকে শ্রদ্ধাও করিতাম। কিন্তু তোষিকোর সহিত রাসবিহারীর পরিণয় আমাদের মনে কোনদিনই উদিত হয় নাই। স্বপ্নের মত অদ্ভুত কিছুই নয়। সেই স্বপ্নেও একথা কখনও মনে আসে নাই।

কিন্তু শ্রী টোয়ামার এ প্রস্তাব কেমন করিয়া তোষিকোকে শুনাইব? তোষিকোকে এই অসম্ভব প্রস্তাব বলা যে বড় কঠিন।

তাহা ছাড়া অপরিণত বয়স্কা বিদ্যালয়ের ছাত্রীর পক্ষে এ যে অতি বিপজ্জনক বিষয়।

প্রস্তাব অতি অসম্ভব হইলেও আমরা বুঝিয়াছিলাম রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ উন্মুক্ত নাই। ইংরাজ দূতাবাসের বেতনভোগী দুরন্ত গুপ্তচর অবিরাম রাসবিহারীর পিছনে ঘুরিতেছে, তাহাকে ধরিবার জন্য বা গুপ্তহত্যা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, রাসবিহারীর জীবন-সূত্র যে কোন মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইতে পারে।

আমরা নিয়ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম যে চল্লিশ কোটী হৃতসর্ব্বস্ব ভারতীয়ের মঙ্গলের জন্য তোষিকো যেন এই বিপদ ভগবানের আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া, মাথায় তুলিয়া লইতে পারে।

অবশেষে একদিন তোষিকোকে শ্রী টোয়ামার প্রস্তাব জানাইলাম। বলিলাম—"তোষিকো! তুমি কি রাসবিহারীকে রক্ষা করিতে পার না? জানি, তোমার বয়সের তুলনায় এ অতি দুরূহ বিপজ্জনক কাজ। কিন্তু মা, আর তো কেউ নেই যে এ কঠিন ব্রত গ্রহণ কর্ত্তে পারে।"

আমি তোষিকোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; আমার বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণপরে তোষিকোর উত্তর আসিল—"আমায় একটু ভাব্‌বার সময় দাও মা! আমি ভেবে দেখি।"

সেই দিন হইতে তোষিকো বিমর্ষ হইয়া পড়িল। দিন আসে, দিন যায়। তোষিকোর ভাবনার আর অন্ত নাই। চিন্তা আর চিন্তা!

বেশী ঘোরা ফেরা করিলে শীঘ্রই যে সে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। বৃটিশ দূতাবাসের গুপ্তচরের ও গুপ্ত ঘাতকের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা বদ্ধ-পরিকর বটে, কিন্তু কি উপায়ে যে তাহাকে রক্ষা করা যায় আমরা এখনও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা প্রায় দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছি।

একদিন শ্রী টোয়ামা আমার স্বামীর নিকট আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত রাসবিহারীর বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন!

আমরা এ প্রস্তাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। এরূপ প্রস্তাব আমরা একেবারেই আশা করি নাই।

কতদিন কাটিয়া গেল, মানসিক দ্বন্দ্বে। রাসবিহারীকে আমরা যে পুত্রাধিক স্নেহ করি তাহাতে সন্দেহ নাই। রাসবিহারী আমাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করে, আমার স্বামীকেও "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করে। রাসবিহারীর প্রতি আমাদের যে স্নেহ তাহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। আমরা যে শুধু রাসবিহারীকে ভাল বাসিতাম তাহা নহে আমরা তাহাকে শ্রদ্ধাও করিতাম। কিন্তু তোষিকোর সহিত রাসবিহারীর পরিণয় আমাদের মনে কোনদিনই উদিত হয় নাই। স্বপ্নের মত অদ্ভুত কিছুই নয়। সেই স্বপ্নেও একথা কখনও মনে আসে নাই।

কিন্তু শ্রী টোয়ামার এ প্রস্তাব কেমন করিয়া তোষিকোকে শুনাইব? তোষিকোকে এই অসম্ভব প্রস্তাব বলা যে বড় কঠিন।

তাহা ছাড়া অপরিণত বয়স্কা বিদ্যালয়ের ছাত্রীর পক্ষে এ যে অতি বিপজ্জনক বিষয়।

প্রস্তাব অতি অসম্ভব হইলেও আমরা বুঝিয়াছিলাম রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ উন্মুক্ত নাই। ইংরাজ দূতাবাসের বেতনভোগী দুরন্ত গুপ্তচর অবিরাম রাসবিহারীর পিছনে ঘুরিতেছে, তাহাকে ধরিবার জন্য বা গুপ্তহত্যা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, রাসবিহারীর জীবন-সূত্র যে কোন মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইতে পারে।

আমরা নিয়ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম যে চল্লিশ কোটী হৃতসর্ব্বস্ব ভারতীয়ের মঙ্গলের জন্য তোষিকো যেন এই বিপদ ভগবানের আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া, মাথায় তুলিয়া লইতে পারে।

অবশেষে একদিন তোষিকোকে শ্রী টোয়ামার প্রস্তাব জানাইলাম। বলিলাম—"তোষিকো! তুমি কি রাসবিহারীকে রক্ষা করিতে পার না? জানি, তোমার বয়সের তুলনায় এ অতি দুরূহ বিপজ্জনক কাজ। কিন্তু মা, আর তো কেউ নেই যে এ কঠিন ব্রত গ্রহণ কর্ত্তে পারে।"

আমি তোষিকোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; আমার বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণপরে তোষিকোর উত্তর আসিল—"আমায় একটু ভাব্‌বার সময় দাও মা! আমি ভেবে দেখি।"

সেই দিন হইতে তোষিকো বিমর্ষ হইয়া পড়িল। দিন আসে, দিন যায়। তোষিকোর ভাবনার আর অন্ত নাই। চিন্তা আর চিন্তা!

ক্রমে প্রায় একমাস গত হইল। শ্রী টোয়ামাকে একটা উত্তর দিবার সময় আসিয়া পড়িল। আর অপেক্ষা করা যায় না। আমার ঘরে তোষিকোকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহাকে তার মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। উদ্বেগ আগ্রহের সহিত কেবলই মনে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল তোষিকো কি স্বেচ্ছায় রাসবিহারীকে বরণ করিবে? উদ্বেল হৃদয়ের অধীরতা চাপিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তোষিকোর দৃঢ়কণ্ঠ ধ্বনিত হইল—"মা! রাসবিহারীকেই আমায় দান কর। আমি তাঁর জীবন্ত বর্ম্ম হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ কয়িয়াছি।"

তোষিকোর মহত্ব ও তাহার সঙ্কল্প আমায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমারই মেয়ে বটে তোষিকো! কিন্তু তাহার উত্তরে আমি সুখী হইলাম, কি দুঃখিত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার দু' নয়নে জল উছলিয়া উঠিল, আমি ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম—"তোষিকো! বুঝিলাম তুমি রাসবিহারীকে বরণ করিতে চাও। কিন্তু জান কি, এ বিবাহে নাই কোন আনন্দ, নাই কোন ভবিষ্যৎ? সবদিক ভেবে দেখেছ কি? সত্যই কি রাসবিহারীর আত্মার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পার্ব্বে? পার্ব্বে কি সকল বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সকল সুখ তুচ্ছ করে রাসবিহারীর জীবন রক্ষা কর্ত্তে?"

পরিস্থিতি বুঝাইবার জন্য একই কথা বারংবার নানাভাবে

বলিতে লাগিলাম। কি বলিলাম মাথামুণ্ড নিজেই জানি না। এই টুকুই শুধু বুঝিলাম, তোষিকোর সঙ্কল্প দৃঢ়।

এইবার আমরা রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি তোষিকোকে বিবাহ করিতে সম্মত কিনা, ভারতে পূর্ব্বে তিনি কোন বিবাহ করিয়াছেন কিনা। আমরা শুনিয়াছিলাম ভারতে সকলেই অতি অল্প বয়সে বিবাহ করে।

রাসবিহারী বলিল—"না, আমি বিবাহিত নই। পনের বছর বয়সেই আমি ভারতোদ্ধার করিবার জন্য, ভারতের দুঃখ মোচনের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করি। দেশের মুক্তির কথাই আমি নিয়ত ভেবেছি, বিবাহের কথা ভাবি নাই, ভাবিবার সময়ও পাই নাই। সেই বয়সেই আমি মা-বাবার নিকট হইতে দূরে দূরেই থাকিতাম। কারণ, হয়তো আমার জন্য তাঁদের উপর নানা অত্যাচার হবে—তাঁরা অসহ্য কষ্ট ভোগ করবেন।......তার উপর বিবাহের কথা তো স্বপ্নের অতীত।.........কিন্তু যদি শ্রী টোয়ামা শ্রীমতী তোষিকোকে বিবাহ করিবার আদেশ করেন, সে আদেশ অমান্য করিবার শক্তি আমার কোথায় ?"......

যখন শ্রী টোয়ামা শুনিলেন যে রাসবিহারী ও তোষিকো বিবাহ সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছে তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বেশ ! বেশ ! তাদের উভয়কেই আমি রক্ষা করবার চেষ্টা করবো ?"

শ্রী টোয়ামাই রাসবিহারীর সহিত তোষিকোর গোপন বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তিনিই ছিলেন, এ বিবাহের বরকর্ত্তা ও কন্যা-

কর্ত্তা। গোপনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আমার পুত্র টিকাকোর বয়স তখন মাত্র উনিশ বৎসর। তাহাকে দিয়াই বিবাহের যাবতীয় আয়োজন করাইলাম। আমি নিজে তখনও একেবারে শয্যাশায়ী। বিবাহের সকল দ্রব্যাদি গোপনে বিবাহের স্থানে পাঠাইলাম। শুভ-বিবাহের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবার অনতিপূর্ব্বে তোষিকো আমার স্বামীর সহিত বাহির হইয়া গেল।

ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস! ধনী সোমা পরিবারের আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ নির্জ্জনে ও গোপনে হইল!

আমি তোষিকোর সহিত যাইতে পারি নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে দ্বিতলের গবাক্ষ পথে যেমন দুই সজল আঁখি রাসবিহারীকে বিদায় দিয়াছিল, আজ সেই নয়নদ্বয়ই তেমনই আঁখিজলে ভাসিয়া উপরের গবাক্ষ-পথে প্রিয়তমা কন্যা তোষিকোকে বিদায় দিল!

তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘ আট বৎসর কাটিল। এই আট বৎসরের নিষ্ঠুর নির্জ্জন গোপন-বাসের পর রাসবিহারী জাপানী প্রজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই আট বৎসরের মধ্যে একদিনও রাসবিহারীর জীবন নিরাপদ ছিল না। বৃটিশ গোয়েন্দার গুপ্ত তৎপরতার জন্য রাসবিহারীকে সতের বার বাটী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই দীর্ঘ নির্য্যাতনের পরে রাসবিহারী ও তোষিকো নিজেদের একখানি ছোট বাড়ীতে নিরাপদে বাস করিতে পায়। কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তোষিকোর স্নায়ু-মণ্ডলের উপর যে চাপ পড়ে তাহাতে তোষিকোর দেহ ভাঙ্গিয়া

পড়িল। ২৮ বৎসর বয়সে একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া, বিবাহিত জীবনের সুখভোগের পূর্ব্বেই তোষিকো ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। কি দুঃখময় ও সংক্ষিপ্ত তার জীবন!

রাসবিহারীর পুত্রকন্যার ভার আমরা লইলাম। তাহা না লইলে রাসবিহারী কিরূপে তাহার সমগ্র শক্তি দেশের মুক্তির জন্য নিয়োগ করিবে?

তার পরও দীর্ঘ দশ বৎসর গত হইল। একদিন রাসবিহারীকে অনুরোধ করিলাম—

"রাসবিহারী! তুমি আবার নূতন করিয়া সংসারে প্রবেশ কর। মাসাহিদে ও তেতুকোর ভার আমরা অনায়াসে বহিতে পারিব। আর তাহারা তো এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে।

একাধিক জাপানী যুবতী রাসবিহারীর উদারতা ও মহত্ত্বে আকর্ষিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ও তাঁহার ব্রতসিদ্ধির সহায়তা করিতে তখনও প্রস্তুত।

রাসবিহারী বিবাহ প্রস্তাবে হাসিয়া উঠিল। রাসবিহারী প্রতিবাদ করিল "মা! তোষিকোর ভালবাসা আর ফিরে আসিবে না—এমন কথা ভাবিতেও আমার কষ্ট হয়। আমার মা আছে, বাপ রয়েছে আমার আবার কিসের অভাব। আমি সুখী। সেই আট বৎসর গোপন নির্জ্জন জীবনের মত আজও তোষিকো সব সময় আমার কাছে কাছেই আছে। তা' ছাড়া আমার জীবন তো আমার নয়, আমার দেশের। আট বৎসর ছায়ার মত তোষিকো আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। এই আট বৎসরই যথেষ্ট মা!"

তোষিকোর স্মৃতি এই দীর্ঘ দিনেও আমার মন হইতে একদিনও অপসৃত হয় নাই। স্বর্গগতা কন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া মনে মনে বলিলাম—"তোষিকো! শুনলি তো! তোর মত ভাগ্যবতী জগতে ক'জন? সত্যই রাসবিহারী মহাপ্রাণ! সত্যই রাসবিহারী তোর চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তাই নয় কি? সত্যই তুই বড় সুখী? নয় কি মা?"

শ্রীমতী সোমার উপরোক্ত বিবরণী আমাদের সকল প্রশ্নের সকল সন্দেহের সমাধান করিল। পুনরায় প্রশ্নগুলি ও তাহার সমাধান আমরা নিম্নে শ্রেণীবদ্ধভাবে দিলাম। কথঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি হইলেও রাসবিহারীর চরিত্র বিশ্লেষণে ইহার আবশ্যকতা আছে।

প্রথম প্রশ্ন :—স্নেহশীলা বিমাতার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র, তবে কেন তিনি তাঁহার বিবাহের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই?

উত্তর—রাসবিহারী সম্যকভাবে জানিতেন যে তিনি যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাকে আত্মবলি প্রদানে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিবাহ করিলে সে আত্মবলির পরিণাম হইবে এক যুবতীর জীবনে অনভিপ্রেত চিরান্ধকার, অনিচ্ছাকৃত জীবন-মৃত্যু। কে না জানে বাঙ্গালীর ঘরের যুবতী বিধবার সংসার বাস, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন!

তাঁহার গোপন দেশ সেবা ও দেশ মুক্তির প্রচেষ্টা বৃটিশ

সরকারের গোচরীভূত হইলে যূপকাষ্ঠে তাঁহার বলি হইবে। সেই শোকে ও সরকারের নির্য্যাতনে তাঁহার পিতার কাতরতার সীমা থাকিবে না। তারপর বিবাহ করিয়া তাঁহার উপর গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত ও অকর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :—স্বামীর ব্রতে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য, ব্রতী হইবার মত, স্বামীর আদর্শের জন্য আত্মবলি দিবার মত উপযুক্ত কন্যা পাওয়া সম্ভবপর ছিল কি ?

উত্তর—সত্যই অসম্ভব! সেদিনেও যাহা অসম্ভব ছিল, আজও তাহা সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গলার বহু গৃহে তখনও সুগৃহিনী বর্ত্তমান থাকিলেও ইংরাজী শিক্ষার সংঘাতে ক্রমশঃই তাহা হ্রাস হইয়া পড়িতেছিল। রাসবিহারীর জন্মের বহুপূর্ব্বে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দমঠের প্রথম বিজ্ঞাপনে মন্তব্য করিয়াছেন "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক অবস্থায় নয়।" নিপুণা সুগৃহিনী লাভ হয়ত রাসবিহারীর ভাগ্যে ঘটিতে পারিত, কিন্তু বঙ্গনারীর মধ্যে স্বামীর স্বদেশ-মুক্তি ধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করিয়া সেই ধর্ম্মে ব্রতী হওয়া ও স্বামীকে তাঁহার সেই ব্রতপালনে সাহায্য করা সে যুগে অসম্ভব ছিল। সে যুগে স্বামী বহির্ব্বাটীতে ও স্ত্রী অন্দরমহলে। বহির্জগৎ স্বামীর কর্ম্মক্ষেত্র ও অন্দরমহল স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব-ভূমি। দুইজনের দুই ভিন্ন জগৎ, কোথাও তাঁহারা গঙ্গা যমুনার মত মিলিয়া বিপ্লবরাজ্যে প্রয়াগ রচনা করেন নাই। কাজেই

তখন রাসবিহারী বিবাহের কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, স্ত্রী অবিরত পশ্চাৎদিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার ব্রত পালনের কাঠিন্য কঠিনতর করিয়া তুলিবেন।

বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসমাজে এইরূপ নারীর অভাব অনুভব করিয়াই "শান্তি" ও "প্রফুল্ল" চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বঙ্গ-নারীর মধ্যে এ আদর্শ কবে দেখিব? বঙ্কিমের এ স্বপ্ন কবে সফল হইবে? সে দিন কতদূরে?

তৃতীয় প্রশ্ন—রাসবিহারী কি এই অসামাজিক বিবাহ করিয়া সমাজের ভিত্তি শিথিল করেন নাই? দেশ কি কেবল একখণ্ড ভূমি? দেশের সমাজ, সংস্কৃতি কি দেশের এক বিরাট অংশ নয়? কেন বলিব না, এ বিবাহ দ্বারা রাসবিহারী শুধু নিজের ক্ষুদ্র প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন?

উত্তর—না, তিনি প্রাণের মমতা কোন দিন করেন নাই। মাতৃভূমির সেবার জন্য তিনি জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বার বার মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বঙ্কিমের আনন্দমঠের নির্দ্দেশ তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি ভুলেন নাই, দেশ-সেবায় প্রাণদানই মানুষের শ্রেষ্ঠদান বা চরমোৎকর্ষ প্রয়াস নহে। সাধারণতঃ মনে হয়, জীবন অপেক্ষা মূল্যবান মানুষের আর কি হইতে পারে? কিন্তু ভাবের আবেগে, মুহূর্ত্তের উন্মাদনায় অনেকেই তো জীবন দান করে। সাধারণের নিকট জীবনের অর্থ ভোগভূমি, কিন্তু সাধকের নিকট তাহার অর্থ পুণ্যময় মহা অর্ঘ্য। তাই সেখানে জীবনের মূল্য অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ব্রত পালন সাধকের নিকট

জীবন হইতেও মহৎ। রাসবিহারী দেখিলেন সেই মহাপুণ্যপ্রদ ব্রত পালনের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সে অন্তরায় দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায় উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী লাভ। তোষিকো যোগ্য পাত্রী। তোষিকো শুধু শিক্ষিতা ও কর্ম্মনিপুণা নহে, তোষিকো স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীকে ব্রতপালনে সহায়তা করিতে কৃতসঙ্কল্প; আবশ্যক হইলে স্বামীর জন্য আত্মাহুতি দিতেও পশ্চাৎপদ নহে। তোষিকো স্বামীর কেবল জীবন-সঙ্গিনী হইতে প্রস্তুত নয়—স্বামীর জীবন্ত বর্ম্ম হইতে কৃতসঙ্কল্প। প্রথম জীবনে রাসবিহারীর এই তোষিকোকে আবশ্যক ছিল না, কিন্তু আজ তাঁহাকে একান্ত প্রয়োজন। এই তোষিকো ব্যতিরেকে শুধু জীবনই বিপন্ন নয়, তাঁহার কর্ম্মোদ্যম ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। তাই রাসবিহারী তোষিকোর আত্মাহুতি স্বীকার করিয়াছিলেন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাই রাসবিহারী তত্তুলনায় অপেক্ষাকৃত সামান্য সমাজ-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এ বিবাহের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিলাসিতা বা মসীমলিন স্বার্থপরতার উপকরণ ছিল না। এ বিবাহে তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন স্বদেশ-সেবার মহান ব্রত পালনার্থে। এখানে কামান্ধের মসীমলিন চিত্র ছিল না, স্বার্থপরতার কলুষ নেশার ঘৃণ্য চিত্র ছিল না—ছিল একমাত্র স্বদেশসেবার পূর্ণযোগ, দেশোদ্ধারের চরমোৎকর্ষ আত্মোৎসর্গ।

রাসবিহারী বহু বিপদের, বহু ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা, তাঁহার সুক্ষ্ম-বিচার-বুদ্ধি, তাঁহাকে গন্তব্য

পথের দিকে চালিত করিয়াছে। কিন্তু তোষিকোর এই অতুলনীয় আত্মাহুতি তাঁহার স্বপ্নাতীত। গত পঞ্চাশ বৎসরের বাঙ্গলার ইতিহাস উল্টাইয়া আমি এমন উদাহরণ বাঙ্গালী নারীর মধ্যে একটীও ঠিক মত পাই নাই। চট্টগ্রামের বনপ্রাঙ্গণের সুহাসিনী ও প্রীতিলতার কথা স্মরণে আসে বটে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও ঠিক আমি এই রূপটী খুঁজিয়া পাই নাই।

তোষিকোর বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া ডাক্তার অশোয়া বলিয়াছেন—"তোষিকো রাসবিহারীকে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দিলেন। জাপানের কোন নারীই তা সে যতই দরিদ্র হউক, যতই কুৎসিতা ও কুরূপা হউক কোন বিদেশীয় বা বিজাতীয়কে বিবাহ করিবার কল্পনাও মনে স্থান দেয় না। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, জাপানে যে নারী যত শিক্ষিত, তাহার পক্ষে বিদেশীকে বিবাহ করা তত অসম্ভব। জাপানের প্রত্যেক নরনারীই জাতীয় স্বাধীনতা ও একতার পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা নিজেদের জাতীয়তায় এত গর্ব্বিত যে বিদেশীকে বিবাহ করা তাহাদের কল্পনাতীত। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক পুরুষাপেক্ষা অধিক রক্ষণশীলা। উচ্চ শিক্ষিত হইলে জাপানীরা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হইয়া উঠে। জাপানী জাতি রক্তের পবিত্রতা রক্ষণে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ও গর্ব্বিত। এ কথার এমন অর্থ নহে যে, তাহারা অপর জাতিকে বা বিদেশীকে ঘৃণা করে। বরং তাহার বিপরীত। জাপানের সকল অধিবাসী বিদেশীকে ভালবাসে, তাহাদের সভ্যতা ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করে। কোরিয়া ও চীনের অসংখ্য

নরনারী সহস্র বর্ষ ধরিয়া জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জাপানীরা এই শরণাগতদের সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। নিরক্ষর গ্রামবাসী পর্য্যন্ত এই শরণাগতদের আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করে নাই। জাপান বিদেশীকে সকল প্রকার সুবিধা ও আতিথ্য প্রদানে মুক্তহস্ত। বিদেশী ও ভিক্ষুককে তাহারা ভগবান-প্রেরিত সম্পদজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া জাপানী নারীকে বিদেশীয়ের অঙ্কশোভিনী দেখিতে তাহারা স্বীকৃত নহে। ইহা তাহাদের জাতীয় সংস্কার ও কৃষ্টি। ইহার সহিত ঘৃণার কোন সম্বন্ধ নাই। পাশ্চাত্য দেশীয় অনেকেই আমার এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমার ভারতীয় বন্ধুরা এ কথা যে নিশ্চয় বুঝিবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ভারতমাতাকে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তোষিকো তাঁহার অনুপম জীবন, আত্মা, মন এবং পদ্মের মত সুপবিত্র দেহ এই নির্ব্বাসিত সহায়-সম্পদহীন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয়ের জন্য বলি দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যে মহৎ প্রীতি ও ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এক সত্যান্বেষী চীন যুবক তের শত বৎসর পূর্ব্বে সতের বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া পিকিং হইতে অবশেষে পাটালীপুত্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তোষিকোর এই প্রীতি ও অনুপ্রেরণা তাহারই সমতুল্য। তোষিকো সামুরাই কন্যা। প্রকৃত সামুরাই তাহারাই, যাহারা বিনা অস্ত্রে অত্যাচার, অনাচার, হত্যা ও ধ্বংস বন্ধ করিতে সমর্থ। সামুরাই সন্তান অস্ত্র ধারণ করেন আত্মরক্ষার জন্য নহে, আততায়ীকে

আক্রমণের জন্যও নহে, কেবল শরণার্থীকে রক্ষা করিবার জন্য। বড়ই গৌরবের বিষয় অস্ত্র তাহাদের কদাচিৎ কোষমুক্ত হয়। সামুরাই সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র—শান্তি ও ন্যায়ের জন্য জীবন, দেহ ও আত্মবলি—সর্ব্ববলি। তোযিকো সামুরাই আদর্শের প্রতীক মাত্র।

"অনেকের মতে জাপানের জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা এই সামুরাই আদর্শের সম্পূর্ণ তিরোভাবে ঘটিয়াছে। হইতে পারে তাহা সত্য, কিন্তু সেই প্রকার সত্য এই তোষিকো যে নির্ব্বাসিত, নির্ব্বান্ধব, দেশপ্রাণ এক ভারতীয়কে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য আত্মাহুতি দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহা কি ভারতীয় পৌরাণিকতার এক নূতন অধ্যায় নহে?"

ডাক্তার অশোয়ার মন্তব্য অতি কঠোর। কিন্তু সেই কঠোরতা ভেদ করিয়া যদি আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করি অথবা তাহার মন্তব্যকে মনবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে আদৌ কঠিন হইবে না।

রাসবিহারীর সংবাদ ও তাঁহার পিতৃবিয়োগ

১৯১৯ সালের শেষভাগে কি ১৯২০ সালের প্রথমে রাসবিহারী জাপান হইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজন বিহারীকে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লেখেন। এই পত্র বহুব্যক্তির হস্ত ফিরিয়া বিজনবিহারীর হস্তগত হয়। তিনি তখন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিলেন। পত্রখানি নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল—

চিঠি লিখিবার প্রথম সুযোগ পাইয়াই আমি তোমায় লিখিতেছি। তোমরা জানিতে না আমি কোথায়। কিন্তু তোমাদের সংবাদ আমি বহু কষ্টে সংগ্রহ করিতাম। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই প্রকাশ্যে তোমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিব। সে সময়ের আর বেশী দেরী নয়। তোমাদের অনেকদিন দেখি নাই। তোমাদের একখানি ফটো পাঠাইও। বাবারও একখানি ফটো পাঠাইও। সাক্ষাতে তাঁহাকে আমার কথা জানাইও। এই ঠিকানায় চিঠি দিও।

ভ্রাতার হস্তলিপি পাইয়া বিজনবিহারী উল্লসিত হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করিলেন। পিতা তখনও শিমলায় চাকুরী করিতেছেন। পত্র দ্বারা পিতাকে সকল কথা জানান নানাকারণে সম্ভবপর নহে। অন্যান্য (ফটো) আলোকচিত্রের জন্য বড় বিশেষ কষ্ট ছিল না। শীঘ্রই পূজার ছুটী, সেই ছুটীতে আর সকলের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু কেমন করিয়া পিতার আলোকচিত্র সংগ্রহ করিবেন ? তিনি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে লিখিলেন—"কয়েকদিন হইতে আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। পড়াশুনা কিছুই করিতে পারিতেছি না। আপনার একখানি ফটো পাঠাইবেন। ফটোখানি আমার টেবিলের সম্মুখে রাখিব। কি জানি তাহা হইলে হয়তো মনের চঞ্চলতা কাটিয়া যাইবে।" বিজনবিহারীর ইচ্ছা ছিল তুইখানি ফটো চাহেন, কিন্তু তিনি সাহস করিতে পারিলেন না। বিনোদবিহারী পুত্রকে একখানি

আলোকচিত্র—পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু মন্তব্য করিলেন "আমার ফটোর সহিত তোমার মনের চাঞ্চল্যের সম্বন্ধ অনুধাবন করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, পূজার ছুটীতে ওখানে বসিয়া না থাকিয়া বাড়ী যাইও। হয়ত তাহাতে মনের চাঞ্চল্য কাটিয়া যাইবে।" বিনোদবিহারী যে বিচক্ষণ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাসবিহারীকে ফটো পাঠান হইল। পিতার ফটো রাসবিহারী তাঁহার জাপানী ভাষায় লিখিত "ভারতের দাবী" (India's Cry) নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

অল্পদিন পরেই পিতা কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে তিনি বিজনবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিজনবিহারী রাসবিহারীর সংবাদ তাঁহাকে দিলেন। বিনোদবিহারীর চক্ষু আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া রাসবিহারীর সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী এক জাপানী তরুণীকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মুখ বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। তিনি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। পিতার বেদনা-কাতর গম্ভীর মুখ দেখিয়া বিজনবিহারীও নীরব রহিলেন। বহুক্ষণ পরে বলিলেন—"জানি না রাসবিহারী কেন এমন করিল, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে।" বিজনবিহারী সাহস পাইয়া বলিলেন, "দাদা বাঁচিয়া আছেন, এইটাই তো আমাদের কাছে বড় কথা, বাবা।" বিনোদবিহারী গম্ভীরভাবে কেবল

বলিলেন—"হুঁ"। ইহার পর রাসবিহারীর বিবাহ সম্বন্ধে কোনদিন কোন কথা বলেন নাই। পরে রাসবিহারীকে তিনি যে পত্র লিখিতেন তাহাতে পুত্রবধূ বা পৌত্র সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখি নাই। বিনোদবিহারী কদাচিৎ সপরিবারের কুশল প্রার্থনা করিতেন।

বিনোদ বিহারীর আয় অর্দ্ধেক হইতেও কম হইয়া গিয়াছে। এক পুত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছে, অপরটী এখন স্কুলে। বিজন বিহারী ক্রমশঃ দুরন্ত হইয়া উঠিতেছিল, সভা সমিতি ধর্ম্মঘট লইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতেছিল। তাহাকে সংযত করিবার আশায় বিনোদবিহারী তাহার বিবাহ দিয়াছেন, সুতরাং পুত্রবধূটীও সংসারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার উপর কনিষ্ঠা কন্যাটী ক্রমশঃই মাথা ঠেলিয়া উঠিতেছে। অবসর বৃত্তির সামান্য অর্থে সমস্ত সঙ্কুলান হয় না। তিনি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। অর্থকষ্ট নিত্যই বাড়িয়া চলিল। পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থ ক্রমশই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাহাকে তিনি তাঁহার অর্থকষ্টের কথা জানাইবেন—আর জানাইলেই বা কি ফলোদয় হইবে? চিন্তাকুল চিত্তে তিনি চাকুরীর জন্য ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। অবশেষে কিছু অর্থ জমা দিয়া এক বাঙ্গালী কোম্পানীতে কেশিয়ারীর চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন। দুই তিন মাসের মধ্যে এই বাঙ্গালী কোম্পানী তাঁহার গচ্ছিত অর্থ পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। বিনোদ বিহারী দারুণ আঘাত পাইলেন। এ আঘাত কেবল অর্থ-নষ্টজনিত নহে, আঘাত বাঙ্গালী সন্তানের দুর্নীতি-

পরায়ণতাজনিত। এই আঘাত তাঁহাকে এতই কাতর করিয়াছিল যে, তিনি প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন—"দেখ বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক আছে, বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, কিন্তু বাঙ্গালী স্বজাতি-শ্রীকাতর, সামান্য অর্থের জন্য তাহারা ধর্ম্ম, সম্মান ও আত্ম-মর্য্যাদা বিক্রয় করে। আমি আজীবন বাঙ্গালীকে বলিয়াছি—আত্মনিষ্ঠ হও, লোভ পরিত্যাগ কর, উপবাসী থাক, তথাপি ধর্ম্ম বিক্রয় করিও না—কিন্তু ক্ষুদ্র আপাত স্বার্থের মোহে বাঙ্গালী অন্ধ, বাঙ্গালী বধির। আমি আত্মীয় স্বজন সকলের মঙ্গল করিয়া আসিয়াছি। আত্মীয় অনাত্মীয় বহু বাঙ্গালী যুবককে নিজ আশ্রয়ে মাসের পর মাস রাখিয়া তাহাদের ভরণ পোষণের সংস্থান করিয়া দিয়াছি, কিন্তু প্রতিদানে পাইয়াছি নির্ম্মম নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞতা। রাসি এদেরই জন্য প্রাণপাত করিয়াছে। আজও করিয়া চলিয়াছে। এজাতির মেরুদণ্ডে দুষ্টকীট বাসা বাঁধিয়াছে, ইহাদের কোন আশা নেই। ইহারা পশ্চাতে পড়িবেই পড়িবে। আমরা মূর্খ, কিন্তু আমাদেরও কিছু সদগুণ আছে। আর আশু মুখুজ্জে এদের লেখা পড়া শিখিয়ে কেবল কতকগুলি ধূর্ত্ত তৈয়ারী করিতেছেন। উপাধি, শুধু ধূর্ত্তামীর উপাধি!" বলাবাহুল্য বিনোদবিহারীকে যাঁহারা ফাঁকি দিয়াছিলেন তাঁহারা উভয়েই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ভূষিত।

বিনোদবিহারীর অর্থকষ্ট শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি অতি বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। গোপনে লোকজন আনিয়া বাটী দেখাইতেছেন, বাটী বিক্রয় করিবেন। এমন সময়

রাসবিহারী একশত ইয়েনের এক চেক পাঠাইলেন। বিনোদবিহারী যেন ক্ষীণ আলোকের আভাস পাইলেন। তিনি ক্রমশঃ বিছানা লইতেছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বিজনবিহারী তখন তাঁহার নিকটে; তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "আর ভয় নেই রে, রাসি টাকা পাঠিয়েছে।" বিজনবিহারী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি দাদাকে লিখেছিলে বাবা?"

বিনোদবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আমি কি তাই লিখতে পারিরে? তুই কি আমায় জানিস না? আমার কষ্ট অনুমান করেই রাসি টাকা পাঠিয়েছে।"

পরদিন বিনোদবিহারী নিজে ছুটাছুটী করিয়া লবণাক্ত ইলিসের ডিম, বড়ী, পাঁপর, আমসত্ত্ব প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিলেন ও পার্শ্বেল করিয়া রাসবিহারীকে পাঠাইলেন। সেইদিনই গোপনে বিজনবিহারী, রাসবিহারীকে পিতার অর্থকষ্ট এবং মানসিক ও দৈহিক অবস্থার কথা সবিস্তারে জানাইলেন। ইহাও জানাইলেন যে যদি পিতার চিন্তাভার কিছুটা লাঘব করিতে হয় তাহা হইলে শীঘ্রই কিছু অর্থের আবশ্যক এবং অন্য কোন উপায় না থাকিলে তিনি পড়া ছাড়িয়া দিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন। এই পত্রের উত্তরে রাসবিহারী যে পত্র লিখিলেন তাহা বিজনবিহারী আজও ভুলিতে পারেন নাই। রাসবিহারী লিখিলেন "বাবা কখনও কাহারও নিকট অর্থভিক্ষা করেন নাই। তুমি ইহা কাহার নিকট শিখিলে? যাহারা অর্থ ভিক্ষা করে, তাহারা সমাজের আবর্জ্জনা, সম্পদ নহে।" কি কঠিন

নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা। বিজনবিহারী চক্ষের জল ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। সে দিন এ ভর্ৎসনা তাঁহার বুকে শক্তিশেলের মত বিঁধিলেও এ ভর্ৎসনা বিজনবিহারীকে পরবর্তীযুগে আত্মনির্ভরশীল যুবকে পরিণত করিয়াছিল।

এ পত্র বিজনবিহারী পিতাকে দেখান নাই। রাসবিহারীর নিকট হইতেও আর কোন অর্থ সাহায্য আসে নাই। বিনোদ-বিহারী আবার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি নানা অছিলায় নিজ প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মূত্রমেহ রোগ ছিল। ইহারই ফলে তাঁহার উরুস্তম্ভ হয়। মাসাবধিকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া অবশেষে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিজনবিহারীকে বলিয়াছিলেন—"তোমাকে মানুষ করিতে পারিলাম না। তাহার উপর তোমার গলায় ভার চাপাইয়া দিয়াছি। তাহার উপর আরও ভার চাপিবে। তোমার দাদার হাতে তোমাদের ভার তোমাদের মা দিয়া গিয়াছিলেন। সে ভার আমি যতদূর সম্ভব বহন করিয়াছি। রাসিকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিও। আর যদি কিছুই সুবিধা না হয় বাড়ীটীর ইট খুলিয়া বিক্রয় করিও। মানুষ হইও। মানুষের জীবন যাপন করিও।" বিজনবিহারীর আক্ষেপ, তিনি "মানুষ" হইতে পারেন নাই।

পিতার মৃত্যু সংবাদ বিজনবিহারী, রাসবিহারীকে জানাইলেন কিন্তু পারিবারিক আর্থিক সমস্যার সম্বন্ধে কিছুই জানাইলেন

না। বরং পিতার যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল তাহার অংশের জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত কোন বন্ধুর নামে আম-মোক্তারনামা (Power of Attorney) পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। রাস-বিহারী তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষকে এই পাওয়ার অব এটর্নি পাঠাইয়া দেন, এবং বিজনবিহারী রাস-বিহারীর অংশ শ্রীশচন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দেন। তিনি ভবিষ্যতে শ্রীশচন্দ্রকে কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই শ্রীশ এই টাকা কি করিয়াছিলেন। পিতৃ আদেশে পাঠ সমাপ্ত করিতে গিয়া বিজনবিহারী কখনও অর্দ্ধাশন করিয়াছেন, কখনও অনশন করিয়াছেন, কখনও সামান্য ভারবাহী মজুরের কাজ করিয়াছেন কিন্তু রাসবিহারীকে তিনি অর্থকষ্টের কথা আর কখন জানান নাই বা অন্য আত্মীয় স্বজনের দ্বারস্থ হন নাই।

রাসবিহারীর সহিত বিজনবিহারীর ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত পত্র ব্যবহার ছিল। রাসবিহারী একবার বিজনবিহারীকে পরিবারবর্গের আলোকচিত্র পাঠাইতে বলেন। বিজনবিহারী কতকগুলি ছবি পাঠান। তাহার মধ্যে বিজনবিহারীর পত্নী কর্ত্তৃক তুলিত বিজনবিহারীর ছবি ছিল। এই ছবি পাইয়া রাসবিহারী লিখিয়াছিলেন—"তোমায় ছবিটী ঠিক বাবার প্রতিচ্ছবি। বাবাকে নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল।" ভুল! রাসবিহারীর ভুল! পিতার দেবমূর্ত্তি তিনি একদিনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার মনের গহন কাননে যে পূণ্যমূর্ত্তি আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহাই সহসা মনের বহিরাকাশে উদ্ভাসিত

হইয়াছিল। নতুবা লক্ষ্য করিলে দেখিতেন, বিজনবিহারী পিতার নহে—নিজেরই প্রতিচ্ছবি।

বিজনবিহারীর পত্রে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে এক পত্র লেখেন—"বাবার মরিবার বয়স হয় নাই। সংসার কষ্ট ও অর্থকষ্টই বাবার মৃত্যু ঘটাইল। ষোল আনা বাঙ্গালীর যাহা ঘটে, বাবারও তাহাই ঘটিয়াছে। আমার কিছুই করিবার উপায় ছিল না।" এ পত্র শ্রীশচন্দ্র বিজন-বিহারীকে দেখাইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুকালে রাসবিহারী শ্রীমতী তোষিকোর সহিত গোপনে বাস করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যু রাসবিহারীকে কতটা অভিভূত করিয়াছিল, তোষিকোই বলিতে পারিতেন। সে সংবাদ আজ আর জানিবার কোন উপায় নাই। স্নেহ-প্রবণ ক্ষমাশীল পিতার শেষ আশীর্ব্বচন রাস-বিহারী স্বকর্ণে শুনিতে পান নাই বটে কিন্তু পিতার শেষ আশীর্ব্বাদ হইতে তিনি বঞ্চিত হন নাই।

জাপানে নাগরিকত্ব লাভ ও প্রিয়তমা তোষিকোর মৃত্যু!

১৯১৯ সালে রাসবিহারীর গুপ্তবাসে তোষিকো এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ১৯২১ সালে নিজ পরিবারবর্গের এক আলোকচিত্র ও তাহার সহিত ভ্রাতার জন্য তোষিকোর হস্ত-নির্ম্মিত একটী মনিব্যাগ ভ্রাতৃবধুর জন্য জাপানী সাড়ী ও ওড়না,

ভ্রাতাদের ও পিতার জন্য তিনটী সিল্কের গেঞ্জী পাঠান। বিজনবিহারী সযত্নে এই মনিব্যাগটী ব্যবহার করিতেন। ১৯৩০ সালে অর্থসমেত এই মনিব্যাগ টাটানগরে চুরি যায়। মনি-ব্যাগটীতে বিজনবিহারীর যথাসর্ব্বস্ব ছিল। বিজনবিহারী অর্থনাশের জন্য দুঃখিত হন নাই, কিন্তু মনিব্যাগটীর জন্য বহুদিন তিনি শোক করিয়াছেন। তোষিকোর স্বহস্ত রচিত কোন স্মৃতিচিহ্ন পাইবার তখন আর উপায় নাই। অকিঞ্চিৎকর বস্তু, কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডারে তাহা অমূল্য।

১৯২১ সালে পিতা রোগ শয্যায় পড়িয়া রাসবিহারীকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইলে বিজনবিহারী রাসবিহারীর প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহারের জন্য রাজ প্রতিনিধির নিকট এক আবেদন করেন। এ আবেদনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দেন উত্তরপাড়া নিবাসী বিপ্লবী শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজ-প্রতিনিধি এ আবেদন না-মঞ্জুর করেন। ১৯২২ সালে নির্ব্বাসিত-দের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে আন্দোলন হয়। কাহারও কাহারও প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করা হইল বটে, কিন্তু রাসবিহারী ও তাঁহারই মত শক্তিশালী ভারতীয় বিপ্লবী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি পাইলেন না। তখনও জাপানের ইংরাজ রাজদূতের গুপ্তচর রাসবিহারীকে ধৃত ও পৃথিবী হইতে অপসারিত করিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছিলেন। শ্রী টোয়ামা গোপনে রাসবিহারীর নাগরিকত্বের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টার

ফলে ১৯২৩ সালের ২রা জুলাই রাসবিহারী জাপানের নাগরিক অধিকার লাভ করেন। তখনও হত্যা ও হরণের চেষ্টা প্রশমিত হয় নাই। যাহা হউক এতদিনে রাসবিহারী বাঁচিবার অধিকার পাইলেন। এই অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন শ্রী টোয়ামা। তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে রাসবিহারী গুপ্ত আবাসে অধ্যবসায় সহকারে জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতি ও জাপানী রাজনীতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই গুপ্তবাসে বসিয়াই রাসবিহারী প্রথমে বুঝিতে পারেন যে, সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার সহিত ভারতের স্বাধীনতা একান্ত জড়িত, তাই গুপ্তাবাস হইতে নির্গত হইয়াই তিনি নানাভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন—ভারত পরাধীন থাকিলে যে সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতাই অসম্ভব তাহা নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাও অসম্ভব। এ সত্য রাসবিহারীর চক্ষেই প্রথম ধরা দেয়।

১৯২৪ সালে রাসবিহারী অপরিচ্ছিন্ন, তমসাচ্ছন্ন গুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিয়া একটী সুন্দর বাটীতে স্বাধীনভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। এতদিনে রাসবিহারী ও তোষিকো মুক্ত বাতাসে নির্ভয়ে আলাপ করিতে পাইলেন। কিন্তু এই সামান্য সুখও তোষিকো নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সুখের আর একটী অনতিক্রম্য বাধা ছিল। সেই বাধা জাপানের রক্ষণশীল দৃঢ় সমাজ এবং জাপানী জাতীয়তা। শত সৎগুণ থাকিলেও জাপানী সমাজ-বিদ্রোহীকে ক্ষমা করে না, সমাজের মধ্যে গ্রহণও করে না।

জাপানের এই রক্ষণশীলতার দিকে ভারতীয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে। যেমন ভগ্নপ্রাচীর ও সছিদ্র ছাদ বাসগৃহের অনুপযুক্ত, তেমনই আবর্জ্জনাপূর্ণ সমাজ জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে অকল্যাণকর। সমাজের মধ্যে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়া জাতির নৈতিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও ঐক্য কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ তোষিকো ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাসবিহারীর জীবনের প্রারম্ভে, শৈশবে ও কৈশোরে হাল ধরিয়াছিলেন তাঁহার বিমাতা, জীবন-মৃত্যুর বিষমক্ষণে হাল ধরিয়াছিলেন তোষিকো। সে ঘন বিপদ-জাল অপসৃত হইয়াছে। রাসবিহারীর জীবনে তোষিকোর যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু সম্পন্ন হইয়াছে। আর ইহ জগতে তোষিকোর প্রয়োজন নাই, তাই নিষ্কামভাবে তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। সন্ত্রস্ত অবিশ্রান্ত সতর্ক দৃষ্টি, একান্ত একাকীত্ব, অক্লান্ত নিরব পরিশ্রম তোষিকোর সংযত সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সত্যই তোষিকো রাসবিহারীর রক্ষা কবচ !

আট বৎসর অজ্ঞাতবাসের একমাত্র সঙ্গিনী সাবিত্রীতুল্যা স্বামী-অনুরাগিনী পূণ্যশীলা পত্নীর বিরহও রাসবিহারীকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। তোষিকোর মৃত্যুর পর একাক্রমে চৌদ্দ বৎসর জাপানে বসিয়াই তিনি ভারতীয়-স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাইতে থাকেন। অর্থহীন, সম্বলহীন, অস্ত্রহীন, জনবলহীন অবস্থায়

স্বদেশে অবস্থানপূর্ব্বক অভ্যন্তরস্থ স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি কোন সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টার ক্রুটী ছিল না। তাঁহার সহকর্ম্মীরা যখন ভারতে রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে ছিলেন রাসবিহারী শত ইচ্ছা সত্ত্বেও পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। তিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অনুকুল পারিপার্শ্বিকের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি প্রতিটী প্রতিকূল, অনুকূল ঘটনা লক্ষ্য করিয়া রহিল। ধন্য তাঁহার সঙ্কল্প ও ধৈর্য্য !

রথারূঢ় জগন্নাথ সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া স্বরচিত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিতেছেন, রথ ঘর ঘর শব্দ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। রথযাত্রীর মধ্যে কে রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া দলিত, মথিত হইল তাহা রথচক্র দেখে না, জানে না, দেব জগন্নাথও তাহা জানিতে চাহেন না। দলিত মথিত রথযাত্রীর নিদারুণ হাহাকার ও উন্মত্ত আকুল আহ্বান আগ্রাহ্য করিয়া রথারূঢ় দেবতা আপন সৃষ্টিতে আপনি বিভোর হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হন। যাঁহারা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আত্মদান করেন এবং ক্রমশঃ জাতির শিরোভাগে আসন গ্রহণ করেন, তাঁহারাও তেমনই নিষ্ঠুর ভাগ্য দেবতার মত কাহারও জন্য সঙ্কল্পচ্যুত হন না। তাঁহাদের সংঘাতে কে পড়িল, কে উঠিল, কে মরিল, কে বাঁচিল, সেদিকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিত চিত্তে লক্ষ্যের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। রাসবিহারীকে যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতেন, তাহারা ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সঙ্কল্প গ্রহণের পর পিতা, মাতা,

ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়স্বজন কাহারও কথা, এমন কি নিজের কথাও তিনি কোনদিন ভাবেন নাই, কাহারও বিরহ তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই, কাহারও আকুল আহ্বান তাঁহার বধিরতা ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু তোষিকো ? এইখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, এই তোষিকোর কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। তোষিকো শুধু আত্মবলী দেন নাই তিনি রাসবিহারীর সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাসবিহারী-তোষিকো, দুই দেহ এক আত্মা ছিলেন, মৃত্যুর পর এক আত্মা, এক দেহ হইলেন। তোষিকো মরেন নাই, তিনি রাসবিহারীর দেহে লীন হইয়া গেলেন মাত্র। এতদিন রাসবিহারী একা ভারতের সংগ্রাম চালাইতেছিলেন, তোষিকোর দেহান্তে রাসবিহারী-তোষিকো এক যোগে সে সংগ্রাম চালিত করিলেন। এরূপ মিলন, রাধাকৃষ্ণ-মিলন। অতি দুর্লভ যোগাযোগ ! রাসবিহারী সংবাদ পত্রে "আমার সহধর্ম্মিণী তোষিকো" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

সামুরাই মনোবিজ্ঞান প্রতীচ্যের নিকট অতি জটিল। আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই তোষিকোকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা তোষিকো তুমি তো আমায় ভালবেসেই বিয়ে করেছো ?"

তোষিকো কোন উত্তর দিলেন না। আবার প্রশ্ন করিলাম—"আচ্ছা সত্যিই তুমি কেমন ভালবাস তার প্রমাণ দিতে পারো ? ধর, তোমায় যদি বলি, তোষিকো ঐ জানালা দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দাও— ?"

তোষিকো নিরুত্তর—কিন্তু তাহার চক্ষে জল। হঠাৎ তিনি জানালার দিকে ছুট দিলেন। আমি একেবারে হতভম্ব। আমার ঠিক মনে নাই, আমি দৌড়ে গিয়ে কি করে, তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম।

কি কঠিন পরিহাস! কি কঠিন প্রত্যুত্তর! সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তীর পার্শ্বে তোষিকোকে দাঁড় করাই দেখ, কোন পার্থক্য নাই।

নারীর মহিমান্বিত মূর্ত্তির আভাস পাইয়াছিলেন বিমাতার মধ্যে, শ্রীমতী সোমা কোকোহর মধ্যে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে নারীর দেবীমূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও চিনিতে পারেন নাই। তোষিকোর অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া রাসবিহারী তাই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে রাসবিহারী আরও লিখিয়াছেন—"হারিকিরিই (আত্মবলী) একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই। ক্ষমা নাই।"

"সব পরিস্থিতিকে সানন্দে গ্রহণ করিতে হয়। দুঃখ, জটিল সমস্যা, প্রতিকূল ঘটনা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাই অনন্ত মুক্তির সোপান"।

"অপরকে কখনও আঘাত করিও না। আত্মাহুতি দাও। দেখিবে, সকলে সুখী হইবে।"

"একটী ফুলেরও পাপড়ি ছিন্ন করিও না"।

"পাওয়ায় আত্মার তৃপ্তি নহে, তৃপ্তি শুধু দানে। তুমি কিছুই সৃষ্টি কর নাই, তুমি এ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলে নিতান্ত নগ্নাবস্থায়। সুতরাং তোমার সকল সঞ্চয় অপহরণের

নিদর্শন। দানে তুমি কিছুই দিতে পার না; যাহা কিছু তুমি দান কর, তাহা তোমার অপহরণের লক্ষাংশ মাত্র।"

"তোমার মৃত্যু যদি কাহাকেও অখণ্ড আনন্দ দান করিতে পারে বুঝিতে পার, তবে মৃত্যুই বরণীয়। পরিচিত-অপরিচিত, প্রিয়-অপ্রিয়, সকলের জন্যই আত্মবলি দাও। যদি পরিচিতের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পার, আর অপরিচিত, অবজ্ঞাত, ঘৃণ্যের জন্য আত্মত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হও, তবে তুমি ঘোর স্বার্থপর। নূতন ভাবধারা ও নবাগত অপরিচিত বিপন্নকে সাদরে গ্রহণ কর, দেখিবে স্বর্গীয় আলোকচ্ছটায় হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। অনির্ব্বচনীয় প্রেমপ্রবাহ ও প্রত্যেক নূতন ভাবধারা আয়ত্ত করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিবে, কিন্তু প্রতিদানের আশা বা লোভ করিবে না। তবেই তুমি মুক্ত, তুমি ন্যায়শীল, তুমি প্রেয়, তুমি প্রকৃত সামুরাই সন্তান। তবেই কেহ তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, তুমি অপরাজেয়। অর্থ, শক্তি, উপাধি বা চাতুর্য্য দ্বারা কাহাকেও পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে না,—পরাস্ত করিবে শ্রেষ্ঠ বিচার শক্তি ও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা। অন্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিও না, আত্মপ্রশংসা করিও না, নিজকে অভ্রান্ত দেবতা মনে করিও না। আর আত্ম সমালোচনা? তাহাও করিও না। নিজ দোষ, ক্রুটী, অক্ষমতা, ক্ষুদ্রতা লইয়াও আলোচনা করিও না। নিয়ত তোমার বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস কর দেখিবে তোমার মন কবির মনের মত রসে ভরিয়া উঠিবে, তুমি ভাব-জগতের মধ্যে বিচরণ করিবে।"

উপরোক্ত কয়েকটী পঙক্তিতে রাসবিহারীর অন্তরের রূপটী বিকশিত পুষ্পের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা বুঝিতে পারি, রাসবিহারীর নির্জ্জনবাস তাহাকে সাধনমার্গে কতদূর অগ্রসর করিয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারি রাসবিহারীর জীবনে তোষিকোর আবশ্যকতা ও তোষিকোর সাহচর্য্য কতখানি। কেন রাসবিহারী পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর সন্নিকট হইয়াছেন ও সেখান হইতে অভাবনীয় উপায়ে রক্ষা পাইয়াছেন তাহার কারণও কতকটা ইহা দ্বারা অনুমাণ করিতে পারি। ইহা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ—ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের অনির্ব্বচনীয় উপাদান।

রাসবিহারীকে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিলাম। কিন্তু ধনীর দুলালী তোষিকো কোথায় শিখিল জীবনের এ পরম তত্ত্ব? শুনিয়াছি তিনি অতি সল্পভাষিণী ছিলেন। তিনি কোনও বিষয়ে স্বামীর সহিত আলোচনাও করিতে পারিতেন না, অথচ দেখিয়াছি তিনি চিন্তাশীলা, আত্মোৎসর্গকারিণী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্ম্ম-বীরাঙ্গনা এবং নিজ অভিমত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতে পারিতেন। যাঁহারা চিন্তাশীল হয়, তাঁহারা বাকপটু হন না, প্রগল্‌ভতা তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীমতী তোষিকোর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তাঁহার জননী শ্রীমতী সোমা কোকো। তিনিই কন্যাকে আচারে ব্যবহারে বাক্যে কর্ম্মে সর্ব্বাংশে আদর্শ চরিত্রা করিয়া তুলিয়া ছিলেন। রাসবিহারী এই শ্রীমতী সোমার সহায়তায় "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লীগ" ও "ইণ্ডিয়ান ন্যাশানল আর্মি" গঠন করিতে সমর্থ হন।

তাঁহার অপরিসীম স্নেহ সর্ব্বদাই রাসবিহারীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই রাসবিহারী তোষিকো-বিরহ সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা সোমার বয়স এখন প্রায় ৮০ বৎসর। তিনি "এশিয়ার জাগরণ" নামক পুস্তকের রচয়িতা। জাপানী ভাষায় তিনি রাসবিহারীর জীবনী রচনা করিয়া জাপানী জাতিকে তাহা উপহার দিয়াছেন। তাঁহারই পুস্তক হইতে ডাক্তার অশোয়া রাসবিহারীর বিষয় জানিতে পারেন এবং ডাক্তার অশোয়ার নিকট হইতে আমি রাসবিহারীর নির্ব্বাসিত জীবনের ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি। কি করিয়া এক জাপানী নারী নিজ কন্যাকে পর্য্যন্ত বলি দিয়া এই নির্য্যাতিত দেশপ্রাণ মহাপুরুষের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য ত্রিশ বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়াছেন, সেই কাহিনী তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজ তিনি কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রের স্মৃতি বক্ষে লইয়া অন্তিম মিলনের দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পুরাতন ভারতকে আমরা জানি, ভারতীয় নারীকেও আমরা চিনি। ভারতের নারী আত্মগোপন করিয়া অপরের অলক্ষ্যে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী, পুত্রের সেবা করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। যৌবনে স্বামীর পরিচয়ে স্ত্রী পরিচিতা হন, পরে পুত্রের পরিচয়ে পরিচিতা হইতে গর্ব্ব অনুভব করেন। স্বামী পুত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেই তাঁহারা তৃপ্ত। সে প্রতিষ্ঠার অংশ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহারা পথে ছুটীয়া বাহির হন না। তাঁহারা স্বামীপুত্রের দুঃখের ভাগিনী

কিন্তু সুখ সৌভাগ্যের ভাগ লইবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। বিপদের সম্মুখীন হইলে বা শেষ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহাদের দেখিতে পাই, জানিতে পারি, বুঝিতে পারি, অনুভব করি, অন্য সময় তাঁহারা অন্তরালে অদৃশ্য হন। আজি কালিকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা নারীর মত সমাজের পুরোভাগে আসন গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা মাতামাতি করিতেন না। স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি ও বৃত্তি তাঁহাদের ছিল না অথচ তাহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। শ্রীমতী সোমার মধ্যে এই আদর্শটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীমতী সোমা তাঁর পুস্তকে নিজের সম্বন্ধে একবর্ণও লেখেন নাই। এমন কি নিজের তীব্র দুঃখের ও একান্ত একাকীত্বের কথাও উল্লেখ করেন নাই, কোন প্রার্থনাও জ্ঞাপন করেন নাই। নিজের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চালিত বিশ্ববিদ্যালয় কয়জন মৈত্রেয়ী, গার্গেয়ী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী সমাজকে উপহার দিতে পারিয়াছে, কয়জন ভীষ্ম, কর্ণ, একলব্য, যাজ্ঞবল্ক্য, চাণক্য তৈয়ারি করিয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে তাহা জানি না। কিন্তু আজি কালিকার বিশ্ববিদ্যালয় যে অহঙ্কারী, স্বার্থপর, বিলাসপ্রবণ আত্মসর্ব্বস্ব পরমুখাপেক্ষী পুরুষ ও নারী প্রস্তুত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহৎ স্থিতধী আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অজ্ঞাত, দরিদ্র, শ্রমশীল, সংযমী, বুদ্ধিমতী নারী অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কখন কখন মহৎ ধার্ম্মিক সমাজসেবী

সন্তান সৃষ্টি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নগণ্য। পুরুষের আশ্রয়ে প্রকৃতি, আবার প্রকৃতি না থাকিলে পুরুষ নির্গুণ, নির্ব্বিকার। প্রত্যেক পুরুষের মহৎ কৃতিত্বের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন অভয়া নারী। যাঁহারা মহামানব, তাঁহাদের আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, পূজাও করি; কিন্তু তাঁদের পশ্চাতে তাঁদের স্রষ্টা নারীর পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই। ডিসরেলীর মা ও স্ত্রী, এডিসনের মা, বিদ্যাসাগরের মা, রামকৃষ্ণের মা ও স্ত্রী, বিবেকানন্দের মা, বঙ্কিমচন্দ্রের মা প্রভৃতি আদর্শ নারী, পূজার্হ।

শ্রদ্ধা কাহার পায়ে নিবেদন করিব—যে মহৎ, না যে মহতের স্রষ্টা? রচনাকে না রচয়িতাকে? রাগ রাগিনীকে, না তার স্রষ্টাকে?

ভারতমাতার সুসন্তানেরা তাঁহাদের অশন, বসন, ভূষণ, জীবন ও মরণের জন্য ভারতমাতার নিকট কৃতজ্ঞ। মার সম্মুখে সকলেই নগ্ন শিশু—সকলেই সমান। মা-ই ইহজগতে অনন্ত প্রেম, অসীম মুক্তি, চরম পবিত্রতা, আর সকলই নশ্বর, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।

বাঙ্গলার প্রতাপাদিত্য মাতৃপূজা করিয়া বলীয়ান হইয়াছিলেন। আজও ভারতে মাতৃপূজা হইয়া থাকে। মাতৃপূজা আরও গভীর ভক্তির সহিত হওয়া উচিত। প্রতি ঘরে নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিবার প্রয়োজন আছে। নারীতে ঐশী শক্তি আরোপ কর, নারীকে ভোগাসন হইতে দেবীর আসনে

প্রতিষ্ঠা কর দেখিবে তুমিও দেবতার আসন পাইয়াছ, দেখিবে "জননী জন্মভূমিশ্চ" প্রকৃতই "স্বর্গাদপি গরিয়সী"।

ভারতের ইতিহাসের আন্তর্জাতিক অধ্যায়

ভারতের বাহিরে পদার্পণ করিবার পর জাপানে অবস্থান করিবার অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে রাসবিহারী নূতন দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারত ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ব্বল জাতিমণ্ডলী নানাভাবে ইউরোপের দ্বারা নির্য্যাতিত ও শোষিত হইতেছে। এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি যদি একতাবদ্ধ হইয়া ইউরোপকে তীব্র বাধা দেয়, তবেই এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন জয়যুক্ত হইতে পারে। জাপান ও চীন যদি এ কার্য্যে অগ্রণী হয়, তবেই এই দুষ্কর ব্রতের উদ্‌যাপন সম্ভবপর।

১৯২১ সালে রাসবিহারী "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ" স্থাপন করিয়া এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তিনি এইদিকে জাপানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—"সমগ্র জগতের শান্তির জন্য ভারতের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।"

তোষিকোর বিরহে রাসবিহারী সাময়িকভাবে শোকাচ্ছন্ন হইলেও আবার নূতন উদ্যমে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে তোষিকো দেহীরূপে তাঁহার রক্ষা কবচ ছিল, সেই তোষিকোই হৃদয়াসন হইতে তাঁহাকে সঙ্কল্প সিদ্ধির পথ দেখাইয়া চলিলেন। তিনি সংবাদ-পত্রের সাহায্যে জাপান-প্রবাসী সকল ভারতীয়কে ও

জাপানী ভ্রাতা ভগ্নীকে জাপান-ভারত সম্বন্ধ দৃঢ় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বৃন্দাবনের প্রেম-মহা-বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ জাপানে পৌঁছান। তিনি রাসবিহারীকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী প্রত্যেক সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সুযোগ অতি অল্পই কিন্তু সেজন্য তাঁহার উদ্যম প্রশমিত হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার ওহকাওয়ার এবং পিকিংএ অবস্থিত এশিয়াবাসীর সম্মেলন সমিতির সাহায্যে তিনি এক সভা আহ্বান করেন। ১লা আগষ্ট ১৯২৬ সালে নাগাসাকিতে এই সভায় ১১১জন চীনা, ৮ জন ভারতীয়, ১ জন আফগানী, ১ জন ভিয়েটনামবাসী, ১ জন ফিলিপিনবাসী ও ২০ জন জাপানী আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসবিহারী এই সভায় যে ভাষণ দেন তাহার অংশ এইখানে উদ্ধৃত হইল—

"আমি জানি আজিকার এই সভার সমালোচনা অনেকেই এই বলিয়া করিবেন যে একটী আন্তর্জাতিক সমিতির বিদ্যমানে আর একটীর আবশ্যকতা কি? কিন্তু এই দুই আন্তর্জাতিক সমিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটীর উদ্দেশ্য ৫০ কোটী শ্বেতকায়ের স্বার্থরক্ষা, আর দ্বিতীয়টীর লক্ষ্য ১০০ কোটী এশিয়াবাসীর মঙ্গল। সামাজিকতায়, সভ্যতায়, অধ্যাত্ম বিষয়ে এবং শিল্প বিদ্যায় সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া প্রাচ্য শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য হইতে কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট ছিলেন না। তিন মহাদেশের মধ্যে ভারতের সভ্যতা,

বিশেষ ভারতের দর্শন, মানব সভ্যতার পরম নিদর্শন। আমরা যে সমিতি গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার লক্ষ্য প্রাচ্য সভ্যতাকে নূতন রূপ ও কলেবর দান করা। এই সমিতির উদ্দেশ্য এশিয়াকে বিশ্বাস ও প্রীতির ভিত্তির উপর গঠন করা। এস, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই, এবং প্রত্যেকে মানব সমাজের কল্যাণ ও শান্তির জন্য আমাদের আদর্শের প্রচার করি।"

রাসবিহারী এই উক্তির মধ্যে তিনটী বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন। প্রথম, এই দ্বিতীয় সমিতির আবশ্যকতা কোথায়; দ্বিতীয়, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতির আবশ্যকতা; তৃতীয়, ঐক্যবদ্ধ হইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা। ভগবান বুদ্ধের বাণীর সহিত মিলাইয়া দেখ—'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। সেই একই কথা শুধু ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রূপ। শুধু অহিংসা নয়, চাই বিশ্বাস, চাই প্রীতির ডোর, চাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সর্ব্বশেষে চাই আত্মোৎসর্গ।

অল্প দিনের মধ্যে রাসবিহারী জাপান প্রবাসী সকল ভারতীয়ের পথ প্রদর্শক নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল ভারতীয়কে লইয়া তিনি জাপানে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটী'র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩১ সাল হইতে রাসবিহারী প্রতি বৎসরই ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস পালন করিতেন। নিখিল ভারত জাতীয় সভার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া সঙ্কলিত বিষয়-বিবরণী তার-যোগে ভারতীয় জাতীয় সভাকে জ্ঞাত করিতেন।

ভারতের অভ্যন্তরস্থ রাজনৈতিক অবস্থা—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে লবণ শুল্কের প্রতিবাদ

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন দমন-নীতি আরম্ভ হয়, ক্রমশঃই তাহার চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৮ সালে বাঙ্গলার প্রত্যেক ঘরে হাহাকার উঠিয়া গগন ভেদ করিতে থাকে। লাহোর বিদ্রোহের প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৯১৯ সালে ইংরাজ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ জালিয়ানওয়ালা-বাগে আবালবৃদ্ধবনিতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। মেদিনীপুরের লোমহর্ষক নারীধর্ষণ ও লুণ্ঠন ইংরাজ শাসনের আর এক রক্তরঞ্জিত অধ্যায়। ভারতের এই সময়ের ইতিহাস ইংরাজ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় এরূপ কলঙ্কিত যে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও তাহার দ্বিতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ইংরাজ জয়স্তম্ভ একত্রিত করিয়া একটীর উপর আর একটী দণ্ডায়মান করিয়া সর্ব্বোপরি যদি ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল স্থাপিত করা হয়, উক্ত ইংরাজ অত্যাচারের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট তাহাও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। পবিত্র রোমান রাজ্যের একটী কীর্ত্তিও আজ দাঁড়াইয়া নাই, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপ্রাসাদ আজ নিশ্চিহ্ন; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড একদিন বিলয় হইবে, কিন্তু ইংরাজের অত্যাচারের ইতিহাস মানব-স্মৃতি হইতে কোন দিনই বিলুপ্ত হইবে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ১৮০৫-১৯০৫ ইংরাজ আইন সংস্কারের যুগ, ১৯০৫-১৯১৬ স্বায়ত্বশাসনের যুগ, ১৯১৭-২১ হোমরুলের যুগ।

১৯২০-২১ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯২০ সালে তিনি বিপ্লবকে এক নূতন রূপ দিলেন,—অহিংসা অসহযোগ। জনসাধারণ অহিংসা বুঝিল না; বুঝিল অসহযোগ। এ পথের কাঠিন্য তত তীব্র বলিয়া মনে হইল না। জনসাধারণ আকৃষ্ট হইয়া, কেহ আংশিকভাবে, কেহ বা পূর্ণভাবে অসহযোগ আরম্ভ করিলেন। জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ড তখনও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। জনসাধারণের অন্তরে এক বিপুল ক্ষোভ গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছিল। রৌলট বিলের প্রতিবাদের জন্য মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দেশ দিলেন সত্যাগ্রহের। দলে দলে লোক গান্ধীর পতাকা তলে সমবেত হইতে লাগিল। গান্ধী ঘোষণা করিলেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য চাই এক কোটী অর্থ, বিশ লক্ষ চরকা ও জন-সাধারণের কংগ্রেসে যোগদান। গান্ধীজীর দাবী অচিরে পূর্ণ হইল। অল্প দিনের মধ্যেই অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় (passive) বাধায় পরিণত হইল।

১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী প্রায় পনের হাজার জনতার সমক্ষে লাহোর কংগ্রেসে শ্রীগান্ধী ঘোষণা করিলেন—"ভারতের স্বাধীনতা সন্নিকট"। জনতা এই আশ্বাস বাণীতে উল্লসিত হইয়া মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ২৬এ জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস" বলিয়া ঘোষিত হইল। সমুদ্রের লবণাক্ত জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য মহাত্মা ৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আহমেদাবাদ হইতে কাম্বে উপসাগর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বিষুবমণ্ডলে বিস্তৃত লবণাক্ত অম্বুরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতে জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত আইনদ্বারা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। লবণ প্রস্তুত করণে যে ব্যয়, তাহার ২৬০ গুণ কর লবণের উপর নির্দ্ধারিত! ভারতের শান্তিকামী নিরপরাধ জনসাধারণকে লুণ্ঠণের কি ঘৃণ্য কৌশল! ইহারই নাম শরীর উপাদানের উপর কর নির্দ্ধারিত করিয়া ব্যাপক হত্যার চেষ্টা! বিদ্যালয়ের বালকও জানে আদিতে জীবের জন্ম লবণাক্ত সমুদ্রে। প্রাণীতত্ত্ববিৎ মাত্রেই জানেন, লবণ রক্তকণার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। খাদ্যের অন্তর্নিহিত লবণ অপসৃত করিলে প্রাণীজগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ভিটামিন ব্যতিরেকে মানুষ যে কয়েক দিন জীবিত থাকিতে পারে, সম্পূর্ণ লবণ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ততদিন জীবিত থাকিতে পারে না। লবণ, ভিটামিন হইতেও প্রয়োজনীয়। সমুদ্রের জলরাশি হইতে যদি লবণ আহরণ করা অপরাধ হয়, তবে বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করাও অপরাধ। এরূপ অবৈধ, অকল্যাণকর নীতি-বহির্ভূত আইন পৃথিবীর আর কোন দেশ কল্পনা করিতেও পারে নাই। মেসিনগান ও এটম বম হইতেও এ হত্যার অভিযান ভয়াবহ! মহাত্মা গান্ধী এই বিরাট হত্যার প্রতিবাদ করিলেন। যে আইন বলে ইংরাজ ২০০ বৎসর ধরিয়া দুঃস্থ নিপীড়িত ৪০ কোটী কৃষ্ণকায় মানবকে লুণ্ঠন করিতেছিল, তাহারই মূলে আঘাত করিলেন। অতি সাংঘাতিক আঘাত! অস্ত্র অভিযান নয়, নিরস্ত্র অভিযান! জগৎ মহাত্মা গান্ধীর এই সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি দেখিয়া চমকিত

হইল। ইংরাজ ক্ষিপ্ত হইয়া ৬০,০০০ লোককে কারারুদ্ধ করিল। ১৯৩২ সালে লবণ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হইল। ১২০,০০০ লোক হাসিতে হাসিতে কারাবরণ করিল। কে না, এই ব্যাপক হত্যা ও লুণ্ঠনের কথা প্রকাশিত হইলে লজ্জিত হইত? কিন্তু ইংরাজ লজ্জিত হয় নাই! তাহার ধ্বংস ও লুণ্ঠন নীতি পূর্ব্ববৎ বলবৎ রহিল। জনসাধারণের এই জাগরণে বাধা দিবার জন্য ইংরাজ যতপ্রকার দমন-অস্ত্র সম্ভব সকলই প্রয়োগ করিল। স্থবির, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অনেকেই ইংরাজের মুদ্গরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, দেশপ্রাণ কবিগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, বহু গ্রাম্য শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী গুলির আঘাতে নিহত হইল। কিন্তু জাতির স্বাধীনতার অগ্রগমন স্থগিত হইল না। অহিংসা ও নীরব সত্যাগ্রহের নিকট ইংরাজের রাজশক্তি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিল। এ অহিংসা শুধু ভাবপ্রবণতা প্রসূত নহে, বাতুলতা নহে—এ অহিংসা হৃদয়োত্থিত দুর্জ্জয় শক্তি, বজ্রতুল্য কঠিন।

১৯৩০ সালের মহাত্মাজীর পূর্ণ স্বরাজ দাবীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের আর এক প্রাঙ্গণে মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর দ্বারা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার বিশেষত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমূল্য। চট্টগ্রাম অন্ততঃ কয়েক-দিনের জন্য স্বাধীন হইয়াছিল। এ আত্মবলি-যজ্ঞের প্রধান হোতা ছিলেন সূর্য্যকান্ত সেন। তাঁহার তন্ত্রধারক ছিলেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জন। এই যজ্ঞে প্রথম

অংশ গ্রহণ করিলেন ভারতীয় নারী। শ্রীমতী প্রীতিলতা ও সুহাসিনী দেবী এ যজ্ঞে বিরাট অংশগ্রহণ করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় নারীর স্থান কোথায় তাহার নিদর্শন দিয়াছেন। চট্টগ্রাম ইতিহাস এ পুস্তকের আলোচ্য নয় তাই উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রের সম্পাদককে রাসবিহারীর পত্র

জাপান রাজধানী টোকিও হইতে রাসবিহারী উক্ত সম্পাদককে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভারতের নেতৃবৃন্দ যখন হোমরুল পাইবার আশায় উৎফুল্ল, তখন রাসবিহারী যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের অন্যান্য কংগ্রেস কর্ম্মী ১৯৪২ সালে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। দীর্ঘ বিশ বৎসরের পর ভারতের রাজনীতিজ্ঞ কর্ম্মীবৃন্দ এই সতর্কবাণী অনুধাবন করিতে ও তদানুযায়ী কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আদর্শ ও লক্ষ্য এক হইলেও রাসবিহারী ও কংগ্রেস একই পথে অগ্রসর হন নাই—এই দুই পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পত্রপাঠে রাসবিহারীর বিচারবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শ্রীসুভাষচন্দ্রও এই সতর্কবাণীর সত্যমর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন ১৯৩৯ সালের পরে; যাহার ফলে শ্রীসুভাষের সহিত গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মীগণের মত বিরোধ ঘটিয়াছিল এবং অগ্রবর্ত্তীদলের (Forward Block এর) সৃষ্টি

হইয়াছিল। এই পত্রে আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, দীর্ঘদিন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং জাপানী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা একদিনও বিস্মৃত হন নাই। পত্রটী উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি জাপানে নির্ব্বাসিত একজন ভারতীয় মাত্র। আপনার সহিত অথবা অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের সহিত আমার মত নগণ্য এক ব্যক্তির তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া ঔদ্ধত্যের পরিচয় কি না ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনারা সকলেই বহুসময় ব্যয় করিয়া ও বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ইংরাজ লেখকগণ লিখিত রাজনীতি ও দর্শন আয়ত্ত করিয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। আমিও ভারতবাসী এবং অতীতে নিজ পদ্ধতিতে স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে মাতৃভূমির সেবা করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে করিবার আশা রাখি। তবে আমার পথ ভিন্ন। যাহা হউক, আমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিব তাহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাহার স্পষ্ট উত্তর আমার নিকট অতীব মূল্যবান।

১৯২২ সালের ৩রা অগষ্টের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ার এক শ্রমিক পত্রিকা হইতে "স্বাধীন জাতি সমূহের মনোভাব" এক প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের দৌত্যের যথোচিত নিন্দা করা হয়। সেই প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, জনসাধারণের বিনা-অনুমতিতে সৈন্যবলের দ্বারা শাসিত বৈদেশিক শাসনের অনুমোদন যে

ভারতীয় করে, তাহার প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকগণ অশ্রদ্ধ ও বিরক্তি প্রকাশ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আমি সম্ভ্রমের সহিত প্রশ্ন করিতেছি যে কোথাও কি এমন একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে যেখানে প্রজার অনুমতি লইয়া বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? হইলে, নিশ্চয়ই আপনার পত্রিকায় সেই উদাহরণ প্রকাশিত করিয়া ভারতবাসীদের তাহা জ্ঞাত করিবেন। কেবল মানুষই নয়, জীবজন্তু, উদ্ভিজ, সকলেরই সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। এক-জনের উপর আর একজনের প্রভুত্ব অস্বাভাবিক ও মনুষ্যের বিবেকবুদ্ধি ও বিচারশক্তির পূর্ণ বিকাশের অন্তরায়। জগতের কোন জাতিই অপর জাতির দ্বারা শাসিত হইতে চাহে না। ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিধি-বিগর্হিত। কেবল ইংরাজ লিখিত রাজনীতি-পুস্তকে দৃষ্ট হয়—"প্রজার অনুমতিক্রমে বৈদেশিক শাসন"। পৃথিবীর আর কোন দেশ এরূপ কথা বলে না। হয় স্বাধীনতা, না হয় পরাধীনতা। দুইএর মধ্যবর্ত্তী কোন কিছু অসম্ভব। যদি আপনি ও অন্যান্য ভারতীয় মাননীয় নেতাগণ প্রকৃতই ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তবে আপনারা ইংরাজের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন এবং সেই কথাই জন-সাধারণের নিকট প্রকাশিত করুন। আর যদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না হইয়া মাত্র বিজেতার নিকট হইতে ভারতীয়ের জন্য কিছু সহৃদয় ব্যবহার লাভ ও সেইজন্য

হোমরুলের প্রার্থনা অর্থাৎ ভারতবাসীর দাসত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা তাহা হইলেও কংগ্রেসের উচিত সে কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা। অস্বাভাবিক পন্থাবলম্বনে শুভ হইতে অশুভের আশঙ্কা অধিক যেমন প্রজার মতানুসারে বৈদেশিক শাসনের অনুমোদন।

আমি এই বিষয়ে বহু মার্কিণ ও জাপানী আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞের সহিত আলোচনা করিয়াছি। হোমরুল বা 'সাম্রাজ্যের তূল্য-অংশীদার' বাক্যের দ্বারা ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞরা কি বলিতে চান ও বুঝেন তাহা অনুধাবন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার পক্ষে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, কারণ তাঁহারা সকলেই ইংরাজ-সন্তান অথবা ইংরাজ জাতিরই শাখা, তাঁহাদের সমাজ-নীতি, সংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস, ভাষা, এবং কৃষ্টি সম্পূর্ণ এক। তাঁহারা যখন আমাদের সাম্রাজ্য বলেন, তখন তাঁহারা একটুও মিথ্যা বলেন না অথবা কোনপ্রকার অত্যুক্তি করেন না। ভারতের কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারত তাঁহারা জয় করিয়াছেন, ভারত পরাধীন দেশ। ভারতের সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম, সংস্কার, ভাষা এবং কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থানের অভিপ্রায়ের অর্থ—পরাধীনতা ও দাসত্ব স্বীকার। স্বাধীনতা ও দাসত্ব একত্র থাকিতে পারে না। ভারত যদি স্বাধীনতা দাবী করিতে চাহে তবে তাহাকে বৃটিশের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে। অবশ্য ভারত বৃটিশের সঙ্গে সন্ধীসূত্রে

আবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সে হবে সমানে সমানে সখ্য, দুই স্বাধীনদেশের মধ্যে মিত্রতা। ভারত যদি হোমরুল দাবী করে অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অংশীদার হইতে চাহে, তাহার অর্থ দাসত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।”

রাসবিহারীর এই পত্র সুস্পষ্ট, তাঁহার উক্তি যুক্তিপূর্ণ ও তাঁহার মানসপটের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তাঁহার উক্তির মধ্যে কোথাও জটিলতা নাই, দাম্ভিকতা নাই, বাক্যের ঘূর্ণাবর্ত্ত নাই, শব্দচ্ছটা নাই। সমগ্র পত্রখানি প্রাজ্ঞের জ্ঞানপ্রভায় বিকশিত। রাসবিহারী যখন এই পত্র রচনা করিতেছিলেন তখনও বৃটিশ গুপ্তচর তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। রাসবিহারীর হৃদয় তজ্জন্য কি ভীত বা বিচলিত বলিয়া মনে হয়? রাসবিহারীকে স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী বলিয়া সন্দেহ হয়? মনে হয় কি রাসবিহারী জাপানী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া, জাপানের নিকট আত্মা ও সধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছেন? এ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য পরে পরিস্ফুট হইবে।

ভারত জাপান সম্বন্ধ স্থাপন।

স্বদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রাসবিহারী জাপানের রাজনীতি, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে কারণ তখনও তাঁহার মনে জাপানের সহায়তা লাভ সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়া সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই।

রাসবিহারীর জাপান গমনের কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদক পরলোকগত কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয় ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় জাপানের সাহায্য লাভ সম্ভব কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তিনি জাপান হইতে যে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছিলেন—"জাপান ভারতের মিত্র নহে—শত্রু। জাপান ইংরাজের মিত্র এবং আবশ্যক হইলে ভারতে ইংরাজ রাজ্য রক্ষার্থে ইংরাজকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবে। তাহার কারণ জাপান ভারতে ও অন্যত্র ইংরাজ সহায়তায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব।" কালীপ্রসন্ন দেশে ফিরিতে পারেন নাই। প্রত্যাবর্ত্তনকালে জাহাজেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রাসবিহারী দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একথা নিশ্চয়ই জানিতেন। তিনি তাই আলাপ আলোচনার পথ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন। ভারত-জাপান সম্বন্ধ দৃঢ় করিবার মানসে তিনি জাপানী ভাষা, ভাবধারা, কৃষ্টি ও মনোবিজ্ঞান ধৈর্য্যের সহিত অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি লক্ষ্য করিলেন, জাপান স্বাধীন হইলেও ইউরোপীয় শক্তির তুলনায় দুর্ব্বল। ইংরাজ ও মার্কিন অবিরত তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নানাপ্রকারে অপমান করিয়া থাকে। ইংরাজ ও আমেরিকার এই অপমান ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলেও জাপানের হৃদয়ের অন্তস্থলে বিদ্বেষাগ্নি সতত প্রজ্জ্বলিত থাকে। এক্ষেত্রে ভারতের প্রতি জাপানের শ্রদ্ধা ও

সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিলে ভবিষ্যৎকালে ভারত ইংরাজ বিরোধে জাপানের সহায়তা লাভ অসম্ভব নহে। রাসবিহারী স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজ-জাপান বন্ধুত্ব ক্ষয়রোগাক্রান্ত; একদিন বিচ্ছেদ সুনিশ্চিত—সে দিন নিকটেই হউক বা দূরেই হউক, তাঁহার জীবিতকালেই ঘটুক বা মৃত্যুর পরই ঘটুক। তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ—সে দৃষ্টি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত ভবিষ্যৎকালের অতল গর্ভ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে পারিত। ভারতের আর একজন কর্ম্মবীর বীর সাভারকার রাসবিহারীর সহিত গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও ইন্দো-জাপান মৈত্রীর আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষ ব্যাঙ্কক অধিবেশনে যে বার্ত্তা প্রেরণ করেন, তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভবিষ্যতকালে তিনি রাসবিহারীর মতেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান বো কানিওয়ারের" প্রতিষ্ঠাতা, "প্রেস এডভার্টাইজয়ের" সম্পাদক শ্রী নাথ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিও রাসবিহারীর মতাবলম্বী, সহচর ও সহধর্ম্মী ছিলেন।

রাসবিহারী ভারতীয় রন্ধন শিল্প জাপানে প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে ১৯৩৩ সালে "ভিলা এশিয়ান" নামে এক ভোজনালয় স্থাপন করেন। তিনি ভারতীয় রন্ধন শিল্পে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। স্বয়ং ছাত্রাবাসের সমগ্র রন্ধনকার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং প্রতি রবিবারে ছাত্রদিগের সহিত একত্রে আহার এবং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম্মবিশ্বাস, সাহিত্য প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিতেন। রহস্যালাপেও তাঁহারা বিরত হইতেন না।

এই ভোজনালয়ে ভারতীয় ও জাপানী উভয় মণ্ডলেরই তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। এই ভোজন আলয়ই জাপান ভারত সম্বন্ধের প্রথম ও প্রধান সোপান এবং সম্প্রীতি স্থাপনের অনুপম উপাদান হইয়াছিল। এইখানে তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া এ, কে, পাণ্ডে নামক এক যুবক রাসবিহারীর সহকারীরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই আবাসে থাকিয়া নানা প্রকার সহায়তা করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রাসবিহারীকে পরিত্যাগ করেন নাই।

এই সময়ে রাসবিহারী জাপানী বন্ধুদের সহায়তায় "ভারত জাপান মৈত্রী" সঙ্ঘ স্থাপন করেন। আজও বহু ভারতীয় ও নিপন এই সমিতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

রাসবিহারীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতার জন্য টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ও পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিহাসের অধ্যাপক কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হন।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাসবিহারীর জনৈক ছাত্র শ্রী হিতোকা গত বৎসর ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লোকমুখে রাসবিহারীর ভ্রাতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন—"রাসবিহারীর মুখনিঃসৃত জাপানী ভাষা ছিল মধুর, সুবিন্যস্ত এবং গতিশীল। তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষা, তাঁহার শান্ত ও সংযত বক্তৃতাভঙ্গী শ্রোতাকে অচিরে মুগ্ধ করিয়া ভক্তে পরিণত করিত। সাধারণতঃ তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভারত"। ভারতের বিষয় বক্তৃতা করিতে করিতে

তিনি আবেগভরে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, ভারত জাপান এককৃষ্টির দুই শাখা, সুতরাং ভারত জাপান মৈত্রী স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। তিনি কখন কখন ভারত ও জাপান ঐতিহাসিক যুগের কথা শুনাইতেন, কখন কখনও ভারত-জাপান-সম্বন্ধ দৃঢ় করিবার জন্য আকুল অনুরোধ করিতেন, কখন কখন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি, ধর্ম্ম, ভারতীয় ঐতিহাসিক যুগের বার্ত্তা শুনাইতে শুনাইতে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, আবার আধুনিক ভারত ও ভারতীয়দের অত্যাচারিত দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত জীবনকাহিনী বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন আবার সমগ্র এশিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে করিতে জাপানকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। শুধু ছাত্রেরা নহে, জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিত। শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ চিত্তে তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণী শুনিত। ফলে অনেকেই এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হইয়া অচিরে তাঁহার ভক্ত হইয়া সাহচর্য্যে আত্মনিয়োগ করিত।”

তিনি জাপানের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতার সভায় প্রবেশ লাভ করেন। তিনি কোরিয়াতেও বহু পরামর্শ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে রাসবিহারী কোরিয়া পরিদর্শন করেন। সেখানের গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার অসাধারণ

ব্যক্তিত্ব, অনুপম স্বদেশানুরাগ, অত্যাচারীর দমন-কামনা, অনুপম সহৃদয়তা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত।

রাসবিহারীর কর্ম্মোদ্যম ছিল অফুরন্ত। "জাপান ও জাপানী" নামক একটী জাতীয় পত্রিকায় তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। তিনি "নিউ এশিয়ার" সম্পাদক এবং "এশিয়ান রিভিউ" পত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। "নিউ এশিয়া" ইংরাজের রাজনীতি, ভারত শাসন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করিত।

১৯২২ সালে রাসবিহারী তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুদের নিয়মিতভাবে "এশিয়ান রিভিউ" পত্র পাঠাইতে থাকেন। এই পত্রে ইংরাজ রাজনীতির তীব্র সমালোচনায় ইংরাজ সরকার ভীত বা ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতে এই পত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ভারতে এই পত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলেও এই পত্র ও "নিউ এশিয়া" পূর্ব্ব-এশিয়ায় বিশেষ সমাদর লাভ করে।

শব্দই ব্রহ্ম, কিন্তু শব্দমাত্রই ব্রহ্ম নয়। বাক্‌সংযত আত্মশাসন পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ সাধকের বাক্য সমগ্র ব্রহ্মে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। রাসবিহারীর লেখনীপ্রসূত শব্দ ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন ছিল। তাহার ফল ক্রমশঃই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ভারতকে পূর্ব্ব-এশিয়ায় পরিচিত করিবার মানসে তিনি দশ বৎসর লেখনী চালনা করিয়াছেন। জাপানী ভাষায় ভারত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতের হাস্য পরিহাস, ভারতের প্রবচন ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি সুন্দর পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

এই পুস্তকগুলি জাপানের জনসাধারণে প্রচারিত হইয়া ভারতকে সমগ্র জাপানে পরিচিত করে। আজি ভারত স্বাধীন, আজি এই আজন্ম ভারত সেবকের রচনা ভারতের নরনারীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিবার দিন আসিয়াছে। তাঁহার এই রচনাগুলির মধ্যে কয়েকখানি ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও ইংরাজীতে অনুদিত হইবার সময় আসিয়াছে। প্রায় আট বৎসর অতীত হইল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, প্রায় সাত বর্ষ হইল ভারত স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, অদ্যাপি তাঁহার যথাযথ স্মৃতিরক্ষা করিবার প্রয়োজন ভারতের কুত্রাপি হয় নাই—হইবার প্রস্তাবও নাই। জাপান সরকার ভারতের এই কৃতী সন্তানকে সর্ব্বোচ্চ মানপত্র দিয়া তাঁহার ও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাসবিহারীকে স্মরণীয় করিবার জন্য টোকিও নগরে তাঁহার সমাধি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? বাঙ্গালী নিজের সুসন্তানের গৌরব রক্ষার্থে কি করিয়াছে?

রাসবিহারী কর্ত্তৃক জাপানী ভাষায় রচিত কতকগুলি পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	এশিয়ার বিপ্লবের চলচ্চিত্র	রচনা কাল	১৯২৯ সাল
২।	ভারতের হাস্য-পরিহাস	”	১৯৩০ ”
৩।	উৎপীড়িত ভারত	”	১৯৩৩ ”
৪।	ভারতের জন কাহিনী	”	১৯৩৫ ”
৫।	বিপ্লবী ভারত	”	১৯৩৫ ”

৬।	নব এশিয়ার জয়	রচনা কাল	১৯৩৭	সাল
৭।	ভারতের দাবী	"	১৯৩৮	"
৮।	ভাগবত গীতা	"	১৯৪০	"
৯।	ভারতের করুণ ইতিহাস	"	১৯৪২	"
১০।	ভারত সম্বন্ধে বক্তব্য	"	১৯৪২	"
১১।	স্বাধীন ভারতের প্রথম উষা	"	১৯৪২	"
১২।	স্বাধীনতা সংগ্রাম	"	১৯৪২	"
১৩।	রামায়ণ	"	১৯৪২	"
১৪।	ভারতবাসীর ভারত	"	১৯৪৩	"
১৫।	শেষের গান (রবীন্দ্রনাথের গানের অনুবাদ)		১৯৪৩	"
১৬।	বন্ধুর আবেদন	"	১৯৪৩	"

রাসবিহারী ভারতে থাকিতেও সংবাদ-পত্রে লিখিতেন। রাসবিহারীর সকল পুস্তক এবং প্রবন্ধ একত্র করিয়া প্রকাশিত করা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার রচনা যে জাতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

রাসবিহারীর একান্ত একাকীত্ব ও তীব্র মনোকষ্ট

আত্মীয় স্বজন, সুহৃৎ ও স্বদেশ হইতে দূরে দীর্ঘ বিশ বৎসর নির্ব্বাসিত জীবন যাপন অতীব ক্লেশদায়ক। এ ক্লেশের পরিমাণ মস্তিষ্ক দিয়া, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও আমরা যথাযথ অনুভব করিতে পারি না। কবির কথা—"বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যা'রে।" রাসবিহারীও মানুষ ছিলেন,

তিনিও সময় সময় নিজ দুঃখ দৈন্যে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মতন হইতেন। কেহ যদি বলেন, তবে তাঁহাতে আর আমাতে পার্থক্য কি? বলিব, পার্থক্য বহু। তিনি দুঃখ দৈন্যের মধ্যে সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই কোন দিন। যদি তাঁহার দুঃখ দৈন্য বোধ না থাকিত, তবে তাঁহাকে আমরা মানুষের পর্য্যায় টানিয়া আনিতে পারিতাম না তবে তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়া মানুষকে শুনাইবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি মানুষ ছিলেন, মানুষের দুঃখ দৈন্য দৌর্ব্বল্য তাঁহারও ছিল কিন্তু তিনি আত্ম সংযম দ্বারা সকল দৌর্ব্বল্য জয় করিয়া আদর্শে পৌঁছিবার জন্য অবিরত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব, ইহাই তাঁহার আদর্শ—তিনি মহৎ, তিনি অনুকরণীয়। দেবতাকে কে কবে অনুকরণ করিতে পারিয়াছে? যদি কেহ করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, সে ধৃষ্টতা।

জাপানে উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঘোর দুর্দ্দিন দেখা দেয়। আবার সেই দুর্দ্দিনে বহু জাপানী তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহায্যও করিয়াছিলেন।

সেই দুর্দ্দিনে তোষিকোর ন্যায় আদর্শ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া তিনি আত্মীয় বিরহ কথঞ্চিৎ ভুলিতে পারিয়াছিলেন। সুসময়ের উষার আলোকচ্ছটা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তোষিকো তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার উপর তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে বঙ্গভাষা শিখাইবেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। তোষিকো বাঙ্গলা

শিখিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলার কৃষ্টি আয়ত্ত করিবার জন্য সতত উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। তোষিকোর মৃত্যুর পর পুত্র কন্যাকে বঙ্গ-ভাষা এবং বাঙ্গলার কৃষ্টি শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বাঙ্গলার সংবাদ পত্রে একজন বর্ষিয়সী বিদুষী বিধবা মহিলার জন্য পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। কিন্তু কোন মহিলাই এই কার্য্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার দুঃখ চিরদিন রহিয়া গিয়াছিল যে, তিনি পুত্র কন্যাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। সর্ব্বোপরি বাসনা—স্বদেশের মুক্তি। তিনি অভীষ্টলাভ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পারিবারিক দুঃখ হইতেও এ দুঃখ তাঁহাকে অধিকতর মর্ম্মান্তিক পীড়া প্রদান করিতেছিল। স্বদেশের মুক্তি যাঁহার ধ্যান জ্ঞান—যাঁহার জীবনের বীজ মন্ত্র,—সাধনার অনুপম অনুষ্ঠান—সেই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিয়া তিনি কিরূপে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন? মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও তিনি ভগ্নোৎসাহ হন নাই। প্রাণপণে জন্মভূমির দুঃখমোচনে প্রয়াস করিতেন।

জাপানে ক্রমশঃ তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইয়াছে সেই বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। যে পুলিশ অধ্যক্ষ তাহাকে ধৃত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি পরে তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে এক নৈশ ভোজনে আমন্ত্রণ করেন। এই নৈশ ভোজনে সমগ্র অতিথিবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার সময় রাসবিহারী বলেন—

"আট বৎসর অজ্ঞাত বাস খুবই কষ্টকর।······কিন্তু এই সময়টা ছিল ভবিষ্যতের আশায় পূর্ণ। বর্ত্তমানে ইন্দো জাপান মৈত্রী সম্বন্ধ গঠন করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি। সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজকের এই নিমন্ত্রণে আমাদের দুইটী বন্ধু শ্রীটোকোনাসি ও শ্রীইনু (ইঁহারা জাপানের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) উপস্থিত নাই। তাঁহারা আর ইহজগতে নাই। তাঁহাদের অভাব আমি সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিতেছি। এই অভাবের জন্য আমার হৃদয় বড়ই ভারাক্রান্ত।······"

এই নৈশ ভোজের অল্পদিন পরেই রাসবিহারী তাঁহার শ্যালকের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"জানো, আজ আমি পঞ্চাশে পদার্পণ করিয়াছি। এই পঞ্চাশ বৎসরে আমি কি করিতে পারিলাম? কিছুই পারিলাম না। আর কবে আমার স্বপ্ন সফল হবে? হবে কি কোনদিন? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার শক্তি কি আমার আছে? কি করি আমি? কি কর্ত্তব্য আমার?······"

রাসবিহারী অনর্গল বকিয়া চলিলেন। কি শোচনীয় মানসিক অবস্থা!

রাসবিহারী থামিলে শ্রীইয়ামু উত্তর দিলেন—"পঞ্চাশ বছর কতটুকু সময়? কিছুই নয়। তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাও। ভাবাবেগ তোমার শোভা পায় না। ভাবাবেগে উত্তেজিত হইও না। সময় আসিবে। নিশ্চয়ই আসিবে।"

ইয়াসুর কণ্ঠে কে সান্ত্বনা বাণী ঢালিয়া দিল ? তোষিকো কি অন্তরালে থাকিয়া ইয়াসুকে এ ইঙ্গিত দিয়াছিলেন ? অথবা সেদিন ইয়াসুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল অন্তরীক্ষবাসী দেবতার আশ্বাসবাণী ! যাহা হউক সেদিন রাসবিহারীকে হাত ধরিয়া দাঁড় করাইবার প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন শ্রীইয়াসু। উপযুক্তা ভগ্নীর উপযুক্ত ভ্রাতা !

আরও একবার রাসবিহারী বড়ই কাতর ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। গ্রীষ্মকাল, উত্তর জাপানের এক কলেজের পরামর্শ সভায় যোগদানের জন্য রাসবিহারী ও অধ্যাপক ওহকাওয়া উত্তর জাপানে গিয়াছেন। পরামর্শ সভার অধিবেশনের পর একদিন দ্বিপ্রহরে দুই বন্ধুতে সমুদ্রবক্ষে এক ক্ষুদ্র নৌকায় চুপচাপ বসিয়াছিলেন। দূরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া উভয়ে বসিয়াছিলেন। সহসা রাসবিহারী কাঁদিয়া উঠিলেন, পাগলের মত আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন—"উঃ কি নিঃসঙ্গ জীবন ! ভগবান ! কি নিঃসঙ্গ জীবন !............" রাসবিহারী নৌকার পাটাতনে পড়িয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ বৎসরের নিঃসঙ্গ জীবনের কঠোরতা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এ কঠোর নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব কে কল্পনা করিতে পারে ? তাঁহাকে হয়ত সান্ত্বনা দিতে পারিত তোষিকো। হয়ত তিনি সান্ত্বনা পাইতেন যদি তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইত ! হয়ত তিনি সান্ত্বনা পাইতেন স্বদেশে ফিরিয়া আপন বাল্য লীলাভূমির শান্ত শ্যামল

শ্রী চক্ষুগোচর হইলে। তিনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাঁহার সাধের ভারত নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর!

চীন জাপান যুদ্ধের প্রাক্কালে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে।

১৯৩৭ সালে চীন জাপানে সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল। সংঘর্ষের মূলে মার্কিন স্বার্থ। চীনে মার্কিন ও নিপন সমভাবে শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসা করিতেছিল। মার্কিন ব্যবসায়ী এই ব্যবসাক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হইবার মানসে চীন সরকারের উপর চাপ বর্দ্ধিত করিল। চীন জাপানকে ব্যবসাক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া নানা পন্থার আবিষ্কার করিতে লাগিল। ফলে যে সংঘর্ষ বাধিল তাহা ক্রমশঃ বিপুল আকার ধারণ করিতে চলিল। মার্কিন তখন চীনের পশ্চাতে থাকিয়া চীনকে অস্ত্র সাহায্য করিতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে চীনের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তারে সফলকাম হইল।

জাপানের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী শিক্ষিত সমাজ, পূর্ব্বতন অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য আক্রমণমূলক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া চীন ভূখণ্ডে অবতরণ করিল। এ যুদ্ধে লক্ষ্যের বিষয় রণাগ্রহী নেতৃবর্গের ও সৈন্য-সমাজের মনোভাব ও নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্ন। সৈন্য-সমাজ বুঝিল না কেন তাহারা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপরের ভূখণ্ডে অবতরণ করিয়া তাণ্ডবলীলায় মত্ত হইয়াছে।

নেতৃগণ পাশ্চাত্য গুরুর নিকট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। শস্ত্র শক্তির মোহে মুগ্ধ জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য পণ করিল। কিন্তু সর্ব্বত্র কি পশুশক্তির জয় হয়?

রাসবিহারী এই যুদ্ধের মধ্যে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি সুযোগ গ্রহণের জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। অচিরে তিনি ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৩০ জন ভারতীয় টোকিওর 'রেন বো' ভোজনালয়ে মিলিত হইলেন। এই সভায় যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইল, তাহা জাপানের প্রধান মন্ত্রী, চীনের রাষ্ট্রদূত ও ভারতের কংগ্রেস সমিতিকে জ্ঞাত করা হইল।

রাসবিহারীর এশিয়া "এশিয়াবাসীর", "শ্বেতাঙ্গ নিজের দেশে ফিরিয়া যাউক", "আমাদের বিবাদ আমরা মীমাংসা করিব" প্রভৃতি বাণী জাপানে ও চীনে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে তাঁহার "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" প্রসারলাভ করিতে লাগিল। ২৮শে অক্টোবর ১৯৩৭ সালে টোকিওর সানকাইডোতে এশিয়াবাসী যুবকমণ্ডলীর যে সম্মেলন হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, শ্যামবাসী, ইণ্ডোনেশিয়াবাসী, মঙ্গলিয়াবাসী ও আরবীয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী জাপানের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র সভা আহ্বান করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম জাপান,

কোবে, টোবাটা, সিলোনস্কী, হাগী, য়ামাগুচী, হুকুকা ও ওকাহামা প্রভৃতি স্থানে রাসবিহারী সভা আহ্বান করেন। অবশেষে ১৮ই নভেম্বর তিনি কেওটোয় উপস্থিত হন। উত্তর জাপানের আরও অন্যান্য স্থানে স্বীয় দল পুষ্টির জন্য তিনি সচেষ্ট হন।

রাসবিহারীই প্রথম জগৎকে শুনাইলেন "এশিয়া এশিয়া-বাসীর।" এই নূতন বাণীর অন্তর্নিহিত বীজমন্ত্র সমগ্র জাপানকে কম্পিত করিল, সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়াবাসী এ বাণীর দ্বারা উদ্বেলিত হইল। যে শুভ মুহূর্ত্তের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, এতদিনে বুঝি সেই চির আকাঙ্ক্ষিত দিবস আগত। তিনি প্রচারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে মার্কিন প্রভুত্বাধীন চিয়াং কাইসেকের চীন সরকার চুংকিং এ সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। জাপান জনসাধারণ ও রাষ্ট্রপতিরা "এশিয়া এশিয়া বাসীর" বাণীতে সাড়া দিল ও এশিয়ার প্রাধান্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ওয়ামসিন-ডইএর চীনও এই বাণী সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিল। ভারতে শ্রীসুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"আমাদের শেষ প্রস্তাব বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করা হউক।"

এই সময় হিন্দু মহাসভার সহায়তায় রাসবিহারীর সহিত ভারতের যোগ স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত বীর সাভারকার ভারতে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। ঠিক এই সময়ে রাসবিহারীও জাপানস্থিত হিন্দু-মহাসভার সভাপতিত্ব

করেন। জাপান যুদ্ধে অবতরণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয় দেশকর্ম্মীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ছিল। রাসবিহারীর একান্ত ইচ্ছা ছিল, জাপানে হিন্দু মন্দির স্থাপন করা। এইদিকে তিনি বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ আলস্য নহে, ইহার কারণ অন্য গুরুতর কার্য্যে তাঁহাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সাভারকারের সহিত নেতাজী সাভারকার ভবনে সাক্ষাৎ করিলে সাভারকার নেতাজীকে রাসবিহারীর এক পত্র দেখাইয়া বলেন "আপনি কোন প্রকারে দেশের বাহিরে চলিয়া যান। সেখানে শত্রু হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈন্য লইয়া এক সেনাদল গঠন করুন ও রাসবিহারীর সহিত একযোগে কার্য্য করুন। অবশ্য দেশের বাহিরে গমন বড়ই বিপজ্জনক, কিন্তু মহৎকর্ম্মে মহতী বিপদের সম্মুখীন হইতেই হয়।" অচির ভবিষ্যতে নেতাজী সাভারকার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। যুদ্ধ ঘোষণা হইবার বহুপূর্ব্বেই ভারতীয় কংগ্রেস ভারতকে কোন ইউরোপীয় যুদ্ধে পূর্ব্বোক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যোগ দিতে দিবেন না বলিয়া স্থির করেন। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস জানিতে চাহিলেন—"এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি? ভারতের সহিত যুদ্ধের সংস্রব কি? ভারত স্পষ্ট শুনিতে চাহে ভারত সম্বন্ধে ইংরাজের মতামত; কোন প্রকার স্তোক বাক্য

শুনিতে ভারত প্রস্তুত নহে।" বৃটিশ সরকার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগোর প্রস্তাব পাঠে কংগ্রেস বুঝিলেন, ভারতের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিতে বা ভারতে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিতে বৃটিশ সরকার আদৌ প্রস্তুত নহেন। কংগ্রেস মন্ত্রীরা প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিলেন। ১লা জুন ১৯৪০ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারত সরকারের সহিত সহযোগিতার সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের মূল কথা—ইংরাজ অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার না করিলে সহযোগিতা অসম্ভব। প্রত্যুত্তরে আগষ্ট ১৯৪০ সালে রাজপ্রতিনিধি কংগ্রেসের নিকট এক প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব এতই অসঙ্গত যে, কংগ্রেস সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করিলেন। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী আংশিকভাবে সত্যাগ্রহ করিলেন। এ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল বাক্-স্বাধীনতা লাভ ও নৈতিক প্রতিবাদ।

এদিকে জাপানের চীন আক্রমণকে ভারতীয় নেতাগণ সুচক্ষে দেখিলেন না। তাঁহারা এই আক্রমণকে জাপানের রাজ্যলোভ অনুমান করিয়া ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন না, চিয়াংকাইসেক মার্কিন ক্রীড়নক মাত্র, স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া প্রজার স্বার্থ মার্কিনের হস্তে বলি দিতেছেন। মার্কিন প্রচারে ও চিয়াংকাইসেকের চীৎকারে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতীয় নেতারা জাপানের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ইংরাজ ও মার্কিনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া সরাসরি

জাপানের নীতিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় বণিক সমাজ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী ও শ্রী আনন্দমোহন সহায় ভারতের জাপান বিরোধী মনোভাবের জন্য ভৎর্সিত হইতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাসবিহারী রবীন্দ্রনাথকে জাপানে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন সাক্ষাৎ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ জাপানের নীতি বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না। রাসবিহারী বিপুল বাধার সম্মুখীন হইলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া দন্তে দন্ত নিস্পেষিত করিয়া এই বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

এই সময় বিপ্লববাদী মত প্রকাশ করিবার জন্য কর্ম্মবীর শ্রী সুভাষচন্দ্র প্রথমে কলিকাতায় কারারুদ্ধ ও পরে স্বগৃহে আবদ্ধ হন। এই জনপ্রিয় পুরুষ-সিংহকে আবদ্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট রাখিতে পারে ইংরাজের সে ক্ষমতা ছিল না। তিনি ইংরাজ গুপ্ত-চরের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া জার্ম্মাণীতে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি অবিরত বৃটিশ সরকারকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানুয়ারী ১৯৪১ সালে সেচ্ছাসেবী ভারতীয় সৈন্য দ্বারা স্বাধীনতার জন্য ভারত আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। ভারত সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের অবতরণ ও রাসবিহারী

৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন। ঐদিন জাপান, ইঙ্গ-মার্কিন বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই

সঙ্গে ভারতের ইতিহাসেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জাপানী নৌ ও বিমানবহর পার্লহারবার আক্রমণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন নৌবহর পঙ্গু করিয়া দেয় ও অবিলম্বে জাপানী সৈন্য মালয়ে অবতরণ করে।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে সহায়, দেশপাণ্ডে, পাণ্ডে, গুপ্ত, লিঙ্গম, রামমূর্ত্তি, জেসা সেন, নারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া রাসবিহারী জাপান প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে এক সমিতি গঠন করেন।

১৫ই জানুরারী ১৯৪২ সালে এশিয়া হইতে ইঙ্গ-মার্কিনকে বিতাড়িত করিবার মানসে টোকিওতে রাসবিহারী "এশিয়ান ইণ্টার ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের" উদ্বোধন করিলেন। ২৪শে জানুয়ারী ওসাকাতে রাসবিহারীর চেষ্টায় এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

শ্রী টোয়ামা রাসবিহারীকে জাপানী সমর কার্য্যালয়ের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। মেজর হুজিওয়ারার "ভারতীয় দ্বারা জাতীয় বাহিনী" গঠনের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। জাপানী সমর দপ্তরের অনুরোধে রাসবিহারী নিজের 'পরিকল্পনা' তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহার পরিকল্পনায় ছিল দুইটী কথা—

প্রথম—মালয়ে অবিলম্বে ভারতীয় বাহিনী গঠন করা।

দ্বিতীয়—এশিয়ায় সমগ্র নির্ব্বাসিত ও প্রবাসী ভারতীয়ের সাহায্যে একটী শক্তিশালী রাজনৈতিক সমিতি গঠন করা।

দীর্ঘ আলোচনা, বাদানুবাদ ও পত্রের আদান প্রদানের পর রাসবিহারীর পরিকল্পনা গৃহীত হয় ও রাসবিহারী ভারতীয় স্বাধীনতা

সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করেন। এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন— "আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিব। আমরা জাপানের ক্রীড়নক বা পুত্তলী নহি। জাপান সমর দপ্তরের সহিত আমরা সহযোগিতা রক্ষা করিব বটে, কিন্তু ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কার্য্যে জাপান কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রী তোজো ঘোষণা করিলেন "ভারত নিষ্ঠুর অত্যাচারী ইংরাজের হস্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্তি লাভ করিতেছে, এবং আমাদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া বৃহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া স্থাপনের জন্য অগ্রণী হইয়াছে। জাপানও আশা করে, অবিলম্বে ভারত স্বীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। ভারতীয়দের স্বদেশ উদ্ধারের কার্য্যে জাপান যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।"

রাসবিহারীর উক্তি ও জাপানের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা, উভয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বাধীন দেশের মন্ত্রীর দায়িত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও মহৎ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত তিনি লক্ষ্য করেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন, কিন্তু সহসা কোন দায়িত্বহীন বিবৃতি দিয়া বসেন না। তিনি জাপান জনসাধারণের মনোভাব ও সঙ্কল্প এবং জাপানের শক্তি সম্পূর্ণ নির্ণয় করিয়াই উপরোক্ত ঘোষণা দিয়াছিলেন। তাঁহার ঘোষণায় কোথাও জটিলতা নাই, কথার কুচক্র ও ঘূর্ণাবর্ত্ত নাই। রাসবিহারীর উক্তিও সরল কিন্তু সবল। আমরা পরবর্ত্তীকালে দেখিব, এই রাসবিহারীকে মোহন

সিং স্বীয় স্বার্থে কি মসি মলিন তুলিকায় চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ দোষস্খালনের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে গিয়া এই মহান চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। যে মহান, তাহাকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিলে মহান খর্ব্ব হয় না। তাহার মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, যে ক্ষুদ্র সে আরও খর্ব্ব হইয়া পড়ে। রাসবিহারীর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রথিত ও একই বর্ণে রঞ্জিত!

প্রবাসী ভারতীয়দের মহাসভা

ঘটনা স্রোত দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ের প্রত্যেক দিন জগৎ আকুল উত্তেজনায় যাপন করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে একই কথা—তার পর কি? ভারতই কেবল এ সংবাদ হইতে বঞ্চিত ছিল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ সালে সান্নো ভোজনালয়ে সাংবাদিক পরিষদে রাসবিহারী যে বিবৃতি দান করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য! সেই বিবৃতি উদ্ধৃত হইল—

"ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ!

গত একশত বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ভারত সহস্র সহস্র নরনারী বলি দিয়াছে। অস্ত্রাভাবে আজও আমরা লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি নাই। "এশিয়া এশিয়াবাসীর" এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আজ জাপান ব্যগ্র। আমাদের এই সুবর্ণ সুযোগ।

এস আমার ভারতীয় ভাই সকল! এস, আমরা সকলে একত্রে ইংরাজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করি।

এস ভারতের সকল ভাই! এস আমরা সকলে একই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে, ঐক্যবদ্ধ হইয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হই। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্ম্ম প্রেরণা, ভগবান বুদ্ধের নিঃস্বার্থ প্রেম, ইসলাম কথিত ভগবৎ বিশ্বাস, গুরু গোবিন্দ ও শিবাজীর উজ্জ্বল উপদেশ ও আদর্শ এবং মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ অসীম শক্তি বলে আমাদের লক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করুক।

বৃটিশ সৈন্যভুক্ত যে সব ভারতীয় সৈন্য জাপানের হস্তে পতিত হইয়াছিল তাহারা দেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরাজের শক্তির বিরুদ্ধে হংকং এবং মালয়ে যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের সহসা-জাগ্রত স্বদেশ প্রেম আমাদের অভিভূত ও মুগ্ধ করিয়াছে। এস সব! ভারতের মুক্তি সাধনের জন্য আমাদের সহিত যোগ দাও। জানিও ভারতবর্ষ ভারতীয়দেরই।”

রাসবিহারীর এই বাণী—এই প্রাণোচ্ছ্বাস্—সংক্ষিপ্ত হইলেও কি গুরু গম্ভীর! কোথাও ভাবাবেগ নাই, একটীও অবান্তর শব্দ যোজনা নাই, অথচ সমগ্রবাণী যেন অক্ষর মন্ত্রবীজ! এ বাণী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ সকলকে মাতৃ সেবার জন্য আহ্বান করিয়াছে। এ বাণী প্রত্যেক ভারতীয়কে জানাইয়াছে—“এসেছে সময়”, “হয়েছে সময়।” এস সকলে আত্মাহুতি দাও, পশ্চাতে দেখিওনা, পার্শ্বে কি আছে লক্ষ্য

করিও না, শুভ অশুভ বিবেচনা করিও না, মুক্তি কি পীড়ন ভাবিও না। এস, সম্মুখে অগ্রসর হও! যজ্ঞ লগ্ন উপস্থিত, এস একত্রে আত্মবলি দিই।

এবাণীর আকুল আহ্বান মেঘ মন্দ্রের মত প্রস্তর প্রাচীর ও রুদ্ধ দ্বার ভেদ করিয়া নিদ্রামগ্ন মানব-হৃদয় স্পন্দিত করে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের 'নির্ঝরের' মত সহসা রবির করে চমকিত হইয়া, মানব সকল বাধা, সকল বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আকুল আবেগে ছুটিয়া বাহির হইতে চায়।

রাসবিহারীর বাণী বেতার সাহায্যে দেবমুখ নিঃসৃত আকাশ-বাণীর মত এশিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। এশিয়ার দূর দূরান্তর প্রদেশ হইতে ভারতীয় কর্ম্মীবৃন্দ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেনস লিগের প্রধান কেন্দ্রে সমবেত হইতে লাগিলেন।

রোগশয্যায় শায়িত টোয়ামার সহিত রাসবিহারীর সাক্ষাৎ

১৯৪২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাসবিহারীর জীবনে এক শুভদিন। রাসবিহারী কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে গুরুর আশীষ লইতে গিয়াছিলেন এইদিন। নায়ার দেশপাণ্ডে ও লিঙ্গম সমভিব্যাহারে রাসবিহারী শ্রী টোয়ামার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ রোগ-শয্যায় শায়িত। রাসবিহারী তাঁহার সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রী টোয়ামা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, আনুষ্ঠানিক বস্ত্র 'হারোই' ও 'হাকামা' পরিধান করিয়া রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে শয়ন গৃহে রোগ-শয্যার পার্শ্বে আহ্বান করিলেন। রাসবিহারী শ্রদ্ধার সহিত শ্রী টোয়ামাকে জাপানী প্রথায় প্রণাম করিলেন। পরে অশ্রুসিক্ত চক্ষে বলিলেন "গুরুদেব! আপনাকে অসংখ্য প্রণাম! এতদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত সময় উপস্থিত।"

শ্রী টোয়ামা উৎসাহভরা দৃষ্টিতে রাসবিহারীকে দেখিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "হাঁ! অনেক দিন পরে! এতদিন ভারতের স্বাধীনতা শুধু স্বপ্নই ছিল! এতদিন পরে সে স্বপ্ন বাস্তবরূপ ধারণ করিতেছে! আমার বয়স এখন ৮৮ বৎসর। জীবনদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায়। কিন্তু বড় আশা, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়া যাই। বড় আশা, বড় অভিলাষ·····" বৃদ্ধের রোগশীর্ণ আবেগ আকুল কণ্ঠস্বর মধ্যপথে থামিয়া গেল, নয়নকোণে দুইবিন্দু মুক্তা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

উভয়ের অন্তরাকাশে ভাসিয়া উঠিল—অতীত সাতাশ বর্ষের দীর্ঘ স্মৃতি। ভাসিয়া উঠিল—সেই দিনের কথা, যে দিন ২৯ বৎসর বয়স্ক এক ভারতীয় যুবক বড়ই বিপন্ন হইয়া শ্রী টোয়ামার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল; ভাসিয়া উঠিল—সেই দিন যে দিন শ্রী টোয়ামার ও শ্রী সোমার সহায়তায় পুলিশকে ফাঁকি দিয়া রাসবিহারীর আত্মগোপন; ভাসিয়া উঠিল—এক কিশোরীর অপূর্ব্ব আত্মদান। সাতাশ বৎসরের ঘটনা-স্রোত উভয়ের নয়ন-

সম্মুখে চলচ্চিত্রের ন্যায় প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক অপসারিত হইতে লাগিল। কত আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহের অবস্থান অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছেন, পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের স্মৃতিপটে তাহাই উদয় হইতে লাগিল।

দীর্ঘ সাতাশ বর্ষ ধরিয়া সারথীত্ব করিয়া শিষ্যের জয় অভিযান ও জয়কীর্ত্তি দেখিবার জন্য গুরু অধীর, আকুল, ব্যাকুল।

এ চিত্র অতি মধুর! কর্ম্মে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে গুরু সম্মুখে আবার স্বীয় সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া রাসবিহারী প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহার পর কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

রাসবিহারীর অধীনে সকল প্রবাসী ভারতীয় 'ভারত স্বাধীনতা সংঘের' পতাকাতলে একত্রিত হইতে লাগিল।

ক্রীপ্সের দৌত্য ও রাসবিহারীর হুঙ্কার

যুদ্ধে জাপানের পুনঃ পুনঃ জয়ে বৃটিশ সরকার বিচলিত, কংগ্রেস প্রবুদ্ধ ভারতের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। নানারূপ কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভারতের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় যুদ্ধ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিতে বিমুখ। এ দিকে জাপান ভারতের সিংহদ্বার সিঙ্গাপুরের সম্মুখীন। অতএব শীঘ্র একটা নিষ্পত্তি একান্ত প্রয়োজন। ১১ই মার্চ, ১৯৪২ সাল বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার যুদ্ধ পরিষদের সদস্য মিঃ ক্রীপ্স এক নূতন প্রস্তাব লইয়া অবিলম্বে ভারতে পৌঁছিবেন ও এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ

ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ক্রীপ্স ২২শে মার্চ ভারতে পদার্পণ করেন ও ১৩ই এপ্রিল ভারত ত্যাগ করেন।

ঐ দিনই চার্চিলের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বার্লিন বেতারকেন্দ্র হইতে শ্রীসুভাষচন্দ্রের হুঙ্কার শ্রুত হইল। তিনি আবেগময়ী ভাষায় ইংরাজ-শাসনের সমালোচনা করিয়া ক্রীপ্সের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য লইয়া এক বৃহৎ ভাষণ দান করিলেন। ক্রীপ্স প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত গুপ্ত চাতুরীর কথা উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইতে নিষেধ করিলেন।

ঐ দিনই টোকিও বেতার কেন্দ্র হইতে রাসবিহারীর বজ্রগম্ভীর গুরুগর্জ্জন শ্রুত হইল। জাতীয়তাবাদের অগ্রণী শ্রীঅরবিন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তিনি বলেন—

"স্বাধীন ভারত স্বীয় অধ্যাত্ম সাধনার আদর্শ প্রচার দ্বারা জগতের সেবা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন। আজ অরবিন্দের ভারতবর্ষের মুক্তি-সাধনায় নেতৃত্ব করিবার সময় আসিয়াছে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রকাশ্যভাবে এই মুক্তি-সাধনায় যোগদান করা তাঁহার কর্ত্তব্য। মনে রাখিতে হইবে ভারতীয়ের জন্যই ভারত, এশিয়াবাসীর জন্য এশিয়া।"

ইহারই দুই দিন পরে ১৩ই মার্চ তিনি গান্ধীজীকে অভিনন্দিত করিয়া টোকিও বেতার কেন্দ্র হইতে বলেন—

"আপনি সত্যাগ্রহ নীতি প্রচার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আজ আপনি ভারতের নীতিশাস্ত্র কথিত সত্যের প্রতীক। এই সত্যাগ্রহ-নীতি দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ভারতের স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই পূর্ব্ব এশিয়ার যাবতীয় জাতির সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধে সহযোগিতা করিবার সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন জয় যুক্ত হই। আমি বুঝিয়াছি গীতার নিস্কাম কর্ম্ম-যোগের সহিত আপনার সত্যাগ্রহ ধর্ম্মের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।”

১৬ই মার্চ রাসবিহারী সমগ্র জাতি ও নেতৃবৃন্দকে ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য এক বক্তৃতা করেন। তিনি এই ভাষণে ইংরাজের পররাজ্য-লোলুপতা, নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গত মহাযুদ্ধে ভারত ইংরাজকে নানারূপ সহায়তা করিয়াও ফলস্বরূপ পাইয়াছিল, জালিওয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক অত্যাচার! তিনি বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ বলিয়াই ক্রীপ্স প্রস্তাব এবং সে প্রস্তাবও চাতুরী পূর্ণ, অতএব জাতি ও জাতীয় নেতারা যেন ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ঐ দিনই রাসবিহারী মহম্মদ আলি জিন্নাকে অন্তর্বিরোধে শক্তি ক্ষয় না করিয়া পূর্ব্বের মত কংগ্রেসের সহিত একযোগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—“ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র বিভিন্ন বস্তু। নিজ নিজ ধর্ম্মমত রক্ষা ও পালন করিয়াও একতাবদ্ধ হইয়া একত্রে স্বদেশের সেবা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।”

১৮ই মার্চ তিনি পণ্ডিত জহরলালকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন "পতনোন্মুখ অত্যাচারী বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা অতি অসঙ্গত। পণ্ডিতজীরই কথা—স্বাধীনতা নিজবলেই অর্জ্জন করিতে হয়। ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা পরাধীনতারই নামান্তর।" তিনি পণ্ডিতজীকে ক্রীপ্স প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বলেন "ভারত যদি ইংরাজের সহায়তা করে, তাহা হইলে ভারতকে যুদ্ধ হইতে দূরে রাখা অসম্ভব, কারণ জাপান ভারত আক্রমণ করিতে বাধ্য হইতে পারে।"

২১শে মার্চ রাসবিহারী বীর সাভারকারকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন "ইংলণ্ডের শত্রু ভারতের মিত্র, ইংলণ্ডের দুঃসময় ভারতের সুসময়। এ কথা আমার নয় এ আপনারই কথার পুনরাবৃত্তি। আপনারই নীতি অনুসারে জাপান আজ ভারতের মিত্র। এই জাপানের সহায়তায় পূর্ব্ব এশিয়ায় সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়কে সমর-সজ্জায় সজ্জিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছি। জাপানের হস্তে আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈন্যরা স্বেচ্ছায় ভারত-মুক্তি সৈন্যদলে যোগদান করিতেছে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জয়যুক্ত হই। প্রার্থনা করি, আপনারাও ক্রীপ্স প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন ও ইংরাজের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হইবেন।"

ইহারই তিনদিন পরে ২৪শে মার্চ রাসবিহারী টোকিওর বেতার গৃহ হইতে কংগ্রেস সভাপতি মৌলনা আবুল কালাম আজাদকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—

"এই মহা সঙ্কটকালে ভারত যদি ইংরাজের সহিত যোগ দেয়,

তবে ভারতের বড়ই দুর্দ্দিন। ভারত যদি এই যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করে ও ইংরাজ যুদ্ধে জয় লাভই করে তবে যে বহু জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতে অনুষ্ঠিত হইবে সে বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আর ইংরাজকে সহায়তা করা সত্ত্বেও যদি ইংরাজ পরাজিত হয়, তবে ইংরাজের শত্রুগণ ভারতের উপর কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাও বিবেচ্য। এরূপ অবস্থায় ক্রীপ্স প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইংরাজের সহায়তা করা কখনই উচিত নহে। তদ্ব্যতীত আশী বৎসর ধরিয়া যে সকল ভারতের বীর-সন্তান স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া এখন বিজয়ের অতি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন ভারতীয় নেতাদের কর্ত্তব্য কি তাঁহাদের বিরোধিতা করা? ইহা কি কোটী কোটী ভারতীয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা নহে? বরং আইন অমান্য করিবার ইহাই সুবর্ণ মুহূর্ত্ত। যদি সক্রিয় সংগ্রাম করিবার শক্তি নেতারা হারাইয়া থাকেন, তবে নিষ্ক্রিয় অসহযোগ অবলম্বন করা বিধেয়। মন্ত্রী তোজোর ঘোষণার বিষয় আপনাদের অজ্ঞাত নহে। তাঁহার ঘোষণায় আস্থা হারাইবার কোন কারণ নাই।"

২৭শে মার্চ শ্রীরাজাগোপালাচারীকে অভিনন্দিত করিয়া রাসবিহারী ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য আবার অনুরোধ করেন। তিনি ইংরাজের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন যে নেতাগণ যদি আইন অমান্য আন্দোলন এখনই আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে। তিনি বলেন, এ আন্দোলনে পূর্ব্ব এশিয়ার সকল প্রবাসী ভারতীয় সর্ব্ব

প্রকারে যোগ দিবে,—তাহারা ভারতের সংরক্ষিত দুর্জ্জয় বাহিনীরূপে পরিণত হইবে।

৩রা এপ্রিল রাসবিহারী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্দেশ্যে এক বাণী প্রচার করেন। ঐদিনই ভারতীয় জনসাধারণ ও সকল নেতাদের উদ্দেশ্য করিয়া ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করিলে ভারতের ভবিষ্যতে কি দুঃখময় দিন আসিতে পারে, তাহার আভাস দেন।

পুনরায় ৯ই এপ্রিল জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসবিহারী আর একবার ভারতীয়দের সচেতন করিবার চেষ্টা করেন।

২২শে মার্চ হইতে অবিরত কংগ্রেস কার্য্যকরী সভা ক্রীপ্স প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। সমগ্র ভারত উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিল। নেতাদের বাণী শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। সংবাদ-পত্রে নানাপ্রকার মন্তব্য। কখনও মনে হয়, নেতারা ধূর্ত্ত ইংরাজের নিকট বুঝি পরাজিত হইলেন, আবার তখনই মনে হয় প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ নেতারা কি সহজে পরাজিত হইবেন! অবশেষে মহাত্মা গান্ধী সংশয় ছেদন করিয়া উক্তি করিলেন "ক্রীপ্স প্রস্তাব পতনোন্মুখ ব্যাংকের উপর ভবিষ্যৎ তারিখের একখানি চেকের সহিত তুলনীয়।" ১৩ই এপ্রিল ভারত ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। সমগ্র ভারত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। রাসবিহারী নেতৃবর্গকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন—"আজ যদি আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া সংগ্রাম করিতে পারিতাম।" একটী কথা! কিন্তু এই একটী কথায় তাঁহার ভারতের প্রতি

যে গভীর আকর্ষণ ও প্রেম তাহা অতি মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয় যখন ভারাক্রান্ত হয়, রসনা তখন নীরব হইয়া পড়ে!

ইহার পরও কয়েকবার রাসবিহারীর বাণী টোকিও হইতে ভাসিয়া আসে। এই সব বাণীতে জাপানের উদ্দেশ্য, পূর্ব্ব-এশিয়া-ভারতীয়দের কর্ম্মপন্থা প্রভৃতি বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করেন এবং ভারতবর্ষকে ইংরাজ, মার্কিনের সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা করিতে নিষেধ করেন। তিনি জিন্না ও কংগ্রেসকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, যেন তাঁহারা একযোগে কার্য্য করেন, তাঁহারা যেন মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া না যান যে, ভারতের মঙ্গলে ৪০ কোটী হিন্দুমুসলমানের মঙ্গল, তাঁহাদেরও মঙ্গল। যদি সকল নেতা, সকল কর্ম্মী ঐক্যবদ্ধ হইয়া একই মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা দূরে থাকিতে পারে না।

প্রবাসী ভারতবাসী একত্রিত হইতে লাগিলেন। সাংহাই, হংকং, ব্যাংকক প্রভৃতি স্থান হইতে প্রবাসী ভারতীয়রা টোকিওতে সমবেত হইতে লাগিলেন। বহু সহকর্ম্মী রাসবিহারীর জাতীয় পতাকাতলে একত্রিত হইলেন। প্রথমে জাপানে রাসবিহারী ছিলেন ভারত স্বাধীনতার একমাত্র সৈনিক ও ব্যাংককে ছিলেন অমর সিং ও প্রিতম সিং। আজ সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়াস্থ প্রবাসী ভারতীয় তাহাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম-যজ্ঞ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। ক্রমে ভারতের স্বাধীনতার তরুণ অরুণ দূর চক্রবালে প্রতিবিম্বিত হইল।

রাসবিহারীর জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে করিতে বারংবার এমন কয়েকটী কথা মনে উদয় হইয়াছে যাহার সহিত রাসবিহারীর জীবনীর প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু কথাগুলি নিরর্থক নহে। আমারই মত, পাঠকের মনেও ঐ কথাগুলি উদিত হইতে পারে, তজ্জন্য তাহা বিবৃত করিতেছি।

এক গান্ধী, এক রাসবিহারী বা এক পণ্ডিত নেহেরু ভারতের স্বাধীনতা আনিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন নাই। ভারতের স্বাধীনতার জন্য কত সহস্র নামধাম পরিচয়হীন গান্ধী আত্মবলি দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অসহযোগ সংগ্রামে যে কত সহস্র ব্যক্তি আত্মবলি দিয়াছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। রণ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিবার জন্য শত শত লোক সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। যদি সে সুযোগ ও সৌভাগ্য তুমি না পাইয়া থাক, তাহা হইলেও তুমি যে সেই সব বীরের সন্তানদের মধ্যে একজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই এই শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রাম কোন একজন ভারতীয় দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। সমগ্র ভারত এই সংগ্রামে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যোগদান করিয়াছে। টোয়েনবির মতে গত তিন লক্ষ বৎসরের মধ্যে পশুবলের বিরুদ্ধে মানব-সমাজের ইহা এক বিরাট অভিযান—এক বিরাট বিপ্লব। অতএব এ বিপ্লবের গৌরবের তুমিও অংশভাগী। কিন্তু এখনও তোমার অলসভাবে সময় ক্ষেপণ করিবার অবসর আসে নাই।

প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রাম মাত্র গতকল্য আরম্ভ হইয়াছে। এখনও বহুদূর চলিতে হইবে। উঠ বীর, নূতন বলে বলীয়ান হইয়া মহামানবতার জন্য দৃঢ়পদে সম্মুখে অগ্রসর হও। প্রাচীন চৈনিকের বাক্য স্মরণ কর। তিনি বলিয়াছেন—"শান্তিময় স্বাধীন ভগবানের সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে স্বদেশকে শান্তিময় ও স্বাধীন কর। স্বদেশ গঠনের পূর্ব্বে নিজ পরিবার-বর্গকে সুখী ও স্বাস্থ্যবান কর। সুস্থ সবল পরিবার গঠনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান স্বাধীন চিত্ত, শক্তিমান পুরুষ ও সেবা-রূপিণী নারী। এইরূপ আদর্শ পরিবার গঠনের ঐকান্তিক ইচ্ছা তোমাকে জীবনের, স্বাস্থ্যের, স্বাধীনতার, সুখের, শান্তির ও মুক্তির মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে দিবে প্রবল প্রেরণা।"

একখণ্ড ভূমির উপর অধিকার লাভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শান্তির আলয় স্বাধীন দেশ তুমি আজও পাও নাই। তুমি অসুস্থ ও পীড়িত, তোমার দেহ মন উভয়ই ব্যাধিগ্রস্ত। কেন তুমি ব্যাধিগ্রস্ত? কেন তুমি অনাবিল আনন্দের আস্বাদ পাও না? কেন তুমি, অভাব, অনাটনে, দুঃখ দারিদ্র্যে কুব্জ দেহ? কেন তুমি কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজকে অতলতলে তলাইয়া দিতে পার না? ভাবিয়া দেখ, দেখিবে মূলবস্তু আজও তোমার করতলগত হয় নাই। তোমার মূল সম্পদ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হইতে তুমি বঞ্চিত। তোমার কর্ম্মপ্রেরণার মূল উৎস এই পূর্ণ স্বাস্থ্য ও প্রশান্ত হৃদয় উদ্ভূত ভাব বিকাশ।

প্রকৃত সুন্দর স্বাস্থ্য ও প্রশান্ত জীবন লাভ করিতে হইলে চাই আড়ম্বরহীন বিশুদ্ধ পুষ্টিকর আহার্য্য যাহার প্রত্যেক কণা রূপান্তরিত হইয়া বিশুদ্ধ রক্ত কণিকা সৃষ্টি করিবে। আজ দেশের এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া যাও, কোথাও বিশুদ্ধ আহার্য্য পাইবে কিনা সন্দেহ। দেশের যে সব কুসন্তান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের স্বাস্থ্যকে পণ্য করিয়াছে তাহাদের প্রতি অবিলম্বে কঠিন ব্যবস্থা আবশ্যক, নতুবা এতদিনের ইপ্সিত স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য তোমার একজনও বংশধর জীবিত থাকিবে না। তোমার স্বাধীন দেশ পরিণত হইবে শ্মশানে। শত সহস্র মেডিকেল কলেজ ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেও স্বাস্থ্যহীনতা হইতে দেশ মুক্তি পাইবে না। জীবনের ঐ অবস্থা হইতে মৃত্যু শ্রেয়স্কর!

একটী হাঁসপাতালের ব্যয়ে একটী পুষ্টিকর আহার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা কর। দেখিবে বহু লোকের হৃত স্বাস্থ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত কর, পরিমাণ নির্দ্ধারণ কর, প্রত্যেক রোগের যথার্থ পথ্য নির্ণয় কর, জনসমাজে তাহার প্রচার কর, কর্ত্তৃপক্ষের স্বার্থরক্ষার্থ ঘৃণ্য আচরণের নাগপাশ মোচন কর, দেখিবে বৈদেশিক সুদৃশ্য বোতল-নিবদ্ধ ঔষধের আবশ্যক হইবে না, দেশের সন্তান দেশেরই ঔষধিতে রোগমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কর্ম্মঠ হইয়া উঠিবে। ভাবিয়া দেখ, রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন ৩০ কোটী নরনারী কোথায় কর্ম্মশক্তি পাইবে?

প্রকৃত স্বাধীন সে, যে মনে প্রাণে নীরোগ। অটুট তাহার স্বাস্থ্য, অদম্য তার কর্ম্মশক্তি, সদানন্দ তাহার জীবন প্রবাহ। তাহার নাই প্রাদেশিকতা, জঘন্য ধর্ম্মদ্বেষ, হিংসাপূর্ণ নির্য্যাতন প্রবৃত্তি; সে স্বদেশে প্রবাসে সর্ব্বত্র স্বাধীন। সে নির্ভীক, সে মুক্ত। সুযোগ যদি আসিয়াছে, তবে হেলায় তাহাকে হারাইও না। মনে প্রাণে স্বাধীন হইবার জন্য নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াও, নিজেকে বন্ধন মুক্ত কর, অপরকে মুক্তি পথের সন্ধান দাও।

দেশ স্বাধীন হইবার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া, এক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া, সকল অভাব অভিযোগ পূরণ করিয়া বিশ্বমানবতার দিকে বহু দূর অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু দেশের জনসাধারণ যেখানে ছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘ পাঁচবৎসর আলস্যে ও বৃথা জল্পনাকল্পনায় ব্যয়িত হইয়াছে। উঠ, বদ্ধপরিকর হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী হও, ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য স্বার্থপূর্ণ ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, অসার বাগাড়ম্বর ও বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ কর; বিলাস, ঈর্ষা, দ্বেষ সংযত কর যোগ্যকে নেতৃপদে বরণ কর, অযোগ্যকে আবর্জ্জণাবৎ বর্জ্জন কর, নৈতিক বিবেকবীজ জাতির শিরা উপশিরার মধ্যে সঞ্চালিত কর, নিশ্চয়ই জাতি দ্রুত আদর্শের পথে অগ্রসর হইবে। স্বাধীন চীনের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, চীন কি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দৃষ্টি কর—মার্কিন পুত্তলী চিয়াংকাইসেকের চীনে আর মেও তে

সাংএর চীনের মধ্যে কত পার্থক্য! চীনে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতে তাহা অসম্ভব কিসে?

বাঙ্গালী! তোমারই পিতৃপুরুষ খুদিরাম, কানাই লাল, বারীন্দ্র, যতীন দাস, যতীন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, সূর্য্যকান্ত, রাসবিহারী; তোমারই প্রপিতামহ, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র। তোমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রতিটী রক্তবিন্দু দান করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সেই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের বীজ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সে দিন বাঙ্গালী ছিল অগ্রণী। আজ সমগ্র ভারতের ঐক্যের জন্য তোমাকেই হইতে হইবে অগ্রসর। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন তোমাকেই সফল করিতে হইবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনা ও তিন বিপ্লবী সৈনিক

আই, এন, এ, বা আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস একটী অবিস্মরণীয় গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় কাহিনী। ১৯৪২ সালে বৃটিশ শক্তি বিজয়ী জাপানী সৈন্যের নিকট বার বার পরাজিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এই সময় প্রায় ত্রিশলক্ষ ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হস্তে পতিত হয়। ফলে বৃটিশ প্রভুর স্থানে, এই ত্রিশ লক্ষ্য ভারতীয় সৈন্যের প্রভু হইল নিপন। জাপানীরা ইচ্ছা করিলে এই ভারতীয় সৈন্যের সহিত বন্দী-শত্রুর মতই ব্যবহার করিতে ও যথেচ্ছভাবে

নিপীড়ন করিতে পারিত। কিন্তু জাপান তাহা করে নাই। এরূপ না করিবার কারণ জাপান বৃহত্তর এশিয়া গঠনের জন্য তখন বদ্ধপরিকর সুতরাং তাহার জন্য ভারতের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। রাসবিহারী তাঁহার শক্তিশালী জাপানী ও প্রবাসী ভারতীয় বন্ধুদের সহায়তায় ভারত জাপান মৈত্রীর পথ পূর্ব্ব হইতেই সুগম করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৯৪০ সালে হংকংএর ইংরাজ কারাগার হইতে তিনজন ভারতীয় সৈন্য পলায়ন করেন। ইঁহারা তিনজনেই গূঢ় উদ্দেশ্যে ইংরাজ অধীন ভারতীয় সৈন্য বিভাগে বিপ্লব প্রচার করেন। এই তিন বিপ্লবীই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সেচ্ছাসেবক ও স্থাপয়িতা। ইঁহারা কারাগার হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া শ্যাম ও মালয়ে বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদের শেষ গন্তব্য স্থান ছিল বার্লিন। ক্যাণ্টনে যখন ২১ নং জাপানী সৈন্য বিভাগ অবস্থান করিতেছিল, তখন তাঁহারা সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করিয়া ব্যংককে বা ইন্দোচীনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জাপানীদের নিকট সুবিধা প্রার্থনা করেন। বক্রপথে কোবে হইয়া তাঁহারা ব্যংককে উপস্থিত হইলে, ব্যংকস্থিত ভারতীয়-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের নেতা শ্রী অমর সিংহ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন ও এই বিপ্লবীদের সহায়তা করার জন্য ব্যংককের জাপানী রাজদূতকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই সূত্রে জাপানী সহকারী সামরিক দূত টামুবারের সহিত অমর সিংহ ও তাঁহার সহকারী প্রিতম সিংহের পরিচয় ও সৌহার্দ্দ হয়। তখনও জাপান যুদ্ধে অবতরণ করে নাই।

১৯৪১ সালে সহসা যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, যুদ্ধাগ্নি পূর্ব্ব এশিয়া লক্ষ্য করিয়া দ্রুত সেইদিকে ছুটিতে লাগিল। ইঙ্গ-মার্কিনের সহিত জাপানের পূর্ব্ব হইতেই চীনের ব্যাপার লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল। সে বিরোধিতা তীব্র হইয়া উঠিল। পথভ্রান্ত পূর্ব্ব এশিয়া পথের সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অকস্মাৎ পূর্ব্ব এশিয়ার আকাশ নিস্তব্ধ, বায়ু প্রবাহ-হীন। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল, যেন ঘূর্ণবাত্যার পূর্ব্বাভাস। মেজর হুজিওয়ারা টোকিও হইতে ব্যাংককে প্রেরিত হইলেন। তিনি ব্যাংককে পৌঁছিয়া ভারতের বিপ্লবী সংঙ্ঘের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত প্রিতম সিংহের পরিচয় হইল। যদি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে কি করা উচিত তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রিতম সিংহ ও মেজর হুজিওয়ারা চারিটী পরামর্শ সভায় মিলিত হন ও ভারত জাপান মৈত্রীর একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) ভারত ও জাপান, এই উভয় স্বাধীন দেশ ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রাচ্যে স্বাধীন ভ্রাতৃভাব প্রচার করিবে ও সুখ-শান্তি সমৃদ্ধিপূর্ণ স্বাধীন প্রাচ্য দেশ গঠন করিবে।

(২) ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘ বৃটিশ শক্তিকে অবিলম্বে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতে স্বাধীনতা স্থাপন করিবে। এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘ জাপানকে

সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। জাপান ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৩) ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য, "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" জাতি, ধর্ম্ম ও রাজনীতি নির্ব্বিচারে সমগ্র ভারতকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছে।

অপরাপর ধারাগুলিতে ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘের ও জাপানী সমরবাহিনীর কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে ইংরাজ সৈন্য বিভাগের অন্তর্গত ভারতীয়-দিগকে শত্রু বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

এই সন্ধি প্রস্তাব ১লা ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে উভয় পক্ষ হইতে স্বাক্ষরিত হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর ব্যংককের জাপান কর্ত্তৃপক্ষ টোকিও হইতে তারযোগে সংবাদ পাইলেন ৮ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। তৎপর যুদ্ধ-প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ১০ই ডিসেম্বর হুজিওয়ারা ও ভারত জাতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জাপানী সৈন্য অবিলম্বে এলোরষ্টারের নিকট এক ইঙ্গভারতীয় সৈন্যদলের সম্মুখীন হইলেন। এই দলের অধিনায়ক একমাত্র ইংরাজ ফিজ প্যাট্রিক। তদ্ভিন্ন আর সকলেই ভারতীয় ছিলেন। প্রায় বিনা বাধায় অধিনায়ক সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। ভারতীয় সৈন্য ভারতীয় জাতীয় সঙ্ঘে যোগ দিল।

ইংরাজ সৈন্যের আত্মসমর্পণের পর জাপানী সৈন্য অগ্রসর হইল। নগর অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ফলে দস্যুদ্বারা

নগর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। নগর রক্ষার জন্য হুজিওয়ারা প্রিতম সিংহকে সদ্য আত্মসমর্পনকারী ভারতীয় সৈন্য হইতে একজন দলপতি নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রিতম সিংহ জাপানী অধিনায়কের প্রস্তাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রিতম সিংহ প্রশ্ন করিলেন "এইমাত্র যে ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাকে নগর রক্ষার কার্য্যে নিয়োগ করা কি দুঃসাহসিকতা নহে?" হুজিওয়ারা কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের মনোভাব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। হুজিওয়ারার অনুরোধে প্রিতম সিংহ ক্যাপ্টেন মোহন সিংহকে নগর রক্ষীরূপে নিযুক্ত করিলেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের কার্য্য কুশলতায় অচিরে নগরে শান্তি স্থাপিত হয়।

মোহন সিংহের কার্য্যদক্ষতায় হুজিওয়ারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভারতীয় সঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য বলিলেন। মোহন সিংহ হুজিওয়ারার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তর্কে পরাজিত হইয়া তিনি ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘে যোগ দিতে স্বীকৃত হইলেন। হুজিওয়ারা প্রিতম সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া মোহন সিংহকে ভারতীয় সৈন্যের অধিনায়কত্ব দান করেন। এইরূপে আজাদ হিন্দ ফৌজের বা আই, এন, এ,র সৃষ্টি হয়।

অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজ, ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও হুজিওয়ারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘ নগরে, গ্রামে, সর্ব্বত্র পরামর্শ সভা ও

সমিতি শাখা সংযোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আই, এন, এ ও আই, আই, এল, এর কার্য্য দেখিয়া প্রবাসী ভারতীয়েরা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

সিঙ্গাপুরের পতন ও মোহন সিংহ

ক্যাপ্টেন মোহনসিংহ হুজিওয়ারার নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘে যোগ দিলেন বটে কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর এক পত্রে তিনি জাপানী সরকারকে জানাইলেন যে যতদিন না জার্ম্মানী হইতে শ্রী সুভাষচন্দ্রকে আনা হয়, ততদিন তিনি বা তাঁহার অধীন সৈন্যগণ জাপানীদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে অক্ষম। এই পত্রে তিনি ইহাও বলেন যে, যদি শ্রী সুভাষচন্দ্র তাঁহাদের অধিনায়কত্ব করেন, তবেই ভারতের অন্যান্য নেতাদের বিরোধিতা স্বত্তেও ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করা সহজ ও সম্ভব।

নানা প্রকার বাদানুবাদের পর মোহন সিংহ বিপন্ন উদ্বাস্তু বিভাগের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইংরাজ সৈন্যের পরাজয় বা পশ্চাৎধাবনের ফলে, যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি, একান্ত নিঃস্ব বা লোক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, মোহন সিংহ তাঁহাদের একত্রিত করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপ দুঃস্থ ত্রাণ করিতে করিতে মোহন সিংহ যখন কোয়ালা-লাম্পুরে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার অধীনে প্রায় দশহাজার সামরিক

ও বেসামরিক ভারতীয় একত্রিত হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে কোয়ালালাম্পুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজ বিভাগ স্থাপিত হয় এবং মোহন সিংহ ইহার নায়কত্ব গ্রহণ করেন। এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত আই, এন, এর, মধ্যে সকলের সমান সুবিধা, সমান খাদ্য, সমান অধিকার ছিল। কোন প্রকার ধর্ম্ম বা জাতি প্রাধান্য ছিল না। এই সময় ক্যাপ্টেন আল্লাদিও খাঁ ও মেজর রাম স্বরূপের অধীনে যুদ্ধ বিভাগও গঠিত হয়।

জাপানী রাজসৈন্য ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর আক্রমণ করিল। ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। বৃটিশ সৈন্য প্রবল বাধা দিতে লাগিল। জাপানী সৈন্যের সম্মুখে বাধার পর বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। দিবারাত্র যুদ্ধের বিরাম নাই। যুদ্ধের গতি পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ হইতে বুঝিবার উপায় নাই কোন পক্ষের জয় হইবে।

যুদ্ধ যখন চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে সেই সময়ে আই, এন, এ, অধিনায়ক জাপানী সৈন্যের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া বৃটিশ সৈন্য বিভাগের ভারতীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া বলিলেন— "তোমরা কি জন্য যুদ্ধ করিতেছ? তোমরা কি ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছ? আমরা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতা প্রায় করতলগত, আর এই সময়ে ভারতবাসী হইয়া সেই স্বাধীনতার অন্তরায় হইতেছ? ছিঃ! তোমরা মাতৃভূমিকে স্মরণ কর। আজ ভারতের স্বাধীনতায় তোমাদেরও যোগ

দিবার সময় আসিয়াছে। এস তোমরা যোগ দাও। এস সকলে মিলিয়া আমাদের ভারত মাতার উদ্ধার করি। এস...”

এই নায়কের ওজস্বিনী প্রাণস্পর্শী ভাষায় সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া পড়িল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ মুহূর্ত্ত মধ্যে থামিয়া গেল। বন্দুক ও গোলার গর্জ্জন অকস্মাৎ নীরব হইল। তাহার পর সোল্লাস চীৎকার মুহুর্মুহু গগন মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ভারতীয় সৈন্য জাতীয় বাহিনীর সহিত যোগ দিল। জাপানী সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া এই অভিনব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

এতদিনে বীর সাভারকারের ভারতীয় সামরিক নীতি রূপ ধারণ করিল।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়। ইংরাজ কি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল সিঙ্গাপুরের পতন হইবে? সিঙ্গাপুর ছিল ভারতের পূর্ব্ব সীমানার সিংহদ্বার। এই সিঙ্গাপুরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ইংরাজ পঞ্চাশ বৎসরেরও উপর বহু মস্তিস্ক ও অর্থ ব্যয় করিয়াছে। ইংরাজ কোন দিন কল্পণা করে নাই, মাত্র এক ফুৎকারে সিঙ্গাপুরের পতন হইবে। ভারতের ইতিহাসে এই দিনটী অতি শুভদিন। এইদিন ৪৫,০০০ বৃটিশের বেতন ভোগী ভারতীয় সৈন্য মাতৃমন্ত্রে গর্জ্জিয়া উঠে।

আমরা মেজর দীলনের প্রবন্ধে দেখিতে পাই বৃটিশ অধীনে কার্য্য করিবার সময় মোহন সিংহ সংযত জীবন যাপন করিতেন না। পরে দেখিতে পাই তিনি সুভাষ ব্যতীত অপর ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রতি

শ্রদ্ধাহীন, আরও দেখিতে পাই তিনি সহজে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে প্রথমে অস্বীকৃত। আমরা তাহার পরই দেখি, তিনি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বকীয় জীবন বিপন্ন করিয়া সিঙ্গাপুরের রণাঙ্গনের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া মাতৃ সেবার জন্য আকুল কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন এবং সে আহ্বানে সমগ্র ভারতীয় সৈন্য ছুটিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছে। এ আহ্বান পঞ্চ নদীর তীরে গুরু গোবিন্দ সিংহের আহ্বানেরই অনুরূপ। কে সেদিন মোহন সিংহের কণ্ঠে দিল এই অভিনব আকুল-করা ভাষা? কে সেদিন অর্দ্ধ-লক্ষ সুপ্ত ভারতীয় সৈন্যকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিল? আমরা দেখি, বিস্মিত হই, মুহূর্ত্তের জন্য অলক্ষ্য শক্তির নিকটে মাথা নত করি, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সমগ্র বিস্মৃত হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনে নিবিষ্ট হই। ডাকের মত ডাক দিতে পারিলে আজও চল্লিশ কোটী ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়া আত্মাহুতি দিতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব্বে চাই গুরু স্থানীয় নেতৃবর্গের ঐকান্তিক একনিষ্ঠ নিস্কাম সাধনা ও পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি। প্রবাদ বাক্য 'গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, শিষ্য মিলে এক' কথার প্রকৃত অর্থ কেবল একান্ত জিজ্ঞাসু মন ও তপস্যাপরায়ণ শিষ্যেরই অভাব নহে পরন্তু শিষ্যের মঙ্গলেচ্ছু নিস্কাম কর্ম্মবীর গুরুরও অভাব আছে। গুরুর আদর্শ, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও উৎসাহ শিষ্যকে কর্ম্মে ও সাধণায় প্রেরণা না দিলে শিষ্য পথভ্রষ্ট হয়, তাই প্রকৃত গুরু ও একনিষ্ঠ শিষ্য পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

তৃতীয় পর্ব্ব

সর্ব্বাধিনায়ক রাসবিহারী

একদিকে প্রিতম সিংহ নিখিল মালয় আই, আই, এল, পরামর্শ সভা গঠন করিতে তৎপর, অপরদিকে মোহন সিংহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভারতীয় সৈন্য লইয়া আই, এন, এ, কে দৃঢ় করণে ব্যগ্র।

এই সময় টোকিও হইতে তাঁহারা এক অপ্রত্যাশিত তার পাইলেন। এই তারের তাৎপর্য্য—

"শ্রীরাসবিহারী বসু প্রধান সমর কার্য্যালয়ের সহায়তায় সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়দের টোকিওতে স্বাধীনতা সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি শ্যাম ও মালয়স্থ আই, আই, এল, ও আই, এন, একে ১৯শে মার্চের পূর্ব্বে ১০ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কর্ণেল ইয়াকুরো এই ভারতীয় সঙ্ঘের যুদ্ধনীতির পথপ্রদর্শক নিযুক্ত হইলেন।"

মোহন সিংহ এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে বুঝিলেন, তাঁহার অবিসংবাদী কর্তৃত্বে বাধা উপস্থিত এবং সেই বাধা দূরীভুত করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

মার্চের প্রথমদিকে সামরিক ও বেসামরিকদের এক সভা আহুত হয়। মোহন সিংহ একপ্রকার এই সভায় কর্তৃত্ব করেন। এই সভায় রাসবিহারী প্রেরিত নিমন্ত্রণ ও জাপানের সহায়তা

গ্রহণ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইয়া শেষ সিদ্ধান্ত হয় যে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য টোকিওতে এক শুভেচ্ছু-দল পাঠান হউক এবং গিল ও দীলন সাইগনস্থিত জাপানী সামরিক নেতৃবর্গের সহিত স্বতন্ত্র আলোচনা চালান।

প্রিতম সিংহ, গুহ, মেনন, টাগোন, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, আয়ার এই ছয় জন আই, আই. এল, হইতে এবং মোহন সিংহ, আক্রাম খাঁ ও গিল আই, এন, এ, হইতে শুভেচ্ছু-দলে নির্ব্বাচিত হন। ১০ই মার্চ এই দল সাইগন উপস্থিত হয়। এখান হইতে যাত্রার জন্য তুইটী বিমানের ব্যবস্থা হয়। প্রথম বিমানটী ১১ই মার্চ ছাড়ে, দ্বিতীয় বিমান তুইদিন পরে রওনা হয় কিন্তু পথিমধ্যে বিনষ্ট হয়। ফলে, প্রিতম সিংহ, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, আয়ার ও আক্রাম খাঁ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ইঁহারাই আই, এন, এ,র প্রথম শহীদ। ইঁহাদের শেষকৃত্য জাপানে সম্পাদিত হয়। প্রধান মন্ত্রী তোজো ও অন্যান্য মন্ত্রী, ১৫০০ বন্ধুর সহিত শোক-শোভাযাত্রার অনুগমন করেন। ভারতীয় বীর কর্ম্মীদের জগতে এই প্রথম বীরোচিত সম্মান।

হুজিওয়ারা ও ইয়াকুরো টোকিওর প্রধান সামরিক কর্ত্তাদের সহিত তুইদিন ধরিয়া ভারতীয় পরিকল্পনা আলোচনা করেন। প্রধান সামরিক দপ্তর যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা এই আলোচনার ফলে বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয়। ভারত ভারতীয়দের এবং ভারতীয়রা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধ চালিত করিবে এই মূল ভিত্তির উপর পরিকল্পনাটী

প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাই ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম কার্য্যকরী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা জাতীয় ইতিহাসে অতি অমূল্য বস্তু। ইহার মূল সযত্নে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করিবে? অবিলম্বে পরিকল্পনাটী সম্পূর্ণভাবে সাধারণ্যে পরিচিত করা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য।

১৯৪২ সালের ২০শে মার্চ রাসবিহারী ও তাঁহার সহকর্ম্মী-গণকে লইয়া উনো উদ্যানের সেওকিন ভোজনালয়ে এক সভা হয়। এই সভার নেতৃত্ব করেন টোয়ামা, কান্নো, টানাবে, টুকুডা, মিডুনা, মিয়াকাওয়া, ওহকাওয়া ও কুজু। এই সভার সভ্য ছিলেন ৩৬৯ জন বিশিষ্ট জাপানী। প্রায় ৮০০ জাপানী এই সভায় যোগদান করেন। এই সভায় ২৭ বৎসর নির্ব্বাসনের পর এই প্রথম রাসবিহারী জাপানী জনসাধারণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইলেন। ২২ জন ভারতীয় প্রতিনিধিও এই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

২৮শে মার্চ ১৯৪২ সালে প্রবাসী ১৮ জন প্রতিনিধি লইয়া টোকিওর সান্নও ভোজনালয়ে সরকারীভাবে ভারত-স্বাধীনতা সঙ্ঘের গুপ্ত অধিবেশন বসিল। সভার প্রারম্ভিক উৎসবের সময় হুজিওয়ারা ও ইয়াকুরো উপস্থিত ছিলেন; পরে আর কোন জাপানীকে এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই।

এই সভায় রাসবিহারী সভাপতিত্ব করেন। সভায় তুমুল তর্ক ও বাদানুবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে সকলেই আই, আই, এল, কে (Indian Independence League) প্রবাসী ভারতীয়দের একমাত্র স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠান ও রাসবিহারীকে

তাহার সভাপতি বলিয়া স্বীকার করেন। এই অধিবেশনে স্থির হইল, ব্যংককে অবস্থিত আই, আই, এল, এর কর্ম্মসূচী ও কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া পরদিন আলোচনা হইবে।

একদিকে রাসবিহারী ও তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ, অপর-দিকে ব্যংককের আই, আই, এল, ও আই, এন, এ, । দুই পক্ষের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। মোহন সিংহ স্বীয় প্রাধান্যের জন্য পুনঃ পুনঃ বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাসবিহারীর পক্ষ জয়ী হইল ও সকলে রাসবিহারীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। সকলে রাসবিহারীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ণ উদ্যমে চালিত করিতে সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

মোহন সিংহ পরাজিত হইয়াও প্রাধান্যের জন্য ভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুভেচ্ছ-দলের প্রত্যাবর্ত্তনের পর বেসামরিক ভারতীয়রা পৃথক পৃথক ভাবে মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন। অনেকেই এই পৃথক মন্ত্রণা সভা আহ্বানের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

সিঙ্গাপুরস্থ বিদাদরীতে সামরিক নায়কদের যে সভা হয় তাহাতেও তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়। তর্কান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি গ্রহণ করা হয়।

(১) ভারতের স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

(২) সর্ব্বপ্রথম আমরা ভারতীয় এবং সর্ব্বশেষ আমরা ভারতীয়।

(৩) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইবে। এই সৈন্যবাহিনী কেবল ভারতীয় কংগ্রেসের নির্দ্দেশ এবং ভারতবাসীর আহ্বানে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে।

(৪) যতদিন না ভারত হইতে সে নির্দ্দেশ বা আহ্বান আসে, ততদিন আমরা নিজেদের যোগ্যতর করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিব।

উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি সকল সৈন্যের মধ্যে প্রচারিত করা হইল। যাহারা সঙ্কল্পগুলি স্বীকার করিয়া লইল, তাহাদেরই সৈন্য বিভাগে গ্রহণ করা হইল।

মোহন সিংহের বন্ধু ও ভক্ত দীলন লিখিয়াছেন—"যাহারা স্বীকৃতি দিল না, জাপানীরা তাহাদের মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। মোহন সিংহ কি করিবেন? তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ।"

আমরা পরে দেখিব, মোহন সিংহের শক্তি শুধু সীমাবদ্ধ নয়, তাঁহার দৃষ্টি-পরিধি অতীব ক্ষুদ্র ও তাঁহার হৃদয় অতি সঙ্কীর্ণ।

জাতীয় নেতৃস্থানীয় মহাশয়গণ যতদিন না স্ব স্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসাধারণকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ হৃদয় পরিত্যাগ করিতে শিখাইবেন, ততদিন দেশের বৃহৎ কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইবে, পণ্ড হইবে।

ব্যংকক যাত্রার পূর্ব্বে রাসবিহারীর পরিবারবর্গের সহিত মিলন।

ব্যংককে সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়দের মহাসম্মেলন হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে। রাসবিহারী ব্যংকক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাসবিহারীর শ্বশুর-মহাশয় রাসবিহারীকে বিদায় অভিনন্দন জানাইবার জন্য নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তোষিকোর মৃত্যুর পর শ্রীমতী সোমার স্নেহাঞ্চলের নিম্নে রাসবিহারীর পুত্র মাসাহিদে ও কন্যা তেতুকু পালিত হইতেছিল ইহাদেরই ভারতীয় আদর্শে প্রতিপালন করিবার জন্য রাসবিহারী একবার বাঙ্গালী বর্ষিয়সী মহিলার সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শ্রীমতী সোমার হাতে ইহাদের ভার সম্পূর্ণ সমর্পণ করেন। আর কোনদিন এই পুত্র কন্যার জন্য তাঁহাকে কোনরূপ উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় নাই।

মাসাহিদে সবেমাত্র ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধিলাভ করিয়াছে, তেতুকু কৈশোরে পদার্পন করিয়াছে।

রাসবিহারী নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ম্রিয়মান। সকলেই মনে মনে এক গভীর বেদনা অনুভব করিতেছেন এই বিদায়ক্ষণে। সকলেরই মনে এক অনিশ্চিত ভয়—হয়ত এই শেষ মিলন, এই শেষ বিদায়। কিন্তু রাসবিহারীর মুখমণ্ডল আনন্দোদ্ভাসিত, তাঁহার কণ্ঠস্বরে মধুর অমৃত ধারা। কতদিন পরে বাল্যের স্বপ্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে চলিয়াছে!

"তোমার যদি আমাদের কিছু বলিবার·· ··················"
শ্রীমতী সোমার শান্ত কণ্ঠস্বর উদ্বেলিত হইয়া মধ্য পথে হারাইয়া গেল।

রাসবিহারীর ত্বরিত উত্তর আসিল "মা, আপনি ত জানেন আমার উদ্বিগ্ন হইবার কথা নয়—"রাসবিহারী নীরব হইলেন। কিন্তু ক্ষণ পরেই বলিলেন, "শুধু তেতুকুর বিয়ে। আমার ইচ্ছা নয় সে ধনীর বধু হউক অথবা ঐহিক সুখ সম্পদের অধিকারিণী হউক।······আমার ইচ্ছা, সে যেন আধ্যাত্মিক সুখের ভাগিনী হয়।······আর মাসাহিদে ? সে পুরুষ, সে নিজের জীবন গড়ে নিতে পার্ব্বে।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই বিদায় লইবার জন্য রাসবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন—"আমাকে বিদায় দিবার জন্য আমার সঙ্গে আসবার কারো আবশ্যক নাই। মাসাহিদে এবং তেতুকু তোমরা বাড়ীতে থাক। আচ্ছা, এই বার আমি চলি।"

মাসাহিদে এই একবার পিতার অবাধ্য হয়। বাড়ী হইতে পলাইয়া টোকিও ষ্টেশনে পিতাকে বিদায় জ্ঞাপন করে। সেদিন কি রাসবিহারী জানিতেন যে তাঁহার পুত্রের সহিত এই শেষ সাক্ষাৎ ? তিনি কি জানিতেন তোষিকোর গচ্ছিত ধনকে, তোষিকোর এই স্মৃতিকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলিবেন ? মাসাহিদে কি জানিত, আজিকার বিদায় এই শেষ বিদায় ?

রাসবিহারী ভারতীয় ভাষা পুত্রকে শিখাইতে পারেন নাই সত্য,

কিন্তু ভারতের কাহিনী তিনি পুত্র কন্যাকে যখনই সুবিধা পাইতেন তখনই শুনাইতেন। ইহাদেরই জন্য তিনি জাপানী ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি ইহা সমগ্র জাপানী জাতিকে উপহার দিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র কন্যা ভারতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল এবং ভারতকে পিতৃভূমি জ্ঞানে পূজা করিত। মাসাহিদে বাল্য হইতেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য পিতাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া মনে মনে বলিত "আমিও একদিন পিতার সহিত একযোগে ভারত স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিব।"

ব্যাংকক মহাসম্মেলন

২৯শে এপ্রিল রাসবিহারী বন্ধুবর্গসহ ব্যাংককে উপস্থিত হইয়াই মহাসম্মেলনের কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন।

১৫ই মে ১৯৪২ সালে প্রাতে নয় ঘটিকার সময় ২০০ ভারতীয় লইয়া সভার প্রথম অধিবেশন হইল। জাপান, জার্ম্মানী ও ইতালীর রাজদূতগণ ও শ্যাম রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী অতিথিরূপে এই অধিবেশনে যোগ দিলেন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' গাহিয়া সভার উদ্বোধন হইল।

ধন্য বঙ্কিম! এতদিনে তোমার 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সঞ্জীবতা লাভ করিল!

যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মবলি দিয়াছেন, '

তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সকল শহীদের আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইল।

ইহার পর শ্যাম রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বাণী শ্যামরাজ্যের বৈদেশিক উপমন্ত্রী পাঠ করিলেন। শ্যাম-নিবাসী ভারতীয়দের সভাপতি শ্রী দাস অভিনন্দন ভাষণ পাঠ করিলেন। অতঃপর রাসবিহারী ধীরে ধীরে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উদাত্ত স্বর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার আকুল আহ্বান সকলকে চঞ্চল করিল। রাসবিহারী বলিলেন—

"১৯৩৯ সাল হইতে ইংরাজরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ অবিরাম যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে মহাযুদ্ধ ঘোষণা হইবার পর হইতেই ইংরাজ আমাদের সহায়তা লাভের জন্য নানাপ্রকার কৌশল করিতেছে ও নানাপ্রকার প্রতারণা পূর্ণ প্রস্তাব করিতেছে। আমাদের ভারতীয় নেতৃগণ প্রতারণাপূর্ণ প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যুদ্ধ-বৃত্তের পরিধির বাহিরে ভারতকে রক্ষা করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

জাপান যে দিন ইঙ্গমার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, সে দিন কি একজনও ভারতীয় ছিল যে এই যুদ্ধ ঘোষণা সংবাদে আনন্দিত হয় নাই ?

আজ আর আমাদের বসিয়া কেবল তর্ক বা আলোচনা করিবার সময় নাই। ভাই সব ! এস আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হই। বিশ বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী যে নির্ভীক যুদ্ধ চালনা

করিতেছেন, আজ তাহার ফল আহরণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে। এস আমরা অগ্রসর হই। আমরা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বহু বক্তৃতা শুনিয়াছি। আর নয়! সত্যই আর অর্থহীন তর্ক বিতর্ক করিবার সময় নাই।

হে বন্ধুগণ! আমি সকলকে সনির্ব্বন্ধ আন্তরিক অনুরোধ করিতেছি যে, এই সভা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা যেন কার্য্যোপযোগী পন্থা নির্ণয় করিতে পারি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাধীনতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারি।

রাসবিহারী উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "আপনারা সকলে বিচার করিয়া কার্য্যপ্রণালী প্রস্তুত করুন। আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আপনাদের আহ্বান করিতেছি, আপনারা অবিলম্বে কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হউন।"

সভায় জাপানের ভারতীয় প্রতিনিধি, মালয় প্রতিনিধি রাঘবন, আই এন, এ, প্রতিনিধি মোহন সিংহ এবং গিল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন রাজদূতের ও জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হইল। তাহার পর রোমের ভারতীয় বন্ধুদের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের বাণী পঠিত হইল।

সকলের শেষে শ্রী সুভাষচন্দ্রের বাণী। সুভাষ বলিয়াছেন—

"আমি শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে ভারতের বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ রাসবিহারী বসু তাঁহার সহ-কর্ম্মীদের লইয়া এক্ষণে স্বাধীনতা সংগ্রাম সঙ্ঘের সাধারণ সভা পরিচালিত করিতেছেন।

আমি ইউরোপের আই, আই, এল, পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাইতেছি।

গত কয়েক মাস ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, জাপান, জার্ম্মানী এবং ইতালী আমাদের বন্ধু। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আমাদেরই অর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা, যাঁহারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মাত্র প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া আছি, তাঁহাদেরই অস্ত্র হস্তে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা কাহারও বিরুদ্ধতা মানিব না।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এই যুদ্ধে ভারত তাহার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবে। স্বাধীনতা বলিতে ইঙ্গমার্কিনকে ভারত হইতে বিতাড়িত করা। জাপানেরও সেই উদ্দেশ্য।

আমি প্রার্থনা করি, এই সভা সাফল্য মণ্ডিত হউক এবং আমি বিশ্বাস করি, এই পথেই আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত।"

এই মহাসম্মেলনে ২০ লক্ষেরও অধিক ভারতীয় একত্রিত হইয়া ১৫০ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। দীর্ঘ পরাধীনতার মধ্যে আশার আলোকোচ্ছ্বাস দেখিতে পাইয়া সকলের মুখে দিব্যজ্যোতিঃ। এতদিনে বুঝি দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন হইবে! সকলের মুখে—

"বল, বল, বল সবে ভারত আবার স্বাধীন হবে,
জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

সেদিন কবে, কতদূরে? আশা কুহকিনী কাণে কাণে চুপে চুপে কহে "আর দেরী নাই! আর দূরে নয়!"

সাধারণ সভার অধিবেশন হয় ১৫ই মে প্রভাত নয় ঘটিকার সময়। সেই দিনই অপরাহ্নে ১৯৪০ সালে টোকিওতে গৃহীত প্রস্তাবের সমর্থন করা হয়। প্রস্তাবটী :

"ভারতকে যুদ্ধ পরিধি হইতে দূরে রাখিবার একমাত্র উপায়, অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা ও ইংরাজের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করা।"

স্থিরীকৃত হইল যে, কাউন্সিল অব একসন (কর্ম্ম-পরিষদ) ভারতবর্ষে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিবে যে, ভারতীয় সৈন্য ও জনসাধারণ বিপ্লবী হইয়া উঠিবে এবং এই কাউন্সিল অব একসন ভারতের জনসাধারণের বিপ্লবে যোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার পরই সমর-অভিযান সমর্থন করিবে। স্বীকৃত হইল—

১। ঐক্য, বিশ্বাস ও আত্মাহুতিই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র।

২। সমগ্র ভারত এক। ইহা কোনক্রমেই বিভক্ত হইতে পারে না।

৩। সমগ্র কার্য্য-প্রণালী জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

৪। ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী ভারতের জনসাধারণ নির্দ্ধারণ করিবে।

(ক) ভারতের জাতীয় বাহিনীর সকল নায়ক এবং সৈনিক ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের আনুগত্য স্বীকার করিবে।

(খ) ভারতের জাতীয় বাহিনী কর্ম্মপরিষদের অধীনে থাকিবে ও এই পরিষদের আদেশ অনুসারে প্রধান সমর-অধিনায়ক দ্বারা গঠিত ও চালিত হইবে।

ইহার পর ৪৭ জন প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় সমিতি ও ১৫ জন প্রতিনিধি লইয়া এক শাখা সমিতি গঠিত হয়।

১৫ই মে হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত গোপন পরামর্শ সভা চলিতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার জটিল প্রশ্নগুলির কার্য্যকরী মীমাংসার জন্য দশটী গুপ্ত অধিবেশন হয়। প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই গুপ্ত অধিবেশন চলিতে থাকে। প্রত্যেক প্রশ্নটীকে সকল দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

অষ্টম দিনে বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় ওরিয়েণ্টাল হোটেলে সভার পুনরাধিবেশন হয়। কার্য্য-সমিতির (Executive Committee) সদস্য নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইল। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে রাসবিহারী, মোহন সিংহ, গিলানী, রাঘবন, মেনন কার্য্য-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। রাসবিহারী এই সমিতির সভাপতি হইলেন।

নবম দিনে 'রয়াল সিলভারকোরা' হোটেলে সাধারণ সভার পুনরাধিবেশন হয়। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের সহিত সভার উদ্বোধন হইল। সভাস্থ সকলেই এই সঙ্গীতে যোগদান করিলেন। পরে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করা হইল। রাসবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সকলে আনন্দ অভিবাদন জানাইল। রাসবিহারীর কণ্ঠধ্বনি সভা কম্পিত করিয়া বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল—

"আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু ভারতবর্ষকে ইংরাজের লৌহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় নাই, পরন্তু যে ইংরাজ জাতি কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া নিজ ঐহিক স্বার্থের জন্য জগতের বিভিন্ন জাতিকে অবিরত ধর্ষণ করিয়াছে, যথেচ্ছভাবে উৎপীড়ন করিয়াছে, সেই ইংরাজ জাতির বিষদন্ত উৎপাটিত করিবার জন্যই সূচিত হইয়াছে।

এই সত্য পালন করিবার জন্য আমাদের সমিতি ৩০টীরও অধিক সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। কাগজের পৃষ্ঠার উপর সঙ্কল্প-গুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। কার্য্যে পরিণত না করা পর্য্যন্ত বিশ্রামের সময় নাই,—শ্বাস গ্রহণের অবসর নাই। আর বৃথা বাক্য ব্যয় নয়—চাই কাজ, কেবল কাজ। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ। কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি করে এরূপ কোন প্রস্তাব এখন উত্থাপন করিবার সময় নাই। আমাদের আদর্শ—ঐক্য, বিশ্বাস এবং আত্মোৎসর্গ। এই তিন মন্ত্রে আমরা ৩৫ কোটী ভারতীয় দীক্ষিত। এই তিন মন্ত্রের উপর আমাদের ভিত্তি। মন্ত্রের সাধন কিংবা মৃত্যুবরণ।"

মুহূর্মুহুঃ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমগ্র বাটী থরথর কাঁপিয়া উঠিল।

এই মহাসভা ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত করিল। সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া হইতে ৪০ জন সভ্য ও আজাদ হিন্দ ফৌজ হইতে ৪০ জন সভ্য লইয়া প্রতিনিধি সমিতি গঠিত হইল। ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় ব্যংককে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যালয় সিঙ্গাপুরে স্থাপিত হইল।

এই দুই কার্য্যালয়ের দূরত্ব মোহন সিংহের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ভবিষ্যৎ কালে বড়ই উপযোগী হয়।

এই মহাসভায় যে সব বিপ্লবী-প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

এ, এম, সহায় (আনন্দমোহন সহায়), বিহার—ভারত সরকার কর্তৃক নির্ব্বাসিত। ইনি ভারত হইতে আমেরিকা যাইবার পথে কোবে অবতরণ করেন এবং সেইখানে থাকিয়া ভারত-স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, পরে রাসবিহারীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন।

রাঘবন্ (মাদ্রাজ)—তখন ইহার বয়স অনুমান ৪৩ বৎসর। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পাইয়া পেনাংএ ওকালতি করিতে থাকেন। পরে ভারতীয় কৃষকদের পক্ষ লইয়া বৃটিশ সরকারের সহিত যুদ্ধে অবতরণ করেন।

এ, এম, নায়ার (মাদ্রাজ)—অনুমান বয়স ২৬ বৎসর। কিওটো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। পরে ইনি মাঞ্চুকো রাজধানীতে উপস্থিত হন ও তথাকার ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

স্বামী সত্যানন্দ পুরী—ব্যংকক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিপ্লব বিজ্ঞানে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন।

প্রিতম সিংহ—ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘের ব্যংককস্থিত নেতা।

দাস—কোবেতে সহায়ের সহকারী ছিলেন। পরে তিনি স্বামীর সহিত একযোগে কার্য্য করেন। বৃটিশ চাপের বিরুদ্ধে শ্যামবাসী ৩০,০০০ ভারতীয়ের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তুমুল আন্দোলন করেন।

শিলাপ্পন (ত্রিবাঙ্কুর)—ব্যংকক সংবাদ পত্রের একজন সাংবাদিক।

ওসমান—সাংহাইতে নির্ব্বাসিত ভারতীয় ব্যবসায়ী।

রতিয়া (বম্বে)—রেঙ্গুন সংবাদ পত্রের সম্পাদক। ইঁহার বয়স তখন ৬৪ বৎসর। ২০ বৎসর অবিরত ইনি বিপ্লব কার্য্য চালনা করেন। দুইবার কারাবাস করেন।

খাঁ (পাঞ্জাব)—বয়স অনুমান ৩৬ বৎসর। ১০ বৎসর ইনি হংকংকে থাকিয়া ৯০০০ ভারতীয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন।

হাক্ (দিল্লী)—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। ইণ্ডোনেশিয়ায় ১২০০ ভারতীয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

জৈন (পাঞ্জাব)—বয়স অনুমান ৩৬। খালসা লিংসার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। ম্যানিলা সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক।

মোহন সিংহ—ভারতীয় সৈন্য বিভাগের জনৈক ক্যাপ্টেন। ইনিই আই, এন, এর প্রথম সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইংরাজ সৈন্য জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণের সময় ইনিও আত্মসমর্পণ করেন।

আমরা উপরিউক্ত পরিচয়-পত্র হইতে দেখিতে পাই প্রায় সকলেই বিপ্লব-ক্ষেত্রের সহিত বহুদিন হইতে পরিচিত। কেবল মোহন সিংহ নূতন। সিঙ্গাপুরের অসম সাহসিক কার্য্যের জন্য ইনি জনপ্রিয় হইয়া ছিলেন। দীলন লিখিয়াছেন, মহাসম্মেলনে ইনি ওজস্বিনী ভাষায় সাতঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করেন। ইঁহার ভাষা ও ভাব-ব্যঞ্জনা লোককে মুগ্ধ করে। যদি দীলনের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ইনি একজন বাগ্মী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৯৪২ সাল

জাপানী সৈন্য মাত্র দুই মাসের মধ্যে রেঙ্গুন আক্রমণ করিয়া লাসিও, রেঙ্গুণ, মান্দালয় প্রভৃতি অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইংরাজ পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া যতই বিপর্য্যস্ত হইতেছে, ততই ভারতীয় প্রজার উপর পীড়ন বর্দ্ধিত করিতেছে।

এ মহাযুদ্ধে ভারত অংশ গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ভারতের চারিদিকে অন্নকষ্ট। দুর্ভিক্ষ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বম্বেতে গান্ধীজী জনসাধারণের নিকট ত্বরিত প্রতিবিধানের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

এই সময়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ডাঃ সীতারামাইয়া লিখিয়াছেন—

"১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সহসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইল। ভারতের এই যুদ্ধের সহিত কোনপ্রকার সংস্রব না থাকিলেও, ইংরাজ ভারতকে এই যুদ্ধের ঘূর্ণিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কংগ্রেস যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। ইংরাজ লজ্জা-জড়িত ভাবে উত্তর দিল—"যুদ্ধ, যুদ্ধ। যুদ্ধের আবার উদ্দেশ্য কি?" যুদ্ধের কোন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে সে উদ্দেশ্য যে ভারতের পক্ষেও প্রযোজ্য তাহা ইংরাজের অবিদিত ছিল না, কাজেই উদ্দেশ্যের কথা ইংরাজ চাপিয়া গেল।"

ক্রীপ্সের প্রস্তাব কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু ক্রীপ্স ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিবার বীজ রোপন করিয়া গেলেন। পরে তাহাই হিন্দুস্থান পাকিস্থানে পরিণত হয়।

কংগ্রেস কার্য্য-নিয়ন্ত্রণ সভা কর্ত্তৃক ক্রীপ্স-প্রত্যাখ্যান-পত্রের মসী তখনও শুষ্ক হয় নাই, মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারকে ভারত পরিত্যাগ করিবার বাণী শুনাইয়া দিলেন। এই সময়ে 'ক্রীপ্স মিশন'কে অনেকেই 'গ্রিপ্স মিশন' আখ্যা দেন।

৮ই আগষ্ট মহাত্মা "ভারত পরিত্যাগ কর" যুদ্ধবাণী ঘোষণা করিলেন। পরদিন প্রভাতেই গান্ধীজী, নেহেরু, আজাদ, পেটেল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মুক্ত গান্ধী অপেক্ষা বন্দী গান্ধী ভীষণ হইয়া উঠিল। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করিতে লাগিল। ইংরাজও ক্ষিপ্ত হইয়া মেসিনগান ও বোমার আশ্রয়

গ্রহণ করিল। যতই জনসাধারণের উপর চাপ পড়িতে লাগিল, বিদ্রোহাগ্নি ততই প্রবল হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ভারতের বাহিরে শত্রু, ভিতরে তীব্র বিদ্রোহ, ইংরাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া, অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। খাদ্য, শস্য, বস্ত্র সহসা অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ফলে চারিদিকে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

স্বদেশের সমগ্র-দেশ-ব্যাপ্ত বিদ্রোহ সংবাদ ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজে পৌঁছিল। চারিদিকে উত্তেজনা সৃষ্টি করিল। ভারতীয়দের বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টার প্রশংসা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

গান্ধীজী এই সকল পরিস্থিতি অতি তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি সমগ্র ঘটনা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াই, সাফল্য সম্বন্ধে একপ্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়াই যুদ্ধের বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজকে ভারত পরিত্যাগ করিবার বাণী শুনাইয়াছিলেন। পশ্চিমে ক্রমাগত পরাজিত হইয়া ইংরাজ মিত্রশক্তি পশ্চাৎ হটিতেছিল, পূর্ব্বে জাপান বর্ম্মা অধিকার করিয়া আসামের দ্বারে আঘাত করিতেছিল, পশ্চিমে সুভাষচন্দ্র জার্ম্মাণ হস্তে পতিত ভারতীয় সৈন্য লইয়া ভারতীয় বাহিনী গঠনে তৎপর, পূর্ব্বে বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ রাসবিহারীর নায়কত্বে ভারতীয় বাহিনী তৎপর গড়িয়া উঠিতেছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয় দিক হইতে আক্রমণ এবং ভারতের অভ্যন্তরে তীব্র বিপ্লব বিদ্রোহ। এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলে, পুনঃ

সুযোগের সম্ভাবনা কোথায়? রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মাজী এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাই তিনি যুদ্ধের ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করিলেন।

সবই ঠিক। কিন্তু সহসা আই, এন, এ, তে ভাঙ্গন ধরিল! ভারতের ভাগ্যবিধাতা ক্রূর হাসি হাসিলেন।

রাসবিহারী আই, আই, এল, গঠন ও পরিচালনা লইয়া ব্যস্ত, কাজেই মোহন সিংহের উপর আই, এন, এর সকল ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ব্যংকক হইতে সুদূর সিঙ্গাপুরে মোহন সিংহের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখা অসম্ভব। সামান্য ক্যাপ্টেন হইতে সহসা প্রভূত ক্ষমতা পাইয়া মোহন সিংহ আরও ক্ষমতা-লোভী হইয়া উঠিলেন। মোহন সিংহের চরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা এইখানে মেজর বীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত "মুক্তি সেনার ডায়রী" হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিব।

১। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ :—শোনা গেল অল ইণ্ডিয়ান 'পি-ও-ডাবলিউ' দের একত্রিত করে বৃটিশ পক্ষ থেকে কর্ণেল হাণ্ট সকলকে জাপানীদের হাতে সঁপে দিলেন। জানা গেল, এখন থেকে জাপানীদের হুকুম মেনে চলতে হবে। জাপানীদের পক্ষ থেকে মেজর ফুজিওয়ারা জানালেন যে তাঁদের গভর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থানীদের কয়েদ করে রাখতে চায় না।.........সকলকে কিছু কিছু কাজ কর্ত্তে হবে। আমাদের ভার দেওয়া হ'ল ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর উপর। মোহন সিং মালয় দেশের যুদ্ধে বৃটিশ যে বাহাদুরী দেখিয়েছে তা' বললেন, তারপর জানালেন যে জাপানীরা ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবে

ঠিক করেছে—তারা কি এই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে চায়?.........
আমি সে মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু সবই শুনলাম। শুনে মনে হলো একি থিয়েটার হচ্ছে না কি?

২। এপ্রিল ১৯৪২।—সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে ঘোষণা করিলেন "আমি ঠিক সময় ভারতের সীমানায় পৌঁছে যাব। যে শক্তি আমার ভারতবর্ষ থেকে বাহিরে যাওয়া আটকাতে পারে নি, সে শক্তি আমাকে ভারতবর্ষের মধ্যে যেতেও আটকাতে পারে না।" আমার মনে হ'ল আমরা আই, এন, এ, তৈরী করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের এদিকে আসবেন। আর একমাত্র তিনিই আই, এন, একে ভারতবর্ষের ভেতরে যাওয়ার আদেশ দিতে পারেন।

৩। ১৫ই জুন ৪২।—মালয়, বর্ম্মা, থাই, জাভা, ফিলিপাইন, হংকং, চীন প্রভৃতি যায়গা থেকে আই, আই, এলের প্রতিনিধিরা ব্যাংককে একত্রিত হয়েছেন—পূর্ব্ব এশিয়া থেকে ভারতবর্ষের যুদ্ধ কি করে চালানো যেতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। মিলিটারি থেকে অনেক অফিসার ইহাতে যোগদান করেন। তাঁরা ফিরে এসে যা জানালেন তা মোটামুটি এই রকম:—

*   *   *   *   *

৪। রাসবিহারী বসু ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে আই, এন, এর জি, ও, সি নিযুক্ত করেছেন।

*   *   *   *   *

ঘোষণা পত্র সহি করবার সময় আমাদের কর্ত্তৃপক্ষকে আমি এই কথা বলি যে ঘোষণা পত্রে "মোহন সিংএর নেতৃত্বে" এই কথাটুকু না থাকলে যেন ভাল হতো। কারণ মোহন সিংকে চিনি না বরং কর্ত্তৃপক্ষ সম্বন্ধে আমার

জানা আছে বেশী। তিনি **মোহন সিংএর সাধুতা দেখে** বোধ হয় একটুও সন্দেহ কর্ত্তে পারেন নি।

* * * * *

তখন কে জানতো যে মোহনসিং নিজের স্বার্থ সামান্য হানি হবার ভয়ে আই, এন, এ ভেঙ্গে দেবেন আর **রাসবিহারী বোস আবার এই অফিসারটীকে নিয়ে আই, এন, এ গড়ে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা** কর্ব্বেন।

৫। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪২।— * * *

মাসে একবার করে আমাদের গান্ধী ব্রিগেডের অফিসারদের দরবার হতো। তাতে রেজিমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হতো। নিজেদের আদর্শস্বরূপ গোটা তিনেক কথা আলোচনা করা হতো। (১) আমরা সকলে হিন্দুস্থানী (২) আমাদের কাজ হচ্ছে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা (৩) আমাদের নেতা মোহন সিং। (ক) এই তৃতীয় কথাটা আমার তেমন ভাল লাগত না। এটা কি তাঁরা **আই, এন, এর স্রষ্টা রাসবিহারী বোসকে** বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছেন না বলে বলেন, না মিলিটারি আদেশ যাতে সবাই ঠিক ঠিক মত মানে সেই জন্য ?

* * * *

হঠাৎ খবর এলো, কর্ণেল গিলকে জাপানীরা অ্যারেষ্ট করেছে। তাঁর সঙ্গে যে অফিসাররা কাজ কর্চ্ছিল তাদের মধ্যে দু'জন আই, এন, এর কাগজপত্র নিয়ে বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়েছে, জাপানীরা সন্দেহ করে কর্ণেল গিলেরও এর মধ্যে হাত আছে। মোহন সিংএর সঙ্গেও গোলমাল চলছে।

নভেম্বর ১৯৪২।—মোহন সিংএর কাজ কর্ব্বার শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর সততাকে কেউ কখনও সন্দেহ করেনি।............................

চল্লিশ হাজার লোক ভলেণ্টিয়ার হয়েছিল। কিন্তু মোট ১৫ হাজার লোক

তিনি আর্মিতে নিতে সক্ষম হয়েছেন। বাকি লোকদের তিনি কি বলেন? তাঁর উপর আবার এক কাউন্সিল অব এ্যাকসন ও একজন প্রেসিডেণ্ট কেন? এসব বোধ হয় তাঁর ও তাঁর মন্ত্রণাদাতাদের পছন্দ হচ্ছিল না। এমন সময় মোহন সিংহকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তিনি কাউন্সিল অব এ্যাকসনের বিনা অনুমতিতে জাপানীদের সঙ্গে ঠিক করে আই, এন, এর কিছু সিপাইকে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়েছেন কেন? তাঁর একাধিপত্যের উপর বাধা পড়ায় তিনি উল্টো চাপ দিলেন রাসবিহারী বোসের উপর। তিনি তাঁকে (রাসবিহারী বোসকে) জানালেন যে জাপানীরা আর্মি বাড়ানোর অনুমতি ও আর্মিকে এক্ষুনি মেনে নিয়ে ঘোষণা না কল্লে´ তিনি তাঁর আই, এন, এ ভেঙ্গে দেবেন। **তাঁর আই, এন, এ?** কথাটা শুনে রাসবিহারী বোস একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন—**আর্মি কখনও কারও নিজস্ব সম্পত্তি হয় না, দেশেরই হয়।** মোহন সিং তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি সেটাকে নিজের আর্মি কর্ত্তে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যে ঘোষণাপত্র সই করেছিলাম তাই দেখিয়ে তিনি জানান যে আই, এন, এর সিপাহীরা তাঁর নীচে কাজ কর্ব্বে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; তিনি আই, এন, এতে নেই কাজেই আই, এন, এর কেউই তাতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ইস্তাহার চিঠিও দিলেন। রাসবিহারী বোস তাকে জিনিষটা একবার ভেবে দেখতে বললেন, ও জানালেন পরের দিন স্থির মস্তিষ্কে এলে পুনরায় আলোচনা হবে। মোহন সিং তার কথা না শুনে জাপানীদের জানালেন তিনি ও **তাঁর আই, এন, এ,** জাপানীদের বিশ্বাস করে না।.................................ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সের ওপর এক বোমা ফেলে মোহন সিং সরে পড়লেন, তাঁর রাজত্বও শেষ হ'ল।..............

যাই হক তাই বলে আমাদের কেউই আই, এন, এ ভেঙ্গে দেবার পক্ষপাতী ছিল না। তিনি এবং অন্যান্য যে সব লোক সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁরা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারেন, কিন্তু জাতীয় পতাকা, ব্যাজ-ট্যাজ ও কাগজপত্র জ্বালিয়ে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলেন তা' কখনই ভোলা যাবে না।

আমরা মেজর রায়ের দিনপঞ্জী দেখিলাম; এসব লজ্জাকর জাতীয় দুর্ব্বলতা ও নীচতার কথা গোপন করাই উচিত। কিন্তু আমরা রাসবিহারীর জীবনী ও চরিত্র-কথা লিখিতে বসিয়া তাঁহার চরিত্র, কর্ম্মশক্তি ও সততার উপর মোহন সিংহ ও তাহার বন্ধুবর্গ দ্বারা যে কলঙ্ক লেপনের প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার বিচার ও উল্লেখ করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। "আজাদ হিন্দ" নামক পুস্তক-প্রণেতা এই সব কাহিণীর উপর বিশ্বাস করিয়া রাসবিহারীকে জাপানের গুপ্তচর ও এমন কি তিনি সুভাষচন্দ্রকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। দীলন, শাহনওয়াজ, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' লেখকের লিখিত পুস্তক, ডাক্তার অশোয়া, সতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির পুস্তক বা প্রবন্ধ দেখিয়াছি। শাহনওয়াজ রাসবিহারী সম্বন্ধে একটা জনরবের কথা অতি সংযতভাবে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু দীলন ও "আজাদ হিন্দ" লেখক একই সুরে কথা কহিয়াছেন। তাঁহারা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই যে বর্ম্মা ও মালয় তখন জাপান অধিকৃত এবং সুভাষচন্দ্রের নিধনই যদি জাপানের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে জাপান সরকারকে বিশেষ কষ্ট

স্বীকার করিতে হইত না। যদি রাসবিহারী ঈর্ষা পরবশ বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুভাষকে নিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এই কথাই বক্তব্য হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, যখন এই সকল গুজব রটনা হইতেছিল রাসবিহারী তখন টোকিওতে এবং আই, এন, এর জন্য জাপান সমর-বিভাগের সহিত আলোচনায় ব্যস্ত।

যাহা হউক, লাহোর বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছিল দীননাথ নামক একজন পাঞ্জাবী যুবকের শেষমুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকার ফলে। আজ আর একজন পাঞ্জাবী যুবকের অপরিণামদর্শিতা, স্বার্থপরতা ও বিরুদ্ধতা আই, এন, একে নিষ্ফলতার মুখে ঠেলিয়া দিল। রাসবিহারী দুই দুইবার একই স্থান হইতে আঘাত পাইলেন। যেদিন আই, এন, একে মোহন সিংহ ধাক্কা দিয়া অতল জলে নিমজ্জিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন সেদিন কি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার স্বার্থচালিত দেশদ্রোহী-কুকার্য্য পাঞ্জাবী চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করিল, তাহার কালিমা ধৌত করিতে ভবিষ্যৎ পাঞ্জাবী সন্তানদের কত জন্ম তপস্যা করিতে হইবে! অথচ ইনি লোক-সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন, যে ইনি কর্ত্তার সিংহের শিষ্য! শিষ্য কি নিষ্ঠুরভাবে গুরু চরিত্রে কালিমা লেপন করে!

আমরা যদি পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখি, দেখিব, যেদিন রাসবিহারীর নিকট হইতে ব্যাংককে প্রথম প্রতিনিধি প্রেরণের বার্ত্তা পৌছিল, সেই দিন হইতে মোহন সিংহ রাসবিহারীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছেন।

প্রথমে মোহন সিংহের চেষ্টায় প্রতিনিধি দল না পাঠাইয়া শুভেচ্ছ-দল প্রেরিত হইল, পরে সাইগনস্থিত জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত স্বতন্ত্র আলোচনার ব্যবস্থা হইল। তিনিই জাপানে রাসবিহারীর বিরোধীদলের স্রষ্টা। সেখানে পরাস্ত হইয়া স্বতন্ত্র সামরিক সভা আহ্বান ও প্রত্যেক সৈন্যের নিকট নিজনামে আনুগত্য স্বীকৃতি গ্রহণ তাঁহারই কীর্ত্তি। আবার সাধারণ সম্মেলনে রাসবিহারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য তাঁহার সাত ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা! রাসবিহারী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া ও তাঁহার কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া সামরিক মহা-নায়কত্ব দান করেন। রাসবিহারী মোহন সিংহকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেশকর্ম্মী ভাবিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহন সিংহ সে সুযোগ পাইয়া বিশ্বাস-হন্তার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিলাম।

মোহন সিংহ আই, এন এর ঘূর্ণীবায়ু। আই এন এর মূলে আঘাত করিয়া তাহার অস্থি মজ্জা চূর্ণ করিয়া, ও তাহার কবরস্থান খনন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বার্থান্ধ, ভাগ্যান্বেষী, ধূর্ত্ত এই মোহনসিংহ। স্বার্থ মানুষকে কত নীচে নামাইয়া লইয়া যায়, মোহনসিংহ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, স্বার্থান্ধ ক্ষমতার কি অপব্যবহার করে—দেশের ও দশের কি অনিষ্ট করিতে পারে—মোহন সিংহ তার উৎকট চিত্র। নৈতিক চরিত্র গঠিত না হইলে মেধা কতদূর সর্ব্বনাশ করিতে পারে, মোহন সিংহ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল। রাসবিহারীর সকল স্বপ্নকে ব্যর্থ করিয়া

দিবার জন্য ও দেশের এই সুবর্ণ সুযোগের সময় সকল কার্য্য বিনষ্ট করিবার জন্য দেশদ্রোহিতার অপরাধে রাসবিহারী যদি মোহন সিংহকে কারারুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা মোহন সিংহের পক্ষে যে অতি সামান্য শাস্তি, তাহা অস্বীকার করা যায় কি? এই মোহন সিংহকে কারারুদ্ধ না করিলে রাসবিহারী কি আবার আই, এন, এ গঠন করিতে সমর্থ হইতেন? শ্রীসুভাষচন্দ্র কি আই, এন, এ লইয়া কোহিমা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতেন?

আই, এন, এ, গেল, কার্য্য সমিতির সভ্যগণ পদত্যাগ করিল। বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। ইহার উপর জাপান সরকার ব্যংকক সম্মেলনের সকল সর্তগুলির অনুমোদন ঘোষণা না করায় অবস্থা অতীব গুরুতর হইল। রাসবিহারী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। সহসা চারিদিকে কেবল শূন্যতা। রাসবিহারী একেবারে নিঃসহায়। মোহন সিংহ তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। (মোহন সিংহের হঠকারিতার জন্য প্রথমে রাঘবন পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ মোহন সিংহ কার্য্যকরী সমিতির বিনা অনুমতিতে কয়েকজনকে সাবমেরিন যোগে ভারতে প্রেরণ করেন)। রাসবিহারীর জীবনে নিঃস্বতা নূতন নহে, তিনি পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়াও পরাজয় স্বীকার করেন নাই। আজ বার্দ্ধক্যের সম্মুখীন হইয়াও তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন না। রাসবিহারী বহু চিন্তার পর আই, এন, এ ও আই, এল, এ নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবার নূতন উদ্যোগে অগ্রসর হইলেন।

ভবিষ্যতে যাহাতে জাতির অগ্রগমনে আর কোন বাধা বিপত্তি সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য কাউন্সিল অব এ্যাকসনের সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। এই অদম্য কর্ম্মশক্তির জন্যই আমরা রাসবিহারীকে কর্ম্মযোগী বলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। যে পরাস্ত হইয়াও সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকে, যে পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে সেইত কর্ম্মযোগী। তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণা জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। ঘোষণাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কাউন্সিল অব এ্যাকসনের সকল সহকর্ম্মীই পদত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের ঐক্য এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! যতদিন না আমাদের প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালী অনুসারে পূর্ব্ব এশিয়ার প্রতিনিধিবর্গদ্বারা নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমি একাকীই সমিতির কার্য্য চালনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমার সহকর্ম্মী বন্ধুগণ পদত্যাগ করায় কাউন্সিল অব এ্যাকসনের সকল ক্ষমতাই আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, আমাদের জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রাম রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঠিক পথেই চলিতেছে। এই বৎসর জুন মাসে ব্যংকক মহাসভায় যে কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত হয়, আমি পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়গণের সেই আদেশ ও কর্ম্মভার শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া যাইতেছি। ৯ই ডিসেম্বর হইতে সকল শক্তিই আমিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিত করার জন্য কোন অনুগ্রহ বা

পুরস্কারের আশা না রাখিয়া, নির্ভীকতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত আপনাদের সেবা করিবার প্রতিজ্ঞা আমি পুনরায় গ্রহণ করিতেছি। আমি সকলের মনোভাব বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব ও যাহাতে সকলের ইচ্ছা ও নির্দেশমত কার্য্য করিতে পারি সে বিষয়ে যত্নবান হইব।

"কোন প্রকার বৈদেশিক আধিপত্য, যথেচ্ছাচার, হস্তক্ষেপ ও প্রভাব হইতে মুক্ত সম্পূর্ণ ভারতের স্বাধীনতা আমাদের কাম্য এবং যাহাতে সেই কামনা-সিদ্ধির পথে কোন বাধা উপস্থিত না হয়, তাহা যতই গুরুতর বাধাই হউক, আমি তাহা রোধ করিবার জন্য মনুষ্য শক্তিতে যাহা সম্ভব তাহা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি যে ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছি তাহা আপনারা সানন্দে সমর্থন করিবেন।

"আমার অন্যান্য স্বদেশ ভ্রাতার মতই ভারতের স্বাধীনতা আমার অন্তরের নিভৃততম স্থানে সযত্নে রক্ষিত। এই স্বাধীনতা লাভের জন্যই আমি আজও পরিশ্রম করিতেছি, নির্ব্বাসন বরণ করিয়া লইয়াছি, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছি, বৎসরের পর বৎসর মাতৃভূমির মুক্তিপথ নির্ম্মাণের জন্য অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছি। শুধু ইংরাজের লৌহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তির প্রয়াসী নই, সকল শৃঙ্খল তা' সে যেমন শৃঙ্খলই হউক না কেন তাহা হইতে পূর্ণমুক্তিই আমার কাম্য। এক সময় নিপন জাতি (যাহাদের মধ্যে আমি বাস করি) ভারতের স্বাধীনতা

আন্দোলনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত। আমার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ আমরা তাহাদের শ্রদ্ধা, সমবেদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছি। আমি বিশ্বাস করি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্যও এই আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবশ্যকতা ও মূল্য আছে। অন্যান্যজাতিরও সমবেদনা আজ আমরা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"আমার কয়েক জন সহকর্ম্মী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত পন্থা ব্যতীত অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু সেজন্য আমি প্রাণ থাকিতে স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ হইতে দিতে পারিব না। এ আন্দোলন আমার জীবনের জীবন। উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি, যদি এই মুক্তি আন্দোলনে কোন সমস্যা আসিয়াই পড়ে তবে সে সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলাই সমীচীন। যদি কোন ভয় বা সন্দেহ থাকে অচিরে তাহা দূরীভূত করাই বিধেয়। যদি সত্যই কোন বাধা আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে দূরীভূত করিয়া আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ মুক্ত করার বিষয়ে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। অন্যান্য জাতীয় সহায়তা ও সহযোগিতা যতই মূল্যবান হউক, এরূপ কোন বৃহৎ বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না যে, আমাদের কাম্য, ভারতের স্বাধীনতাকে নিমজ্জিত করিতে পারে। সম্ভব হইলে তাহাদের সাহায্য লইয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিব এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের সহায়তা না লইয়াই যুদ্ধ করিব।

"সকলেই অবগত আছেন বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছিল। এই মহাযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান প্রধান মন্ত্রী টোজোর বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতার প্রতি জাপানের যে মনোভাব তাহা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে; এই বক্তৃতার পরই বিনা বাধায় সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ায় এই স্বাধীনতা আন্দোলন চালান সম্ভবপর হয়। পূর্ব্ব এশিয়ার আন্দোলন ব্যংকক সভা আহূত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। আমরা পূর্ব্ব এশিয়ায় এই আন্দোলন প্রায় এক বৎসর চালাইতেছি। ব্যংকক মহাসভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই আন্দোলন চালান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং সেই আদেশ অনুসারেই বহু সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলাম। সম্প্রতি আমার কয়েকজন সহকর্ম্মী আন্দোলন বিষয়ে আমাদের অবস্থার পর্য্যালোচনার আবশ্যকতা বোধ করেন। আমিও এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত ছিলাম।

"এই পয্যালোচনার পূর্ব্বে অনেকে এই আন্দোলনে আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করেন। এইখানেই দ্বিতীয় মতের সৃষ্টি। এইখানেই বাধা উপস্থিত হইল।

"গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অবস্থার পর্য্যালোচনা আবশ্যক বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেখিলাম, পূর্ণ মীমাংসা হইতে কিছু সময়ের আবশ্যক। আমি কাউন্সিল অব এক্‌সনকে কিছু সময়ের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাত করিলাম। ইহাও জানাইলাম এই

কয়মাস যে ভাবে আমরা আন্দোলন চালাইয়াছি, আর কয়েক সপ্তাহ সেইভাবে আন্দোলন চালাইলে বিশেষ কোন ক্ষতি, বিপদ বা ক্লেশ হইবে না। ইহাও জানাইলাম যদি আলোচনার পরেও সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা করিতে আমরা অক্ষম হই, তবে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্তন করিতে আমরা বাধ্য হইব। বর্ত্তমান পরিস্থিতির মীমাংসার জন্য একান্ত প্রয়োজন কিছু ধৈর্য্যের, এবং তদপেক্ষা প্রয়োজন অধ্যবসায়ের।

"৪ঠা ডিসেম্বর বৈঠকের আলোচনার পর, আলোচ্য বিষয়গুলি আরও বিশদভাবে আলোচনার জন্য ও মাসিক বিবরণী প্রস্তুত করণের জন্য বৈঠক কিছু সময় দিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি সুখী হই। ৫ই ডিসেম্বর আমার কয়েকজন সহকর্ম্মী পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া জানাইলেন যে তাঁহারা বৈঠকের মীমাংসা অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তখনই আমি উপলব্ধি করিলাম যে বৈঠকে আলোচনার সময় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই বিরুদ্ধ আলোচনার সত্যরূপ নহে, তাহার মূল অনেক গভীর। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই বিরুদ্ধ আন্দোলন, এই বাধা সৃষ্টি, এই মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার প্রয়াস, কর্ম্মে নানাপ্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করিবার প্রযত্ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার সহকর্ম্মীদের পদত্যাগের ফলে যে সঙ্কট, বাধা, ক্লেশ, ভ্রান্ত ধারণা, নৈরাশ্য ও ও দুঃখ উদ্ভূত হইবে ও অবশেষে আমাদের কাম্য ও লক্ষ্যের ক্ষতি হইবে, তাহার দিকে আমার সহকর্ম্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

তাঁহাদের পদত্যাগ না করিবার জন্য অনুরোধ করি। ইহাও তাঁহাদের স্পষ্ট জানাই যে, আমাদের মূল অধিকার সম্বন্ধে আমিও তাঁহাদের মত সজাগ ও ঈর্ষান্বিত। প্রবাসের ফলে আমার দেশ-প্রেম ও ভক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই, এবং অপর ভারতীয়ের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয় বরং মাতৃ ভূমির প্রতি আমার অনুরাগ ও আসক্তি আরও গভীর হইয়াছে।

"আমার সহকর্ম্মীরা ৮ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁদের পদত্যাগ পত্র পাইয়া তাঁহাদের পদত্যাগের সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমার মনে হয়, পূর্ব্ব এশিয়ার প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলোচনা না করিয়া তাহাদের পদত্যাগ সমীচীন হয় নাই। আমার আরও মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত বিষয়ের মীমাংসা না হওয়ার জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন এবং সেইজন্য এই পদত্যাগ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহারাই, তাঁহাদের কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বিচারক, এবং সেইজন্য অতীব দুঃখের সহিত তাঁহাদের পদত্যাগ পত্রের অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে হেতু এই মুক্তি আন্দোলন সমগ্র ভারতের এবং কেবল ভারতের স্বাধীনতার জন্যই চালিত হইতে পারে এবং সকল প্রশ্নেরই সন্তোষজনকভাবে মীমাংসাও হইতে পারে, আমি একাই পূর্ব্ব এশিয়ার অনুকুল সহায়তায় এই আন্দোলন চালাইতে মনস্থির করিয়াছি। একদিকে যেমন এই আন্দোলন চালাইয়া যাইব, অন্যদিকে আমার সহকর্ম্মীরা আন্দোলনের অনুকূলে যে সকল সুবিধা ও সুযোগ দাবী করিয়াছেন তাহাও পাইবার জন্য

বিশেষ যত্নবান হইব। যতশীঘ্র সম্ভব আমার দেশবাসীর নিকট আমার অগ্রগমনের বিবরণী উপস্থিত করিব।

"ইতিমধ্যে কাজ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে এবং বেসামরিক ভারতীয়দের কাহারও ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। যত কম বিশৃঙ্খলা হয় তাহাই করা হইবে। আন্দোলন পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকিবে। আমি মুক্তি সঙ্ঘের প্রতি শাখাকে ও জাতীয় বাহিনীকে এই আশ্বাস দিতেছি যে কাউন্সিল অব এ্যাকসনের সকল কার্য্য ও দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণের জন্য এই কয়মাস ধরিয়া যে সমস্ত সামরিক এবং বেসামরিক নিয়মাবলী ও গঠনমূলক নীতি সৃষ্ট হইয়াছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমি কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য করিব না, মুক্তি সঙ্ঘের বা মাতৃভূমির ক্ষতিকর কোন কার্য্য করিব না। আমার দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই আমার কাম্য। তাঁহাদের মঙ্গলের দিকে আমার দৃষ্টি সর্ব্বদা সচেতন থাকিবে এবং সেই গুরুভারই আমি আমার মাথার উপর স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইয়াছি।

আমার অজ্ঞাত নহে যে আমার সকল ভ্রাতা ভগ্নীই বিশ্বাস করেন যে আমার সম্মুখে যে কার্য্য তাহাতে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা অতি কঠিন, ও দুঃসাধ্য। আমার প্রতিপক্ষ যদি আমাকে অপরের ক্রীড়াপুত্তলী বলে তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি আজ শুধু এই কথাই বলিতে চাহি যে, যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তি, পূর্ণ মুক্তি, এবং যে ভারতে জন্মগ্রহণ

করিতে পারিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে, যে ভারতের মুক্তিযজ্ঞে সর্ব্বস্ব বলি দিয়াছে, আজও যে নিজের শেষ রক্তকণাটী ভারতের সম্মান ও অখণ্ডতার জন্য ব্যয় করিতে উদ্‌গ্রীব, প্রতিপক্ষ তাঁহার সম্বন্ধে অপপ্রচার ও বিরুদ্ধ প্রচার দ্বারা পাপই করিতেছেন। স্বদেশের মুক্তি ব্যতীত আমার কিছুই কাম্য নাই। এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে আমার পবিত্র সর্ব্বসুন্দর মাতৃভূমির এক নির্জ্জন কোনে শুধু শেষ আশ্রয় ভিক্ষা করি। ভারতের স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। কোন প্রকার ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ, স্বার্থ, বর্ণ-বৈষম্য বা ধর্ম্মমত যেন এই চরম লক্ষ্যের অন্তরায় সৃষ্টি না করে।

আমি আমার সকল দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভূতভাবে যেন আমায় সাহায্য করেন। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত কিছুই করা সম্ভব নয়। এই সাহায্য পাইলেই আমরা মুক্তি যুদ্ধে জয়ী হইব সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি আমরা লক্ষ্য ভেদ করিবই, ভারতের স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করিবই।

হিন্দুস্থান দীর্ঘায়ু লাভ করুক

বন্দেমাতরম”

রাসবিহারীর ঘোষণাপত্র ও বীরেন্দ্র রায়ের দিনলিপি পরস্পর সমর্থন করে। দীলন ব্যংকক প্রস্তাবের মধ্যে দুই একটী

স্থান সুবিধানুযায়ী যোগা-যোগ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ সত্য অপ্রিয় হইলেও ভাল, মিথ্যা নিন্দনীয়, কিন্তু অর্দ্ধ সত্য অর্দ্ধ মিথ্যা কেবল নিন্দনীয় নহে অতি ভয়াবহ। ব্যক্তিগত প্রাধান্যের ও সুবিধার নিমিত্ত রাসবিহারীর বিরুদ্ধে মোহন সিংহ প্রমুখ সামরিক নায়ক ও কর্ম্মী দ্বারা যে অপপ্রচার চলিতেছিল, তাহা দীলন, শাহনাওয়াজ, ও অন্যান্য আই, এন, এ কর্ম্মী কোথাও উল্লেখ করেন নাই। অন্যান্য লেখকেরা নির্ব্বিচারে ইহাদের কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। যাহা মিথ্যা, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। যাহা সত্য তাহা শাশ্বত, তাহা সূর্য্যের মত কৃষ্ণ মেঘ জাল ছিন্ন করিয়া প্রকাশিত হইবেই হইবে।

রাসবিহারী কখনও দীর্ঘ ঘোষণা-পত্র দেন নাই। এই প্রথমবার তিনি সমগ্র পরিস্থিতি দেশবাসীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য দীর্ঘ ঘোষণা-পত্র দিয়াছিলেন। তীব্র বেদনার্ত্তের নয়নজলে লিখিত এই ঘোষণা-পত্র। অতি সংযত ভাষায় কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ আছে এই পত্রে।

(১) ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় নায়কেরা দেশমুক্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২) তাঁহার সম্বন্ধে অপপ্রচারের মূলে আছে ব্যক্তিগত স্বার্থ। যাঁহারা এ অপপ্রচার করিতেছেন, তাঁহারা পাপই করিতেছেন।

(৩) যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি মুক্তিযুদ্ধ হইতে

জাপানে রাসবিহারীর উদ্যোগে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সম্বর্দ্ধনা

কাউণ্ট সাকাই রাসবিহারী মহেন্দ্র প্রতাপ কাউণ্ট উস্কি শ্রীখাসিয়া, সভাপতি জাপান মন্ত্রীসভা

অবসর গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত।

আমরা পুনঃপুনঃ দেখিয়াছি রাসবিহারী ভাবোম্মাদ নহেন, তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ভাবোম্মাদ ভাষণ দিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ভাবোদ্বেলিত করিবার চেষ্টাও করেন না। তিনি কর্ম্মোম্মাদ, কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও প্রণালী দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন। এই ঘোষণাপত্রে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এই পত্রের প্রত্যেকটী শব্দ-চয়নে যথেষ্ট সংযম রক্ষা স্বত্তেও, আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার হৃদয় ক্ষুব্ধ, ক্ষতবিক্ষত। সেই ক্ষত মুখ দিয়া রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিতপ্রায়। তাঁহার প্রতিপক্ষীয়রা এমন অপপ্রচার করিতেছিল যাহার ফলে তিনি তাঁহার আজন্ম সাধনার পথে হিমালয়তুল্য বাধা দেখিতে পাইতেছিলেন।

রাসবিহারীকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য প্রতিপক্ষের হস্তে তিনখানি অতি গুরুত্বপূর্ণ তাস। যে মুহূর্ত্তে রাসবিহারী তাঁহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রবল বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান হইবেন, সেই মুহূর্ত্তে এই তিনখানি তাস তাঁহারা ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিবেন। সুযোগ বুঝিয়া বিপক্ষগণ এই তাস তিনখানি ব্যবহার করিলেন। পায়ে গুলি লাগিয়া রাসবিহারী ভূশয্যা গ্রহণ করিয়াও যে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাহা তাঁহার বিপক্ষগণ আশা করেন নাই। তাস তিনখানি—

(১) রাসবিহারী ৩০ বৎসর পূর্ব্বের ব্যর্থ বিপ্লবী। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ ভয়ে পলাইয়া জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিপক্ষ গণের মতে সে দিনের বিপ্লব ছিল বালকের অসংযত ক্রীড়ামাত্র।

(২) দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়া জাপানী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া, জাপানী নাগরিকত্ব লাভ করিয়া তাঁহার ভারতীয়ত্ব তিনি বিনষ্ট করিয়াছেন। আজ এতদিন পরে কেবল স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই তিনি সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, এই যুদ্ধে জাপানকে সহায়তা করিয়া জাপানের হস্তে ভারতবর্ষকে বিক্রয় করা। তিনি জাপানের গুপ্তচর, এবং জাপানের ইঙ্গিতে চোরাগুপ্তি খেলিতেছেন।

(৩) যদি ভারতের মুক্তিই তাঁহার কাম্য, তবে তাঁহার পুত্রকে তিনি জাপানী বাহিনীতে কেন দিলেন? কেন তাঁহাকে ভারতীয় বাহিনীতে দান করিলেন না?

আরও কতকগুলি পার্শ্বতাস আছে, সেগুলিও কম শক্তিশালী নহে। সেগুলি ঃ—

(ক) রাসবিহারী জাপানী ভাষা নির্ভুলভাবে আয়ত্ব করিয়াছেন। জাপানী ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ত্রিশ বৎসর জাপানে প্রবাসকালে ভারতকে কি দিয়াছেন? জাপানী কর্ম্মচারীদের সহিত তিনি ভারতীয়ের সমক্ষে ভারতীয়ের অজ্ঞাত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন কেন? জাপানী সরকারের সহিত ও সমরনায়কদের সহিত তাঁহার জাপানী ভাষায় পত্র ব্যবহার চলে কেন?

(খ) রাসবিহারীর উপর নির্ব্বাসন দণ্ড ছিল, কিন্তু তাঁহার পুত্র কন্যার উপর ত কোন নির্ব্বাসন আজ্ঞা ছিল না। তিনি তাঁহাদের ভারতে ভারতীয় আদর্শে কেন প্রতিপালন করিলেন না?

প্রতিপক্ষের যতগুলি অভিযোগ, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য; একটীও অস্বীকার করিবার উপায় রাসবিহারী বা রাসবিহারীর বন্ধুদের ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটী ঘটনার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য, যে পরিস্থিতি, যে পরিবেশ ছিল তাহা বিপক্ষরা যদিই বা জানিয়া থাকেন তাহা তাঁহারা গোপন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি এ সকলের সংবাদ রাখিতেন না, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের কথাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। বিপক্ষগণ সর্ব্বাপেক্ষা জোর দিয়াছিলেন জাপানী নারীর পাণিগ্রহণ ও জাপানী নাগরিকত্ব গ্রহণের উপর। পূর্ব্বে এ বিষয় লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এই সামান্য সামাজিক ত্রুটী তাঁহার আজীবন কর্ম্ম সাধনা ও দেশ সেবাকে রাহুগ্রস্ত করিতে পারে না। বিপক্ষগণ তাঁহার যে লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন, ভারতের মুক্তির পথে যে দুরূহ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে অন্যায় ও অধর্ম্ম ইহা অপেক্ষা শতগুণে গুরু। যাঁহারা মানব ইতিহাসের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারা তিনটী সত্য নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন—

(১) কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে। সমাজকে অতিক্রম করিয়া রাসবিহারী যদিই কোন অন্যায় করিয়া থাকেন, ত্রিশ বৎসর পরে সমাজ সেই অন্যায়ের শাস্তি সুদ সমেত দিল! রাসবিহারীর এই

প্রায়শ্চিত্ত মনে করিয়ে দেয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা। তিনি ছিলেন ধর্ম্মপুত্র, ধর্ম্মরাজ, তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য মিথ্যা ভাষণের ফল তাঁহাকে নরক দর্শন করাইয়াছিল।

(২) যে যত সাধারণ মানুষ হইতে উপরে উঠে, ততই সামান্য ভুল ভ্রান্তির জন্য, সামান্য পদস্খলনের জন্য তাহাকে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মনুষ্যদেহে যাহারা অবিরাম পাপ করিয়া পশুত্ব লাভ করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত পশুত্বলাভ, অন্য প্রায়শ্চিত্ত ও করিতে হয়। কিন্তু তাহা মর্ম্মান্তিক হয় না।

(৩) জনসাধারণ সহজে উত্তেজিত হয় না, কিন্তু একবার উত্তেজিত হইলে তাহারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। তাহাদের পুনঃ সংযত করা অতি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। বিশ্বকবি সেক্সপিয়র সিজার-হত্যার চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন জনসাধারণ ধূর্ত্ত স্বার্থান্বেষীর বাকচাতুর্য্যে কত সহজে উন্মত্ত হইয়া উঠে ও জনতার রূপ কত ভয়ঙ্কর ধারণ করে। সকল দেশেই জনতার ধর্ম্ম ও প্রকৃতি একই ধাতুতে গঠিত। মোহনসিংহ বন্দী, কর্ণেল গিলও কারারুদ্ধ কিন্তু তাঁহাদের সহকর্ম্মীরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

রাসবিহারীর লাঞ্ছনা ও শেষে জয়লাভ।

ক্ষিপ্ত ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক জনসাধারণ আই, এন, এ, নথীপত্র জ্বালাইয়া দিল। শোভাযাত্রা করিয়া রাসবিহারীর

চিত্র ও জাতীয় পতাকা প্রকাশ্যস্থানে অগ্নিসাৎ করিল, পথেঘাটে সর্ব্বত্র রাসবিহারীকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। রাসবিহারী এই কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়াও আই, এন, এ কর্ম্মীবৃন্দ ও নায়কদের আহ্বান করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া তাঁহাদের সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ফলে অভদ্রোচিত লাঞ্ছনা ও অপমানে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর হইতে লাগিল। ক্ষিপ্ত জনতা যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা একই অস্ত্রাঘাতে শেষ করিয়া দিতে পারে। রাসবিহারীর কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যতই বাধা পাইতে লাগিলেন, ততই উদ্যমের সহিত কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ১৯৪৩ সালের ৮ই জানুয়ারী রাসবিহারী আই, এন, এর ছোট বড় সব কর্ম্মচারীদের বিদাদরীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া এই সভায় উপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই রাসবিহারীকে পূর্ব্বে দেখেন নাই। বিপক্ষদল রাসবিহারীকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে ভীষণ প্রকৃতির লোক সে বিষয়ে কাহারও তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই জাপানী গুপ্তচর ধুরন্ধরকে চরম শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। সেদিন বিদাদরীর বাতাসে একটা দুঃসহ নিস্তব্ধতা, যেন একটা ভয়াবহ দুষ্কার্য্যের পূর্ব্ব-ইঙ্গিত বিদ্যমান। কেহ কেহ এই অপ্রিয় পরিস্থিতি দেখিয়া আতঙ্কিত হইলেন।

একখানি মোটর ধীরে ধীরে সভাস্থলে প্রবেশ করিল, মোটরের সম্মুখের জাতীয় পতাকা যেন থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। মোটর হইতে অবতরণ করিলেন সামরিক বেশে সজ্জিত এক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধের সঙ্গে মাত্র তিন জন আই, এন, এ কর্ম্মী। যে রাসবিহারীর চিত্র তাঁহারা দেখিয়াছেন এযেন সে রাসবিহারী নয়, তবুও অনুমানে সকলেই বুঝিলেন বৃদ্ধই রাসবিহারী। রাসবিহারী সভায় প্রবেশ করিলেন। আজ কেহ অভিবাদন করিল না, কোন অভিনন্দন জানাইল না। রাসবিহারী ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভাই সব, বহুদিন পরে যদি স্বুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে তাহাকে হেলায় নষ্ট করিও না। মোহনসিংহ না থাকিতে পারে আমিও না থাকিতে পারি, তাই বলিয়া দেশের মুক্তি-যুদ্ধ কেন বন্ধ হইবে? তোমরা ভাবিয়া দেখ দেশ কাহারও একার নয়, একা কেহ দেশ স্বাধীন করিতে পারে না। এক বিন্দু জলকণার কতটুকু শক্তি কিন্তু সেই জলকণার সমষ্টিই প্রবল বন্যা আনে। আমরা প্রত্যেকে এই যজ্ঞে এক একটী জলকণামাত্র।"

কিন্তু সে দিন কেহই তাঁহার কথা শুনিতে প্রস্তুত নহে। কেহই বুঝিতে চাহে না, যে দেশের মুক্তি যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে না, দেশ রাসবিহারীর বা মোহন সিংহের একার নহে। রাসবিহারী কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলেই তাঁহার উপর চারিদিক হইতে অপমানসূচক প্রশ্ন বৃষ্টি হইতেছে, নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে।

কখনও কখনও ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ভেদ করিয়া শুনা যাইতেছে—"হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার বসিয়া পড়।" কেহ বলিতেছে "তুমি জাপানী নও? তুমি জাপানী মেয়ে বিয়ে করনি? তবে আর কোন মুখে লম্বা লম্বা কথা বলছো?" কেহ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—"তোমার ছেলেকে আই, এন, এতে ভর্ত্তি না করে জাপানী সৈন্যে কেন ভর্ত্তি করেছো?" রাসবিহারী অসীম ধৈর্য্যের সহিত তবুও বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমে তুমুল কোলাহলের মধ্যে রাসবিহারীর কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। জনতা অমার্জ্জিত ভাষায় গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাসবিহারী নীরব হইলেন। তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট দৃষ্টি ক্রমশঃ জনতা অতিক্রম করিয়া দূর চক্রবালে নিবদ্ধ হইল। দুই নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে দুই নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। রাসবিহারীর সজীব মূর্ত্তি যেন চক্ষের সম্মুখে প্রস্তরীভূত হইল। মাতৃভূমির মুক্তি সাধনায় কি লাঞ্ছনা!

সহসা জনতা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মনে হইল যেন মন্ত্রাহত হইয়া জনতা বাক্‌যন্ত্র হারাইয়া বসিয়াছে। ক্ষণপরে জনতার মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হইল। গুঞ্জন ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিল। সহসা জনতা উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ইনক্লাব জিন্দাবাদ! রাসবিহারী বোসকি জয়।" যাঁহারা একদিন তাঁহার ঘোর শত্রুতা করিয়াছিল, তাঁহার প্রতিকৃতিকে পদদলিত করিয়া নিস্পিষ্ট করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল,

তাহারাই হইয়া উঠিল তাঁহার গুণগ্রাহী। রাসবিহারীর প্রস্তরীভূত মূর্ত্তির দূর-সন্নিবিষ্ট আঁখি হইতে যে জলনির্ঝর পাগল হইয়া ছুটিতেছিল, তাহা সহস্র বাগ্মীতার অপেক্ষাও হৃদয়স্পর্শী। বীরেন্দ্র রায় লিখিয়াছেন 'নিতাই গৌরের সহিষ্ণুতার কাহিনীর মতই এই কাহিনী অদ্ভুত।' রাসবিহারীর জীবনে এ অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ, জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ হইতে ইহা কিছুমাত্র লঘু নয়। মানুষের জীবনে এ অতি পবিত্র মুহূর্ত্ত। সকলের জীবনে এ শুভ ক্ষণ আসে না, সকলের ভাগ্যে এ দৃশ্য দেখিবারও সৌভাগ্য হয় না।

একবার বিলাত হইতে সদ্যাগত এক ইংরাজ বিজনবিহারীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আচ্ছা, তোমাদের দেশে সামান্য সামান্য ব্যাপারে এত ধর পাকড় কেন?"

বিজনবিহারী বলিলেন "বিদেশীয় রাজার নিকট ইহা ছাড়া আর আমরা কি আশা করিতে পারি? আমাদের কণ্ঠনালী রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেইত তাঁহাদের স্বার্থ বজায় থাকিবে!"

তিনি বলিলেন—"ওটা মামুলী নিতান্ত পুরাতন যুক্তি। আমার কিন্তু মনে হয় অন্য কারণ। তোমাদের জনসাধারণ কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, তাহারা চিন্তা করিতে জানে না, কোন জিনিষ বিচার করিতে জানে না, বিচার করিবার পন্থা নির্ণয় করিতে জানে না, তাহারা যাহা শোনে তাহাই বিশ্বাস করিয়া উত্তেজিত হইয়া একবার সম্মুখে একবার পিছনে ছুটাছুটি করে, অবশেষে পথ হারাইয়া নিজেরা বিভ্রান্ত হয়, সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। আমাদের দেশ কিন্তু অন্যরূপ, তারা সংবাদ পত্রের মন্তব্য

পড়ে বক্তৃতাও শোনে, কিন্তু নিজে চিন্তা করে, সত্যাসত্য নির্ণয় করে, সযত্নে পন্থা নির্ণয় করে, তারপর কোমরে কোমরবন্ধ কসিয়া যুদ্ধ করিতে নামে, তখন তারা কোন বাধাই মানে না।"

বিজনবিহারী সেই দিন ইংরাজ ভদ্র লোকের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, পরে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনিই প্রকৃত ভারতীয় জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটু ভুল তিনি করিয়াছিলেন—ভারতীয় জনসাধারণ আপাত ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অনিয়মানুবর্ত্তিতার আঘ্রাণ পাইলেই উন্মত্ত হইয়া উঠে।

আই, এন, এর পুনর্গঠন

রাসবিহারী জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জয়লাভের তখনও বহু বিলম্ব। বিদাদরী সভার পর আই, এন, এতে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়। একদল নিষ্ঠার সহিত কর্ম্মে ব্রতী হইলেন, অপর দল আই, এন, এর মধ্যে থাকিয়াই বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আই, এন, এ পরিত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ মত প্রচারের জন্য চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। সময় সময় এই দ্বিতীয় দল অপর দলের উপর বলপ্রয়োগও করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া অনেকেই আই, এন, এর কর্ম্মে মন নিবিষ্ট করিলেন। যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যোগ দিলেন না, তাঁহারা প্রথমে বলিয়াছিলেন,

জাপানীকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তারপর বলিলেন রাসবিহারীকে বিশ্বাস করিতে পারি না। অবশেষে প্রশ্ন করিলেন আই, এন, এতে বেসামরিক লোক কেন? বহু মুসলমান নায়ক কেন? আবার কাহারও কাহারও আত্মসম্মান জ্ঞান এরূপ সজাগ যে যাঁহারা মোহন সিংহের হস্ত হইতে জাপানীদত্ত বেতন গ্রহণে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন নাই, তাঁহারা জাতীয় সঙ্ঘের নিকট প্রাপ্য বেতন লইতে অপমানিত বোধ করিতেছিলেন।

রাসবিহারী একাই এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই, তাঁহার পূর্ব্বে লোকপূজ্য তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র সকলেই জনসাধারণের নিকট অল্প বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই রাসবিহারীর একান্ত যত্নে ও চেষ্টায় আই, এন, এ আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইল, প্রত্যেক বেসামরিক ব্যক্তিকেও কিছু সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। যুব-সঙ্ঘ পূর্ব্ব ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য বিপুল উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সামরিক প্রণালীতে প্রথমে যে সব ভ্রম ছিল, রাসবিহারী স্বয়ং সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিতে লাগিলেন। প্রথমে শাসন বিভাগ (এডমিনিষ্ট্রেসন) ছিল না, এখন সেই বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সে দিকেও রাসবিহারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রাসবিহারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক বিষয় নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার সকল পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সভা সমিতিতে রাসবিহারী পুরোভাগে। মাঝে মাঝে তিনি বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন—"মেরে পেয়ারে ভাইয়োঁ ঔর বহিনোঁ" কিম্বা "মেরে হাতিয়ার বন্ধ দোস্তোঁ" না হয় ত "সিপাহীয়োঁ"। একটী কথার উপর তিনি পুনঃ পুনঃ জোর দেন—"আজাদী চাহিলেই পাওয়া যায় না, আজাদীর উচিৎ মূল্য দিতে হইবে। আজাদীর জন্য কুর্ব্বানীর দরকার, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে, কিছু রাখিলে চলিবে না, তবেই দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পড়িবে, চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা হচ্ছে নকল স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তর মাত্র, সে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। জাপান বা ইংরাজ কেহই আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলিয়া দিবে না,—আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়া এমন কি রক্তমূল্যে ইহা ক্রয় করিতে হইবে।" রাসবিহারী সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠেন "সব নাঙ্গা হো যাও, সব ফকিরী লেও।"

রাসবিহারীর ঐকান্তিকতা, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়, সমগ্র আই, এন, এ তে কর্ম্মোন্মাদনা আনিয়া দিল। আই, এন, এ দ্রুত সাফল্য মুখে অগ্রসর হইয়া চলিল।

রাসবিহারীর পুত্রবিয়োগ

টোকিও ষ্টেশনে রাসবিহারীকে বিদায় দান কালে পুত্রের প্রতি অমৃতোপদেশ, রাসবিহারীর পুত্রের প্রতি স্নেহ, ও

বিশ্বাস, রাসবিহারীর মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ মাসাহিদেকে চিন্তাশীল করিয়া তুলিল। মাসাহিদের চরিত্র, রাসবিহারী ও তোষিকোর চরিত্রের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। একজনের গভীর চিন্তাশীলতা ও অপরের কর্ম্মপ্রেরণা মাসাহিদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া পিতার ব্রত উদ্‌যাপনে সহায়তা এবং পিতার মতই মাতৃ-ভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন। কি প্রকারে এই ব্রত সাধন সম্ভব? যেখানে ঐকান্তিকতা, সেখানে পথ আপনি উন্মুক্ত হয়। একসঙ্গে উভয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার একমাত্র পথ জাপানী সৈন্যবিভাগে যোগদান। এ অপূর্ব্ব সুযোগ তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। তিনি নিদ্রায়, জাগরণে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্কবাহিনী লইয়া দক্ষিণে পিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার অপরাজেয় ট্যাঙ্ক-বাহিনী লইয়া ইংরাজকে বিতাড়িত করিতে করিতে সর্ব্বপ্রথম পিতৃভূমিতে পিতার অগ্রদূতরূপে ভারতে প্রবেশ করিতেছেন। পিতৃভূমি মুক্তিসেনার অগ্রদূত তিনিই, মহাজাতিদ্বয়ের প্রথম সন্ধিসূত্র তিনিই, এবং দুই জাতির মিলন-গ্রন্থি তিনিই। সুতরাং তাঁহার মত ভাগ্যবান কে? তিনি কি জানিতেন, তাঁহার পিতা ব্যাংককে ও সিঙ্গাপুরে কি ভীষণ সঙ্কটাবস্থার মধ্যে স্বদেশ মুক্তিযজ্ঞে জীবনাহুতি দিয়াও কতিপয় স্বার্থপর দেশবাসীর দ্বারা কিরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন? কি নিদারুণ আঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াও কি অসীম সহিষ্ণুতার সহিত

সর্ব্বত্যাগী পিতা স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন? না, সে সংবাদ তাঁহার জানিবার উপায় ছিল না। মাসাহিদে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ম্মব্যস্ত। মাসাহিদের অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতা তাঁহাকে ৯ নম্বর ট্যাঙ্কবিভাগের সর্ব্বাধিনায়কত্বে উন্নীত করিয়াছে। ওকিনারোর ভীষণ যুদ্ধে মাসাহিদে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সকল আশা, সকল স্বপ্ন অকালে বিলীন হইল। রাসবিহারী সিঙ্গাপুরে বসিয়া প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তোযিকোর প্রথম ও প্রধান অবদান পৃথিবী হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু রাসবিহারীর শোক করিবার অবসর কোথায়? তিনি কোনদিন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন নাই। কোন মোহ তাঁহাকে কোনদিন পশ্চাতে আকর্ষণ করে নাই। তাঁহার মত সর্ব্বত্যাগীকে শোক স্পর্শ করে না। বিরাট কর্ম্ম তাঁহাকে সম্মুখে আহ্বান করিতেছে। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাসবিহারী দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বলি দিতে সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—'নাঙ্গা হো যাও, বিলকুল নাঙ্গা হো যাও, কুছ মৎ রাখো'। নিজেও সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হন নাই। তিনি মাতাপিতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, সুখ, সচ্ছন্দ, স্বাস্থ্য, সম্পদ্, মান, অপমান সকলই বলি দিয়াছেন মুক্তি-যজ্ঞ সাধনায়। এইখানেই রাসবিহারীর মহামানবত্ব!

আবার বলি, বাঙ্গালী সন্তান! উজ্জ্বল আত্মত্যাগের আদর্শ তোমার সম্মুখে। যে আদর্শে রাসবিহারী পৌঁছিয়াছিল, সে আদর্শে তুমিও পৌঁছিতে পার। রাসবিহারীর আত্মবলি কোন জাতির কোন মহামানবের অপেক্ষা কম নহে। তাঁহার আত্মোৎসর্গ তবেই সার্থক হইবে, যদি প্রত্যেক বঙ্গসন্তান রাসবিহারীর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সুজলা সুফলা বঙ্গমাতাকে আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা করিতে পারে। প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের আত্মবলি—রাসবিহারীর এক একটী জয়-পতাকা। নতুবা রাসবিহারীর আত্মত্যাগ দাবদাহ মরুভূমিতে একবিন্দু জল সিঞ্চনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে! তাই বলি, নৈতিক জীবন শৈশব হইতে গঠন কর, সমাজের ভিত্তি দৃঢ় কর, দেশকে আদর্শ ও নৈতিক হৈম সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" মন্ত্র সাধন কর। দেখিবে, জীবন-যুদ্ধে তুমি জয়ী—তুমি সর্ব্বত্র অপরাজেয়! তখনই দেখিবে মহাকালের বক্ষের উপর যে নগ্নশক্তি নৃত্য করে তাহা তোমার সহায় হইয়াছে।

রাসবিহারীর আর এক মুল্যবান বিবৃতি

মার্চের শেষে রাসবিহারী আই, এন, এ ও আই, আই, এল, কে সঙ্কটময় অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া নব উদ্যমে অনুপ্রাণিত করিলেন। একদিকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, অপরদিকে বিপুল শারীরিক পরিশ্রম। তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য

ইহা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্রামের কথা তিনি ভাবিতে পারিলেন না। সমগ্র আই, এন, এ, ও আই, এল্, এর আমূল পরিবর্ত্তন, সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এপ্রিল মাসে যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহা ভারত-স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। নিম্নে সেই বিবৃতির সার সঙ্কলিত হইল।

"কর্ম্ম-নায়কদের পদত্যাগের ফলে পর পর কয়েকটী সঙ্কটময় অবস্থার উৎপত্তিতে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রগমন সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সে সকল অতিক্রম করিয়া আবার দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। সঙ্কট আসে, হয়ত আবার আসিবে, কিন্তু থামিলে চলিবে না।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কেবল মনের মধ্যে থাকিলেই স্বাধীনতা লাভ হয় না। ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রত্যেক শাখার কার্য্য, সাফল্য, অগ্রগমন প্রভৃতি বিচার করিতে হইবে। এই বিচার নির্ভর করিবে আমরা কত যুদ্ধো-পযোগী যুবককে শিক্ষিত করিয়া প্রকৃত যোদ্ধা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আজ আমরা নানা সুখ দুঃখের মধ্যে এই সভায় মিলিত হইয়া মাতৃভূমি মুক্তির বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাই আলোচনা করিতে যাইতেছি। এক বৎসরের মধ্যে সেই একই উদ্দেশ্যে ইহা আমাদের তৃতীয় মিলন।

ভারতের মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমি সময় ক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু কয়েকটী কথা যাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তাহার উল্লেখ করিতে চাহি। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে, যখন ইংরাজের নির্ম্মম অত্যাচারে ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক জীবন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই সময় ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ভারতের এই মুক্তি-সংগ্রামকে ইংরাজ "বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু উহা কি বিদ্রোহ ছিল ? আমার মতে নহে। উহা ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পবিত্র যুদ্ধ। উহা স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টা!

এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল কারণ, ইহাকে চালিত করিবার উপযুক্ত নেতার অভাব ছিল। এই মুক্তি যুদ্ধে ভারতবাসী নিজ জন্মগত অধিকার রক্ষার প্রথম চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া যুদ্ধ অবসানের পর ইংরাজ যথেচ্ছ বিচারের প্রহসন করিয়া ছয় সহস্র ভারতবাসীকে ফাঁসী দিয়াছিল। সেই দিন হইতে স্বরাজের বীজ ভারতের অগণিত নেতার মধ্যে উপ্ত হইল। কয়েকদিন পূর্ব্বে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের আত্মবিসর্জ্জনকারীদের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই সভা আহূত হয়। এস, আমরা মাতৃভূমির সেই অগনিত পরিচিত অপরিচিত মুক্তি-সেবকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। সেদিন দূরে নয়, যেদিন ভারতের গ্রামে

নগরে এইসব বীরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানগণ এই সব স্মৃতিস্তম্ভ মূলে কেবল শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবে না, নিজেদেরও অশেষ গৌরবান্বিত মনে করিবে।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, ব্যংকক অধিবেশনের পর ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং সেই পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে তাল রক্ষা করিবার জন্য আমাদের কার্য্যেরও আরও দ্রুত অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরাজকে ভারত ত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার এই বাণী উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকে ইংরাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত। সুতরাং পূর্ব্ব দেশীয় প্রবাসী ভারতীয়ের প্রত্যেকের দেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ একান্ত প্রয়োজন।

বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া যুদ্ধ ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। প্রায় সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া হইতে ঈঙ্গ-মার্কিন বিতাড়িত হইয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার দিন আর বেশী দূরে নয়।

বহুদিন আমি জাপানে বাস করিয়া জাপানী সমাজের মধ্যে স্বীয় কার্য্য চালনা করিয়াছি এবং বিশ্বাস করি জাপান অত্যাচার-পীড়িত এশিয়াবাসীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ও তাহাদের সহিত

মিলিত হইয়া এশিয়াকে বৈদেশিক কর্তৃত্ব ও অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ।

আমি উৎগ্রীব হইয়া সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। কবে সেই শুভদিন আসিবে যেদিন ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন এশিয়া গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জাপান স্বীয় এবং অন্যান্য এশিয়ার রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাবতীয় এংলোস্যাকসান রাজ-শক্তিকে প্রাচ্য হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে এই গুরুভার বহন করিতে এশিয়ায় একমাত্র জাপানই উপযুক্ত। আমি জানি, জাপান নিজ শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় না হইয়া কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অবতরণ করে না। আমি বিশ্বাস করি, এই কার্য্যে জাপানের সাফল্য সুনিশ্চিত।

ব্যাংকক অধিবেশনের পর সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ঘটনা জাপান মহামন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো কর্তৃক ঘোষণা। এই ঘোষণার বলে বর্ম্মাবাসীর এক বৎসরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এশিয়াবাসীর প্রতি সহৃদ্যেতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ঘোষণা। বর্ম্মার এই সৌভাগ্যের জন্য বর্ম্মার অধিবাসীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের সৈন্যদের বীরত্বের নিকট আমার মস্তক অবনত করিতেছি এবং আর আমার সংশয় নাই যে, আমরা শেষ যুদ্ধে জয়ী হইব। এস আমরা সকলে পরস্পরের সহায়তায় সাফল্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে মুক্তি-সঙ্ঘ এক অতি

আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোয়ালা-লাম্পুরে ভারত যুবক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষা কেন্দ্রে প্রায় এক সহস্র বেসামরিক যুবক ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সহায়তায় আধুনিকতম সামরিক শিক্ষা লাভ করিতেছে।

ভারতের যুবগণের আত্মবলিদানের সাহস এবং মুক্তি সংগ্রামের প্রারম্ভিকরূপ ইংরাজশক্তিকে পুরুষত্বহীন করিয়াছে। ভারতের যুবসম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাই মাতৃভূমির মুক্তি, জয় ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম! সেই জন্যই পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতমুক্তি সঙ্ঘ কর্তৃক অবিলম্বে একটী যুব সম্প্রদায় গঠন অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যকীয় যুব-সম্প্রদায়ই ভারত মুক্তিযজ্ঞের কেন্দ্র এবং জাতীয় বাহিনীর অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই যুব-সম্প্রদায়ই ভারত মুক্তি যুদ্ধের ভবিষ্যৎ বীর যোদ্ধা। এই বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রামে সামরিক, ও বেসামরিক যোদ্ধার মধ্যে কোন প্রভেদ বা পার্থক্য নাই! আমরা সকলেই ভারতবাসী এবং সকলেই মুক্তি সেনা। পবিত্র মাতৃ-ভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য আমরা একত্রে জয়যাত্রা করিব। সর্ব্বশেষে পূর্ব্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়ের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সহায়তাদানের জন্য জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের মুক্তিযজ্ঞে জাপানের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে আজ পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহার কণামাত্র ও সম্ভব হইত না।

এই বক্তৃতার পরিশেষে রাসবিহারী উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট ব্যংকক ও টোকিওর সঙ্কল্পগুলির পুনরাবৃত্তি করেন ও সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ভেদের কোন স্থান নাই; ঐক্য, বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ ইহার আদর্শ এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের শাসন-প্রণালী ভারতবর্ষের ভারতবাসী দ্বারাই গঠিত হইবে ও এক অখণ্ড ভারত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই হইবে।”

ব্যংকক অধিবেশন সদ্যজাত আই, এন, এ কে অভিনন্দিত করিয়াছিল। এই নব জাত শিশুর জয় কামনা করিয়া দেশ বিদেশ হইতে ভারতীয়, অভারতীয় জনমণ্ডলী শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ব্যংকক অধিবেশনের চমৎকারিত্ব, ঔজ্জ্বল্য, উন্মাদনা প্রতি ভারতবাসীর অন্তরে আশার দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। তখন কি কেহ বিন্দুমাত্র ধারণা করিয়াছিল যে এই নবজাত শিশুর হৃৎযন্ত্রে অতি সংগোপনে দুষ্ট, দুরন্ত রোগ-বীজাণু আত্মগোপন করিয়া আছে এবং অচিরে তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির বহিঃপ্রকাশ হইবে? আমরা সেই সংবাদ প্রথমে পাইলাম রাসবিহারীর প্রথম ঘোষণাপত্রে। রোগ সকলের অলক্ষে তখন রাক্ষসী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। শিশুর জীবন অতি সূক্ষ্ম সূতায় ঝুলিতেছে। জীবন-প্রদীপ বুঝি নির্ব্বাপিত হয়! প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন এক একটী যুগ। এই বুঝি আশার বর্ত্তিকা এক ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হয়। চাই দুরন্ত রোগের, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ ও পথ্য, কিন্তু

সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক স্নেহশীলা নিপুণা কর্ত্তব্যপরায়ণা অভিজ্ঞা ধাত্রী, যিনি দিবারাত্রি এই রোগক্লিষ্ট নবশিশুর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া সদা সতর্ক শুশ্রূষা করিবেন। রাসবিহারী এই গুরুদায়িত্ব স্বকীয় মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলেন! নানা লাঞ্ছনার মধ্যেও এই শিশুর সেবায় তিনি মুহূর্ত্তের জন্য অবহেলা করেন নাই। শিশু রোগ মুক্ত হইল, হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। ক্রমে শিশু শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল। রাসবিহারী তাঁহার এই অভিভাষণে, শিশুর উজ্জ্বল কৈশোরের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই সযত্ন পালিত সন্তানের পৌরষ ও কৃতিত্ব দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাসবিহারীর সে আশা আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইবে?

পশ্চিম রণাঙ্গণ ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীসাভারকার রাস-বিহারীর এক পত্র শ্রীসুভাষচন্দ্রকে দেখাইয়া তাঁহাকে দেশ ত্যাগের ও প্রবাসী ভারতবাসী ও ইংরাজ শত্রুর সহায়তায় আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈন্য লইয়া ভারতীয় বাহিনী গঠন করিবার পরামর্শ দেন। তখন সে পরামর্শ শ্রীসুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেশের মধ্যে থাকিয়াই মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত করিবার প্রযত্নে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস তাঁহার কর্ম্ম পদ্ধতি মানিয়া লইতে কেবল যে অস্বীকার

করিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। শ্রীসুভাষ কংগ্রেসের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী দল গঠন করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফলে ইংরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ ও পরে নিজগৃহে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা অপহরণ করিয়া একেবারে তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া দিলেন। এতদিনে সাভারকারের পরামর্শ তাঁহার চিন্তাপথে অবরূঢ় হইল। এইবার তিনি বুঝিলেন, প্রবাস হইতে মুক্তি যুদ্ধ চালাইবার পন্থাই সুপথ। এক্ষণে সেই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। ১৯৪১ সালের জানুযারী মাসে, ছদ্মবেশে নিজগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কাবুলে উত্তমচাঁদের গৃহে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই স্থান হইতে রুশিয়ায় প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুক্তি-যুদ্ধে কোন প্রকার সাহায্য করা দূরে থাক, রুশিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতেও অস্বীকার করিল। অবশেষে জার্মানদূতের সহায়তায় তিনি বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। তথায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল ও জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিবার প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। বার্লিন হইতে তিনি যে আকাশবাণী প্রচার করেন, তাহাতে তাঁহার দেশ-ত্যাগের উদ্দেশ্য, একসিস্ শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য, ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া অবশেষে ভারতবাসীকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন—'যে শক্তি আমাকে ভারতের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সে শক্তি উপযুক্ত সময়ে ভারতের ভিতরে প্রবেশেও বাধা দিতে পারিবে না।"

ছদ্মবেশে পলায়নে কৃতিত্ব কোথায় ? উচ্চ কণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিবার প্রয়োজন কি ? অনেকেই শ্রীসুভাষচন্দ্রের এই বাণীতে বীরত্বের অভিব্যক্তি মনে করিয়া, অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিয়া, এ কথা পুনঃ পুনঃ জনসমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সুভাষের বাণীর এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা তাঁহার কৃতিত্ব নহে, অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতাও নহে। ইহা তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসের নিদর্শন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নির্মম স্বদেশদ্রোহীও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

কিন্তু রাসবিহারীর আহ্বান স্বত্বেও তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনের দিকে ছুটিলেন কেন ? তাহার কারণ, ইউরোপের সহিত তিনি পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত, পশ্চিম একসিস্ শক্তির উপর তাঁহার দৃঢ় আস্থা। তিনি জাপানের সহিত পরিচিত নন, কৈশোরে সংবাদ-পত্রে রাসবিহারীর সামান্য পরিচয় যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি রাসবিহারীর উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। সুভাষ অনুমান করিয়াছিলেন পশ্চিম একসিস্ শক্তি তাঁহার কার্য্যে অধিক সহায়তা করিবে। এতদ্‌ব্যতীত তখন জার্মানীর বৈজয়ন্তী সমগ্র ইউরোপকে স্তম্ভিত করিয়াছে। জার্মান সেনাপতি রিবেনট্রপ তব্রুক অধিকার করিয়া আল আমিনে হানা দিয়াছেন। যেরূপ বিদ্যুৎ গতিতে জার্মান অগ্রসর হইতেছে, একবার তাহারা আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে উপস্থিত হইতে পারিলে ভারতের পশ্চিম দ্বার ভঙ্গ করিয়া স্থল, জল বা বিমানপথে ভারতে প্রবেশ করিবে। আমেরিকা

তখনও যুদ্ধে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারে নাই। তাহার উপর পার্ল-হারবারে প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন-নৌবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

একসিস্ শক্তি-শৃঙ্খলে ইতালী ছিল দুর্ব্বল গ্রন্থী। ইতালীর দুর্ব্বলতার জন্য রিবেনট্রপকে আল আমিন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎ হঠিতে হঠিতে অবশেষে আফ্রিকা পরিত্যাগ করিতে হইল। ইহারই অল্পদিন পরে ইটালীর দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। ভারতের পশ্চিম দ্বার ভঙ্গ করিয়া ভারতে প্রবেশের আশা শ্রীসুভাষচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে হইল। এতদিনে তিনি পূর্ব্ব রণাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এখনও আশা আছে, জাপান যদি পূর্ব্ব দ্বার দিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারে। তিনি জার্মান অধিনায়কদের সহায়তায় জাপান পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়েল বন্দর হইতে সুভাষচন্দ্র এক সাবমেরিনে যাত্রা করিলেন। সাবমেরিন প্রথম গ্রীণল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল, ও পরে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া আফ্রিকার শেষ সীমানায় উপস্থিত হইল। তিন দিন অবিরাম অন্বেষণের পর জার্মান ও জাপান সাবমেরিনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল। শ্রীসুভাষচন্দ্র জাপানী সাবমেরিনে সুমাত্রায় উপস্থিত হইলেন। সুমাত্রা হইতে সিঙ্গাপুর আর কতটুকু পথ! দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিবার পর এখন ত পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু শ্রীসুভাষচন্দ্র সুমাত্রা হইতে আকাশ পথে টোকিও যাত্রা করেন। অচিরে শ্রীসুভাষচন্দ্র জাপান-মন্ত্রীমণ্ডল ও সমর দপ্তরের সহিত আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীসুভাষচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না যে রাসবিহারী তখন সিঙ্গাপুরে। তিনি কেন রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় মুক্তি সঙ্ঘ ও মুক্তি বাহিনীর সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া, সরাসরি টোকিও যাত্রা করিলেন, সে প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে দেন নাই, এবং তাঁহার ভক্তমণ্ডলীও কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। এ প্রশ্ন যদি কাহারও মনে উদিত হয়, তাহা অবান্তর বা বিস্ময়কর হইবে না।

যাঁহারা শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের সহিত পরিচিত তাঁহারা সুভাষচন্দ্রের অকারণ ধৈর্য্যচ্যুতি, দুর্দ্দম্য নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা, এবং প্রদর্শনী ও চাকচিক্য প্রিয়তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। আজিও অনেকেরই নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, বাঙ্গলার স্বরাজ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব লইয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের সহিত শ্রীসুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। যতদিন বঙ্গরবি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জীবিত ছিলেন, তিনি বাঙ্গলার অপ্রতিহত মুকুটমনি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া উঠে এবং ইহার সমাপ্তি ঘটে দেশপ্রিয়ের দেহান্তে। এই নেতৃত্ব প্রিয়তার জন্য তিনি কার্য্যক্ষেত্রে বহু বাধা পাইয়াছেন। অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বহুল পরিমাণে সংযত করিলেও এ দোষ হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই, নতুবা তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অনলস কর্ম্মশক্তি তাঁহাকে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অপ্রতিহত নেতৃত্বের আসন দান করিত। কিন্তু দোষ কাহার নাই? দেবতারাও দোষ-গুণ-বর্জ্জিত

নহেন। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলিয়া কে চন্দ্র কিরণে স্নান করিতে পরাঙ্মুখ ?

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীরাসবিহারী বসুর মিলন ও ক্ষমতার হস্তান্তর

জাপানী মন্ত্রী সভা ও সমর দপ্তর বহু বিবেচনার পর ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কর্ত্তৃত্ব শ্রীসুভাষচন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীসুভাষচন্দ্র শুধু ভারতে সুপরিচিত কংগ্রেস নেতাই নহেন, তিনি কংগ্রেস অগ্রবর্ত্তীদলের নেতা। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীসুভাষচন্দ্রের নামের সহিত পরিচিত। আর রাসবিহারী ? রাসবিহারী ভারতে বিস্মৃত প্রায় ও যুব সঙ্ঘের নিকট এক প্রকার অপরিচিত।

সিঙ্গাপুরের জাপানী নায়ক কর্ণেল ইয়াকুরো এই প্রস্তাব পাইয়া বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। তিনি কি করিয়া রাসবিহারীকে এ প্রস্তাবের কথা জানাইবেন ? তিনি ত জানেন রাসবিহারীকে। তিনি ত দেখিয়াছেন রাসবিহারী কি বিপুল পরিশ্রমে আই এল এ ও আই এন এ গঠন করিয়াছেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুত্র-শোকে জর্জ্জরিত রাসবিহারীকে কি করিয়া জানাইবেন ? এ মুক্তি সঙ্ঘ যে রাসবিহারীর পুত্রাধিক স্নেহের ধন, জীবনের জীবন। কিন্তু একদিন সে কথা উত্থাপন করিতেই হইল। রাসবিহারী শুনিবা মাত্র বলিলেন—"সুভাষ যদি কর্ম্মভার গ্রহণ করেন ত বড়ই ভাল হয়। সুভাষের

অপেক্ষা যোগ্যপাত্র ত আমি দেখি না। এ গুরুদায়িত্ব থেকে এক সুভাষই আমায় মুক্তি দিতে পারে। আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, এ দায়িত্ব সুভাষের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে শেষের দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। নবরক্ত, নবকর্ম্মশক্তি আই, এন, এর আজ বড় প্রয়োজন।"

রাসবিহারীর উপরোক্ত উক্তি ক্ষমতালোভীর নিকট বড়ই বিস্ময়কর হইলেও কর্ম্মযোগীরই উপযুক্ত। কর্ম্ম কে নিষ্পন্ন করিবে তাহা বড় কথা নয়, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়াই বড় কথা। যে রাসবিহারী কর্ত্তব্য বোধে একদিন সমগ্র মুক্তি সঙ্ঘ ও মুক্তি সেনাবাহিনীর সকল কর্ম্মভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইতে কিছুমাত্র ভীত হন নাই, আজিও সেই কর্ম্মভার যোগ্য পাত্রের হস্তে তুলিয়া দিবার সময় কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। ক্ষমতা হস্তান্তরে তাঁহার কোন ক্ষোভ নাই।

১৯৪৩ সালের জুন মাসে রাসবিহারী টোকিও ফিরিলেন। তাঁহার জাপানী বন্ধুগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়া বিস্মিত হইলেন। যে ঋজু দেহ, দীপ্ত চক্ষু, উদ্যমশীল রাসবিহারীকে তাঁহারা ব্যংকক যাত্রার পূর্ব্বে বিদায় দিয়াছিলেন, তাঁহার স্থানে যাহাকে দেখিতেছেন, তাহার সহিত সে রাসবিহারীর সাদৃশ্য কোথায়? ব্যংকক যাইবার পূর্ব্বে রাসবিহারীর ওজন ছিল প্রায় ২ মণ ১০ সের। যে দিন তিনি টোকিও ফিরিলেন তাঁহার ওজন মাত্র ১ মণ ১০ সের।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে দিন রাসবিহারী টোকিও প্রবেশ করেন সে দিন তিনি ছিলেন নিঃস্ব, কিন্তু তখন তাঁহার উদ্যম ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, কর্ম্মশক্তি ছিল, আশা ছিল, সাহস ছিল। আজ কিছুই নাই, আজ তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত।

সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জীবনে এই প্রথমবার দুই মহাপ্রাণ বন্ধুর সাক্ষাৎ। একজন বহুদিন পথিকের শ্রান্তি দূর করিয়া অন্তিম সময়ে বাজ-দগ্ধ বটবৃক্ষ, আর একজন নব-বলে বলীয়ান উন্নত-শির উদ্যত যৌবন বটবৃক্ষ। একজন রিক্ত হইতে আসিয়াছেন, অপর জন গ্রহণ করিবার জন্য অধীর। সংসারের এই নিয়ম, পুরাতনের বিদায়, নূতনের অভ্যুদয় ও অভিনন্দন।

দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। সুভাষচন্দ্র ভারতের বাহিরে সত্বর ভারত-রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। রাসবিহারী কিছুতেই এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন না। সুভাষ বলিলেন—পোলাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম আজ শত্রু হস্তে, কিন্তু তাহারা যদি বিদেশে তাহাদের রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারে, তবে ভারতই বা পারিবে না কেন?" রাসবিহারী আপত্তি করিলেন, "ভারতের সহিত তাহাদের তুলনা ভুল। তাহাদের নেতৃবর্গ সকলেই দেশের বাহিরে। তাহারা সদ্য পরাজিত। যুদ্ধের অন্তিম ফল আজও নির্দ্ধারিত হয় নাই।………।" অবশেষে স্থির হইল, সাময়িকভাবে এক অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে, কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়া মাত্র ভারতীয়রাই

প্রকৃত রাষ্ট্র ও শাসন বিধি গঠন করিবে এবং এই অস্থায়ী রাষ্ট্রের সমাপ্তি ঘটিবে।

রাসবিহারী সিঙ্গাপুরে ফিরিয়াই এক ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি ২রা জুলাই আপনাদের ভারত হইতে আনিত এক অমূল্যনিধি উপহার দিব।" সকলেই রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। ক্ষণপরে রাসবিহারী সুভাষের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। জনসাধারণের মধ্যে এ সংবাদ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। দূর দূরান্তর হইতে ভারতবাসী সিঙ্গাপুরের দিকে ছুটিল। সকলের মুখে এক কথা—"চল সিঙ্গাপুর, চল সিঙ্গাপুর"।

২রা জুলাই দুই বন্ধু সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। জনতা আনন্দ নির্ঘোষের সহিত দুই বন্ধুকে মাল্য ও অর্ঘ্য দান করিয়া অভিনন্দন করিল। দুইজনের মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিল। সভা মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ হইল। পরে বন্দনা-সঙ্গীত দ্বারা কুমারী সরস্বতী সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন।

রাসবিহারী শ্রীসুভাষচন্দ্রকে উপযুক্তভাবে পরিচিত ও অভিনন্দিত করিয়া পরিশেষে বলিলেন "ভাই সব! আই, এন, এর জীবনে আজ এক পবিত্র দিন। আজ আই, এন, এ, একসঙ্গে কয়েকটী সোপান সহজে অতিক্রম করিল কেবল শ্রীসুভাষের আগমনে। আমি মনে করি সুভাষ ব্যতীত আর কোন যোগ্য ব্যক্তি নাই যিনি আই, এন, এর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন।

তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের সকলকে ধন্য করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আজ শ্রীসুভাষচন্দ্রের হস্তে আই, এন, এর সকল দায়িত্ব তুলিয়া দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিব। আজ হইতে তিনি ভারত মুক্তি যুদ্ধের নেতা।"

এই সভায় সর্ব্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া নেতাজী এক দীর্ঘ অভিভাষণ দেন। এই ভাষণ বহুস্থানে উদ্ধৃত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। সেই দিন নেতাজী সভাস্থ জনসাধারণকে বলেন, "আমাদের আজ হইতে কেবল একমাত্র বাণী হইবে "দিল্লী চল, দিল্লী চল।" রাসবিহারী এই সভায় প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন।

সিঙ্গাপুরের এই বিরাট সভা স্মরণ করিয়ে দেয় কলিকাতার মহা কংগ্রেস সম্মেলনকে। স্বর্গগত মতিলাল নেহেরু এই কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস নগরীর সিংহদ্বারে সৈন্যাধ্যক্ষরূপে সজ্জিত শ্রীসুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ভারতে ইংরাজের গৌরব-রবি তখনও মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে নাই। সে দিন সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্ব ছিল, তাস-গৃহের অধিনায়কত্ব। এতদিনে তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন সত্য হইল।

ভারতেও এই সংবাদ পৌছিল। এই প্রথম ভারত শুনিল সুভাষচন্দ্রের কথা, রাসবিহারীর কথা, আই, এন, এর কথা আরও অনেক কথা। তাই অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা যে শ্রীসুভাষচন্দ্র আই, এন, এর স্রষ্টা। রাসবিহারীরই প্রকৃত উহার স্রষ্টা ও কৃষ্টি প্রদায়ক।

৪ঠা জুলাই নেতাজী রাসবিহারীর সহিত একত্রে সিঙ্গাপুর সিটি হলের সম্মুখে আই, এন, এ পরিদর্শন করিয়া অভিবাদন গ্রহণ করেন। ঐ দিন নেতাজী আবেগময়ী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন তাহা জাতীয় ইতিহাসে অতি অমূল্য বস্তু। নেতাজীর বাগ্মীতায় উদ্বেলিত আই, এন, এ পুনঃপুনঃ জয়ধ্বনি করিতে থাকে।

রাসবিহারী আই, এন, এর ধমনীতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন কর্ম্মোন্মাদনা, নেতাজী স্নায়ুতে সঞ্চারিত করিলেন ভাবোন্মাদনা। ভক্তি আসিয়া কর্ম্মের হাত ধরিল। দেখিতে দেখিতে আই, এন, এ, প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠিল ও শীঘ্রই রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু সে ইতিহাস স্বতন্ত্র।

রাসবিহারী অসুস্থ ও রোগশয্যায়

রাসবিহারী টোকিও ফিরিয়াছেন। রাসবিহারী অসুস্থ।

কর্ম্মোন্মাদনা যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে, তখন মানুষ সর্ব্ব-বিস্মৃত হয়। তখন নিজ দেহ ও স্বাস্থ্য, গৃহ, আত্মীয় স্বজন, সম্পদ প্রভৃতি কোন কথাই মনে থাকে না। কিন্তু তজ্জন্য অন্যান্য দেহ ও মনোবৃত্তি নীরব থাকে না। তাহারা নিজ দাবী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া চলিয়া যায়—শত অনুরোধে তাহারা আর ফিরিয়া চাহে না।

আজ আর রাসবিহারীর সে কর্ম্মোন্মাদনা নাই। আজ প্রচুর অবসর। রাসবিহারী সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে

বিরাট শূন্যতা ,পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, চলিবার পথে যে সকল অমূল্য ধন আপন হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, সে সকলই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর অবশিষ্ট কিছু নাই। না, কিছু নাই। রাসবিহারী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে শয্যা গ্রহণ করিলেন। শয্যাশায়ী রাসবিহারী মাতৃভূমির স্নেহময় কোলে আশ্রয়ের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাল্যের লীলা ভূমি, নদী তীরবর্ত্তী গ্রামখানির পর্ণ কুটির, তাঁহাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মাতৃকোলে আশ্রয় পাইবার ত কোন উপায় হইল না। এ দেহে, এ জীবনে বুঝি তাহা হইবার নহে। যখনই আকুল হইয়া উঠিতেন, তখনই 'বন্দেমাতরম' গাহিয়া উঠিতেন। ক্ষণেকের জন্য তৃপ্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিত।

আজ পিতামহ, পিতামহী, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী সকলকে দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহ, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই ইহজগতে নাই। নাই অনেক কিছুই—তোষিকো ও মাসাহিদে নাই। স্মৃতি উঠিল হাহাকার করিয়া।

শ্রীমতী সোমা ও তেতুকু অবিশ্রান্ত তাহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার একান্ত ভক্ত দেশপাণ্ডে ও দুই বাঙ্গালী যুবক দিবারাত্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাঁহাকে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ও গীতা হইতে কর্ম্মযোগ ও বিশ্বরূপ পড়িয়া শুনাইতেছেন, কিন্তু রোগের কোন উপশম নাই। তিনি ক্রমশঃই অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন। এমন সময়ে নেতাজীর নিকট

টোকিওতে রাসবিহারীর সমাধি স্তুপ

হইতে অতি নিদারুণ সংবাদ আসিল "মুক্তি সেনা কোহিমা ও ইম্ফল রণক্ষেত্রে পরাজিত ও বিধ্বস্ত। জাপান কোহিমা অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। নেতাজী হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।" এ দুঃসংবাদ পাইয়া রাসবিহারী নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার নয়ন বহিয়া বেদনাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। মাতৃবন্দনার ক্ষমতা হারাইয়া গেল। ওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হাতের ইঙ্গিতে বাঙ্গালী যুবকদ্বয় 'বন্দেমাতরম' শুনাইতে লাগিল।

রাসবিহারীর মহাপ্রয়াণ

কবি গাহিয়াছেন "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে ?" জন্ম যদি সত্য হয়, মৃত্যু তদপেক্ষাও কঠিন সত্য। যে মৃত্যুকে রাসবিহারী বার বার দূরে সরাইয়া দিয়াছেন, আজ সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, আকুল হইয়া দুইহাত বাড়াইয়া দিয়াছেন !

১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারী রাসবিহারীর প্রাণবায়ু অনন্তে মিলাইয়া গেল, পড়িয়া রহিল অসাড় দেহ। মান অপমান, আবাহন, উপেক্ষা, সম্পদ, বিপদ, জয় পরাজয়, সকলই উপেক্ষা করিয়া তিনি মহাকালে বিলীন হইলেন। কালজয়ী পুরুষ কালের কোলে আশ্রয় লইলেন।

তেতুকু ও শ্রীমতী সোমা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সমগ্র জাপান এই পুরুষ প্রবরের মহাপ্রয়াণে শোক দিবস পালন

করিল। জাপান ইতিপূর্ব্বে রাসবিহারীকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে টোকিওতে তাঁহার সমাধি-স্তুপ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন।

কয়েকদিন পরেই নেতাজী আকাশ বাণী করিলেন—আজ রাসবিহারী নাই। এযে কত বড় নাই, তাহা আমার মত করিয়া কেহ বুঝিবে না। আজ এই দুর্দ্দিনে তাঁহাকে বড় প্রয়োজন ছিল। যে দিন রাসবিহারী শুনিলেন, কোহিমা ও ইম্ফলে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াও আমরা বিফল ও ভগ্নোদ্যম হইয়াছি, আমি শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, সেই দিন তিনি রোগ শয্যায়। তবু তিনি জানাইলেন—

"বন্ধু! আজীবন মুক্তি যুদ্ধ চালাইয়া আমি বার বার পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করি নাই। ওঠো বীর! আবার দাঁড়াও, আবার নূতন করিয়া মুক্তি-যুদ্ধে অস্ত্র যোজনা কর। ভারতের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত।"—আমার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। আমি কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। এ কথা রাসবিহারীই বলিতে পারিতেন।

একটী কথা এখনও বলা হয় নাই। বলা প্রয়োজন মনে করি। বিজনবিহারী ১৯৪৪ সালের শেষভাগে পাটনায় বদলি হইলেন। পথে তাঁহার আকাশবাণী যন্ত্রটী বিকল হইয়া যায়। সময় অভাবে তাহা সংস্কৃত হয় নাই। ২১শে জানুয়ারী কার্য্য হইতে ফিরিয়া বিজনবিহারী যন্ত্রটী সংস্কার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যন্ত্রটী সংস্কার করিতে করিতে প্রায় রাত্রি ৮টা বাজিয়া

গেল। বিজনবিহারীর পত্নী যন্ত্র সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আহারের জন্য বলিয়া বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন। তিনি আর সকলকে আহার করাইতেছেন। বিজনবিহারী একা যন্ত্র লইয়া ব্যস্ত। রাত্রি ৯টার সময় আকাশবাণী যন্ত্রে সহসা ভাসিয়া আসিল অতি নিদারুণ সংবাদ—"রাসবিহারী নাই, জাপান শোক দিবস পালন করিতেছে।" বিজনবিহারী অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলেন। যন্ত্র নিস্তব্ধ। পত্নী আসিয়া দেখিলেন, স্বামীর দুই চক্ষু বাহিয়া জলধারা পড়িতেছে। কাতর হইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া তিনিও সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

পরদিন সংবাদ পত্রে বিজনবিহারী সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। সেদিন কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরদিন 'ষ্টেটসম্যানে' রাসবিহারীর 'মহাপ্রয়াণ' সংবাদ প্রকাশিত হইল।

এই ঘটনার সহিত কি রাসবিহারীর আত্মার যোগ ছিল ? শেষ প্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি কি ভ্রাতাকে পার্শ্বে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন ? রাসবিহারী কি ভ্রাতাকে কিছু নির্দ্দেশ দিতে চাহিয়াছিলেন ?—জানি না।

সাভারকারের মন্তব্য

আজ নেতাজী নাই, আজ রাসবিহারী নাই। বাঙ্গলা ব্যতীত আর সকলেই নেতাজীকে ভুলিয়াছে। রাসবিহারীকেত ভুলিবেই।

এই দুই মনিষীর বিষয়ে একজন আজীবন বিপ্লবী অবাঙ্গালী কি বলিয়াছেন তাহাই উদ্বৃত করিব। শ্রীসাভারকার বলিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব এশিয়ায় রাসবিহারী যে মুক্তি সৈন্য বাহিনী গঠন করেন, আজন্ম-অধিনায়ক সুভাষ, নেতাজী নাম গ্রহণ করিয়া সেই সৈন্যবাহিনী লইয়াই গ্যারিবল্ডির মত রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। জগৎ-বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারীর অনন্যসাধারণ মনঃশক্তি শক্তিশালী লেখনী, অপূর্ব্ব গঠন শক্তি পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় মুক্তি-সঙ্ঘ গঠন করিতে সমর্থ হয়। ভারতের মুক্তি-যুদ্ধে রাসবিহারীর অবদান অপরিসীম। এই সদা বিপ্লবীর নিকট নেতাজী সুভাষ, আই, এন, এ এবং ভারতবর্ষ অচ্ছেদ্য ঋণে ঋণী।

যাহারা বলেন ১৯৪২ এর যুদ্ধের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহারা হাস্যকর কথাই আবৃত্তি করেন। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই দিন হইতে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে, যে দিন রাসবিহারী ও নেতাজী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দেশ-প্রেমের বীজ রোপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রাসবিহারী অক্লান্ত পরিশ্রমে যে আই, এন, এ গঠন করিয়াছিলেন, নেতাজী তাহারই ফল আস্বাদন করিয়াছেন।"

বিদায় প্রার্থনা

রাসবিহারী প্রত্যেক মুক্তি সাধককে বার বার নমস্কার জানাইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করিয়াছেন। বাঙ্গলার সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ভূপেন্দ্র, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ, নেতাজী প্রভৃতি পরিচিত অপরিচিত মহাপ্রাণ মুক্তি সাধকদের বৈশিষ্ট্য, তাঁহারা মাতৃযজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছেন।

তাঁহারা কিছু রাখিয়া কিছু দেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বস্ব দিয়া ফকিরী লইয়াছিলেন। তাঁহাদের পায়ে অসংখ্য প্রণাম।

তাঁহারা কি এই ছিন্নাঙ্গ ভারত চাহিয়াছিলেন? এই ছিন্নাঙ্গ খণ্ডিত ভারত তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহাদের আত্মা ছিন্নাঙ্গ ভারত দেখিয়া অবিরাম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। এ ভ্রাতৃবিরোধ অসহনীয়। এ খণ্ডিত ভারত প্রত্যেক ভারতীয়ের কলঙ্ক। এ কলঙ্ক অবিলম্বে মোচন করা উচিত। আমার মনে হয় সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এ কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি।

বাঙ্গালী! এ কলঙ্ক তোমাকেও স্পর্শ করিয়াছে। বাঙ্গালী সন্তান ফকিরী লও। কর্ম্মসাধনায় অগ্রণী হও। ঐক্যবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হও। নিশ্চয়ই সাফল্য তোমার পদচুম্বন করিবে। খণ্ডিত ভারত অখণ্ড হইবে। পাইব কি আর মায়ের সে অমল কমল পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে? বিধাতা জানেন, কবে হবে সে দিনের উদয়।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

রাসবিহারীর জীবনকথা রচনা করিয়া মুদ্রণের জন্য প্রেরণের পূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মী যাঁহারা আজও জীবিত আছেন, তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। সেইজন্য ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা থাকা স্বত্ত্বেও আলোকপাত করিতে সাহসী হই নাই। অতি অসম্ভব ঘটনা সংঘাতে আজ কয়েকজন রাসবিহারীর একান্ত কর্ম্মানুরাগী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ আলোচনা হইয়াছে। পরিশিষ্টে সেই আলোচনারই সারাংশ সন্নিবেশিত হইল।

১। বিপ্লবী বীর উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রাসবিহারীর একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী। বিপ্লব ক্ষেত্রে যাঁহারা স্বীয় দৃঢ়তা ও নিষ্কলুষ চরিত্রগুণে নেতৃস্থান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। অমরেন্দ্র এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি ধনীর সন্তান, শিক্ষিত ও উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট জমীদার পুত্র। অতি অল্পদিনেই তিনি কলিকাতায় ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং এই কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ না করিলে ধনী ও বনিকসমাজের মুকুটমনি হইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র দেশমাতৃকার আহ্বানে

সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশসেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম, তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার নিরহঙ্কার ব্যবহার, ও সর্ব্বোপরি তাঁহার বিচক্ষণতা তাঁহাকে মুক্তি সেনানায়ক পদে বরণ করে। মাতৃসেবায় তিনি প্রায় নিঃস্ব কিন্তু মাতৃপ্রসাদে এই বার্দ্ধক্যেও তাঁহার ঋজু দেহ, আনন্দপ্রভায় সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল যে দেখিবে সেই বিস্মিত হইবে। অমরেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরপাড়ার বহু তরুণ মহোৎসাহে মাতৃসেবায় আত্মনিয়োগ করে। এই অমরেন্দ্র বলেন—"ডেরাডুন অবস্থান-কালে রাসবিহারী তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা, সততা ও পরোপকার বৃত্তির জন্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় সমাজেরই স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকে রাসবিহারী বাঙ্গলা শিখাইতেন। তাঁহাদেরই সাহচর্য্যে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা প্রসারলাভ করে। ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা মিঃ ডেনহাম বাঙ্গলার বিপ্লবীদের বিষয়ে সবিশেষ সংবাদ সংগ্রহের জন্য একজন উপযুক্ত, দক্ষ, নির্ভরযোগ্য ভারতীয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ডেরাডুনের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের মুখে রাসবিহারীর কর্ম্মদক্ষতার বিপুল প্রশংসা শুনিয়া রাসবিহারীকে গোপনে ডাকাইয়া মিঃ ডেনহাম তাহার উপর উপরোক্ত কর্ম্মভার অর্পণ করিলেন ও প্রভূত অর্থের লোভও দেখাইলেন। এই কর্ম্মের ভার লইয়া মিঃ ডেনহামের বিশ্বস্ত গুপ্তচররূপে রাসবিহারী বাঙ্গলাদেশে হানা দিলেন।

একদিন ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে লইয়া রাসবিহারী কলিকাতায় হ্যারিসন রোডের ওয়াই, এম, সি এর নিম্নতলে শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড নামক তৎকালীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রথম দর্শনেই আমি রাসবিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হই ও পরে দৃঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবার পর রাসবিহারী নিজ কৈশোর স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিলেন। রাসবিহারী অবশেষে বলিলেন—"এ হয়ত আমার ইংরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু দেশের মুক্তি যেখানে বিপন্ন সেখানে এ বিশ্বাসঘাতকতা কতটুকু পাপ। আমি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমার কৈশোর স্বপ্ন বিফল হতে দিতে পারি না। ইহার জন্য যে পাপ হইবে তাহার ফলভোগ করিতে আমি কাতর নহি।"

অতঃপর রাসবিহারী যুগান্তর বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইহার পর রাসবিহারী ও শ্রীশের সহিত বিপ্লব পন্থা লইয়া বহু আলোচনা হয়। এই সময়েই রাসবিহারী উত্তর ভারতে বিপ্লবাগ্নি জ্বালাইবার সঙ্কল্প ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই সময় বসন্তবিহারী বিশ্বাস ও তাঁহার ভ্রাতা মন্মথ আমার সহকারীরূপে কাজ করিতেছিলেন। রাসবিহারী তাঁহাদের কর্মকুশলতায় ও দৃঢ়চিত্ততায় আকৃষ্ট হইয়া আমার নিকট এই যুবকদ্বয়কে প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। আমারই

নির্দ্দেশে ভ্রাতৃযুগল রাসবিহারীর সহিত ডেরাডুন যাত্রা করেন। এই বসন্তই শত্রুহস্তে বন্দী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাসবিহারীর দক্ষিণহস্ত ছিলেন। বসন্তই রাসবিহারীর নির্দ্দেশমত এক গলির মুখে দাঁড়াইয়া জনতার মধ্য হইতে একটী বোমা লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করেন। অচিরে দিল্লী ত্যাগ করিয়া বসন্ত কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকদিনের জন্য নিজবাটী গমন করেন। বসন্ত ধৃত হইলে ও তাঁহার বিচার আরম্ভ হইলে আমিই মিঃ এস, কে, সেনকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিযুক্ত করি। এই বোমা ব্যাপারে বসন্ত, আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ ও অবোধবিহারীর ফাঁসী হয়। ইঁহারা সকলেই রাসবিহারীর গুণমুগ্ধ অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্ম্মী। বোমা নিক্ষেপের পর রাসবিহারী চন্দননগরে ছিলেন। সংবাদপত্রে একজন একান্ত ঘনিষ্ট সহকর্ম্মীর (সম্ভবতঃ অবোধবিহারী বা বালমুকুন্দের) ধৃত হইবার সংবাদ পাইয়া রাসবিহারী তৎপর ডেরাডুন রওনা হন ও স্বীয় নাম পুলিশের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া আত্মগোপন করেন। রাসবিহারী আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সর্ব্বশক্তি বিপ্লবে নিয়োগ করিলেন। বিপ্লবাগ্নি ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য উল্কারমত তিনি লক্ষ্যের দিকে ছুটিতে লাগিলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র লইয়া যতীন (বাঘা) ও নরেন্দ্রের (মানবেন্দ্র) সহিত রাসবিহারীর কাশী, চন্দননগর ও অন্যান্য

স্থানে পুনঃ পুনঃ আলোচনা হয়। এই সময় মন্মথ ছিল রাসবিহারীর পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী।”

অমরেন্দ্র কথা প্রসঙ্গে বলিয়া চলিলেন—“তুমি কতদূর জান, জানি না। উত্তরপাড়া ও চন্দননগর এ দুইটী স্থানেই তখন শিক্ষিতের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। এই দুইটী স্থানই বিপ্লবের কেন্দ্র হইয়া উঠে। চন্দননগর ফরাসী অধীনে থাকায় চন্দননগরে বিপ্লবের বিস্তৃতি ঘটে অতি শীঘ্র। চন্দননগর কতটুকু স্থান! চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডী তলায় ও গোণ্ডল-পাড়ায় দুইটী স্বতন্ত্র বিপ্লব কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি ‘এ যেন কে আগে মাথা দেবে তারই লাগি তাড়াতাড়ি।’ এই দুই বিপ্লবদল পৃথক হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় কার্য্য করিয়া চলিত। ইহা ছাড়া এই দুই দল স্বতন্ত্র থাকিবার বিশেষ আবশ্যকতাও ছিল। ভাবিয়া দেখ একটী দল সহরের উত্তর প্রান্তে অপরটী সহরের দক্ষিণ প্রান্তে। উভয়দলেরই সহিত রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দিল্লীতে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপের কল্পনা রাসবিহারীর। আমার ও শ্রীশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়াই দিল্লীতে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের জন্য রাসবিহারী একটী বোমা লইয়া যায়। এই বোমা নরেন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের নিকট হইতে আনিয়া শ্রীশকে দেন। জানো রাসবিহারীর এই বোমা নিক্ষেপের মধ্যে একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য্য আছে?”

অমরেন্দ্র ভাবমগ্ন হইলেন। তাঁহার চক্ষু দুটী নিমিলিত-প্রায়। তিনি যেন অতীতের মধ্যে একটী একটী করিয়া রত্ন পরীক্ষা করিতেছেন। সহসা তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিয়া উঠিল—

"জানো? আমি রাসবিহারী, যতীন, মানবেন্দ্র সকলকেই দেখিয়াছি। শুধু দেখিয়াছি কেন, স্থানে স্থানে একত্রে কার্য্যও করিয়াছি। ইঁহারা সকলেই যুগ-পুরুষ, ভারতমাতার বরদৃপ্ত পুত্র। ভারতের ইতিহাসকে নবরূপ দিবার জন্য ইঁহাদের জন্ম। ইঁহারা সকলেই আমার জীবনে গভীর দাগ রেখে গেছেন কিন্তু গভীরতম দাগ রেখে গেছেন—শ্রীশচন্দ্র। নেতৃত্ব পাগল সকলেই, রঙ্গমঞ্চে নায়ক সাজিবার জন্য দেখ নাই অভিনেতাদের মধ্যে কি আগ্রহ? কিন্তু এইখানেই শ্রীশ আমাদের সকলের চেয়ে বড়। যখনই দুর্দান্ত দুঃসাহসী কার্য্যের সম্মুখীন হইবার লোকের অভাব অনুভব করিয়াছি তখনই দেখিয়াছি স্মিতমুখে শ্রীশ অগ্রসর হইয়াছে। যখনই শ্রীশের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে, তাঁহার নিরহঙ্কার, নীরব স্বার্থশূন্য দেশভক্তি ও অদম্য কর্ম্মশক্তির কথা মনে পড়িয়া আমায় অভিভূত করিয়া দেয়। দুঃখ হয় শ্রীশের শেষ জীবনের কথা ভাবিয়া। শেষটায় শ্রীশকে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া একান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। যে দুই একজন সহকর্ম্মী তাঁহার ঋণের কথা ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহারাও তখন বিপর্য্যস্ত, তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ক্লেশ লাঘব করিতে

পারেন নাই। দারিদ্র্যের ক্লেশ তাহাকে হত্যা করে নাই, হত্যা করিয়াছে অভিন্ন হৃদয় বন্ধুদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা। স্বার্থোদ্দেশ্যে বন্ধু যখন লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন করে তখন বড়ই ব্যথিত করে। এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়াই শ্রীশ অকালে দেহ বলি দিল।

অসম সাহসিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রীশের অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাকে বজ্রের মত বাজিয়াছে। এই সর্ব্বত্যাগী পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে আমি নিয়ত আমার ভক্তিশ্রদ্ধা জানাই। আমিও একখানি পুস্তক রচনা করিতেছি তাহাতে খানিকটা অংশ শ্রীশ অধিকার করিয়া আছেন।"

অমরেন্দ্র ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"জানো? প্রেম জাত কুলের পরিচয় খোঁজে না, আমরাও ঠিক তাই ছিলাম। একই ভাবের টানে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে একসঙ্গে এক দরিয়ায় ভাসিয়াছি। কেহ কাহারও কুলশীল পরিচয়, শিক্ষা, দীক্ষা লইয়া মাথা ঘামাই নাই। তাই কোন ফুল কোথা হইতে আসিয়া নিবেদিত হইল মাতৃপূজায়, তাহার খোঁজ কেহ রাখে নাই। সেইজন্য আমাদের কাহারও জীবনের পূর্ব্বাপর চিত্র আমাদের জানা নেই। আমাদের নিকট তাহা একান্ত অবান্তর, নিতান্ত অনাবশ্যক ছিল। তবুও আমার মনে হয় বিপ্লব জীবনের প্রথমে শ্রীশ ছিলেন রাসবিহারীর কর্ম্মোৎসাহের মূল প্রেরণা। মনে করো না আমি রাসবিহারীকে ছোট করিতেছি, মোটেই তা নয়। রাসবিহারীর ধী ও প্রতিভা

অনন্যসাধারণ, তাঁহার ঐকান্তিকতা আদর্শযোগ্য, তবুও শ্রীশের মত অন্তরঙ্গ বন্ধুর আবশ্যকতা সর্ব্ব কর্ম্মোন্মাদনার মূলে প্রয়োজন ছিল তাহাই বলিতে চাহিতেছি।

তুমি হয়ত বলিবে দুইজনের প্রকৃতির মধ্যে একটা বড় রকমের ভেদ ছিল। হাঁ, সত্যই তাদের বহিঃপ্রকৃতিতে বিশেষ পার্থ্যক্য ছিল। রাসবিহারী ছিলেন সগুণের পূজারী, তাই তাঁহার পূজায় ছিল রাজসিক উপচার আর শ্রীশ ছিলেন নির্গুণের পূজারী তাই তাঁহার পূজা হৃদয়স্থিত ভক্তিতেই সমাপ্ত হইত।" পরিশেষে অমরেন্দ্র বলিলেন—"রাত অনেক হইল। তোমার আবার ফিরিতে হইবে। তুমি বড় আপন জন। তুমি রাসবিহারীর ভাই। আমি যতটুকু পড়িলাম তাহাতে তোমার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি, তোমার বিশ্লেষণ শক্তিও লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলে হয়। আমি সবটা দেখিয়া একটী পরিশিষ্ট লিখিব। তারপর শ্রীশের জীবন-চিত্র দেখিবার আশা রাখি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি এই মহৎ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হও।"

২। অনুসন্ধানে ও পুরাতন তৎকালিক পত্রাদি হইতে জানিতে পারিলাম—

(১) রাসবিহারী অঙ্গুলীতে যে সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত বহন করিয়াছিলেন তাহা কিরূপে সংঘটিত হয়। রাসবিহারী বাদুড় বাগানের এক বাসা-বাটীতে প্রতুল গাঙ্গুলী, শশাঙ্ক, শচীন সান্ন্যাল প্রভৃতির সহিত বিপ্লব পন্থা ও তাহার

প্রসার লইয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতেন। তিনি সাধারণ রাজকর্ম্মচারীর হত্যা বা ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহের সর্ব্বদা বিপক্ষতা করিতেন। তাঁহার মুখের কথাই ছিল—"মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার"। একদিন রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রের সহিত এই বাসা বাটীতে কয়েকটী সংগৃহীত পুরাতন পিস্তল পরীক্ষা করিতেছিলেন। একটী গুলীভরা পিস্তল হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার অঙ্গুলী বিদীর্ণ করে। রাসবিহারী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। নিকটেই সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানা। যদি গুলীর সংবাদ পাইয়া থানা সচেতন হইয়া উঠিয়া তৎপর অনুসন্ধান করে এই আশঙ্কায় শ্রীশ রাসবিহারীকে লইয়া তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করেন। অন্যান্য বিপ্লবীরা স্থানটী পরিষ্কৃত করিয়া অবিলম্বে বাসা ত্যাগ করেন। প্রকৃতই শ্রীশ ছিলেন রাসবিহারীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বন্ধুর জন্য কোন বিপদই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

(২) ১৯২০।২১ সালে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-গুরু মতিলাল রায় তিন জন বিপ্লবীর মুক্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। ইঁহারা অতুলচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল হাজরা ও রাসবিহারী বসু। প্রথম দুইজন তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে মুক্তিলাভ করেন। রাসবিহারীকে সরকার মুক্তি দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

৩। সৌভাগ্যক্রমে আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী শ্রীঅনুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় আই, এন, এর বিশিষ্টকর্ম্মী

শ্রীদেবনাথ দাশের সহিত পরিচয় ও আলোচনা হয়। রাসবিহারীর কথা প্রসঙ্গে তিনি মুখর হইয়া উঠেন ও একটী কথার উপর জোর দিয়া বলেন—

"রাসবিহারী যদি সারা জীবন দেশের জন্য কিছুই না করিতেন তবুও একটী কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমার বিশ্বাস এ কার্য্য কেবল রাসবিহারীরই পক্ষে সাধ্য ছিল, ভারতীয় অন্য কোন নেতার পক্ষেই তাহা সম্ভব ছিল না। যখন বিজয়ী জাপান পঞ্চসহস্র বিমানপোত লইয়া পুণ্য ভারতভূমি শ্মশানে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন একমাত্র রাসবিহারীর আপ্রাণ চেষ্টায় ভারত সে দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার সারগর্ভ যুক্তি ও তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি জাপান সমর-বিভাগ ও প্রধান মন্ত্রীকে স্বীকার করিয়া লইয়া এই বিমান আক্রমণ স্থগিত করিতে হইয়াছিল। আমি রাসবিহারীর সচীবরূপে মালয়ে কার্য্য করিয়াছি। আমি জানি যখন তিনি জাপানের বিমান আক্রমণ ও আয়োজনের কথা জানিতে পারেন তখন তাঁর কি আকুতি, কি উদ্বেগ, কি উত্তেজনা এবং অহোরাত্র কি পরিশ্রম।

৪। শ্রীবীর সাভারকরের সচীব শ্রীবাল পত্রোত্তরে জানাইয়াছেন :—

সাভারকারজীর স্বাস্থ্য অতীব শোচনীয়। সেই কারণে তিনি আর জনসাধারণের হিতকর কোন কর্ম্মে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না।

আপনি পরলোকগত ডাক্তার রাসবিহারী বসুর জীবন কথা রচনা করিতেছেন শুনিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। ভারতের মুক্তি সাধনের জন্য রাসবিহারী আজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী রাসবিহারীর নিকট অচ্ছেদ্য ঋণে ঋণী।

আপনি রাসবিহারীর যে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানির কথা লিখিয়াছেন তাহা রক্ষা করা সেই বিপ্লবী যুগে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। ইংরাজ রাজ-সরকারের গুপ্তচর ও পুলিশ যে কোন মূহূর্ত্তে কারণে অকারণে সকল বিপ্লবীর বাসাবাটী খানা তল্লাসী করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না। এরূপ চিঠি সংগ্রহ করিয়া রাখা নিতান্ত নির্ব্বোধিতাই নহে প্রকারন্তরে তাহা বৃটিশের সহায়ক হইত ও বিপ্লবীদের প্রতি অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইত। এই কারণে রাসবিহারীর সহিত বহু পত্রের আদান প্রদান হইলেও তাঁহার কোন পত্রই রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং কোন পত্রই তাঁহার নিকট নাই যদিও অনেক পত্রের বিষয় বস্তু আজও তিনি বিস্মৃত হন নাই।

রাসবিহারীর যে পত্র তিনি নেতাজীকে দেখান তাহা দুই একদিন পূর্ব্বেই সাভারকারজীর হস্তগত হয় এবং তখনও বিনষ্ট করা হয় নাই। এ পত্র সাধারণ সরকারী পোষ্টে আসে নাই, আসা সম্ভবপরও ছিল না। ডাক্তার বসু চতুরতার সহিত অতি গুপ্ত পথে এই পত্র প্রেরণ করেন।

৫। শ্রীযুক্ত আর্য্য পেশোয়া রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ লিখিয়াছেন :—
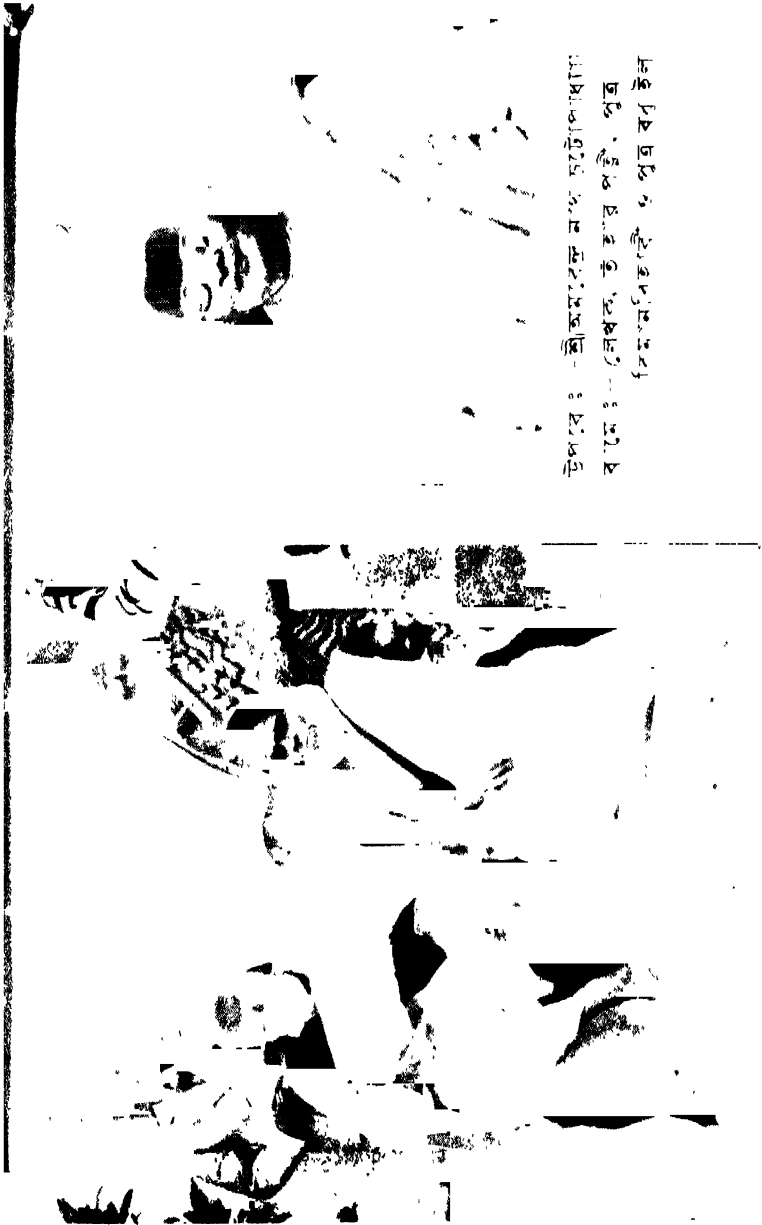
উপরে :- শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
বামে :- লেখক, তাঁহার পত্নী, পুত্র
বিমানবিহারী ও পুত্র বধূ ইলা

আমি জানিতামই না যে আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীমান রাসবিহারীর কোন ভ্রাতা ছিলেন বা আছেন। আপনি রাসবিহারীর জীবন কথা লিখিতেছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার সফলতা কামনা করি। এই মহৎ কর্ম্মে সকলেরই উৎসাহ দান কর্ত্তব্য। রাসবিহারীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা কিরূপে ঘটে তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে দিলাম।

১৯২৭ সালে শীতের পরেই আমি জাপানে পৌঁছাই। শ্রীসাবর ওয়ালার সহিত রাসবিহারীর বাটী উপস্থিত হইলাম। রাসবিহারী কি আগ্রহের সহিত, কি আন্তরিকতার সহিত আমায় গ্রহণ করেন! কি করিয়া অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন তাহা যেন তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। দুইদিন রাসবিহারীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমি হোটেলে আশ্রয় লই। জাপানী নেতা শ্রী টোয়ামার সহিত রাসবিহারী আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। এই পরিচয় ক্ষেত্রে রাসবিহারী ও টোয়ামার সহিত আমার এক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। এই চিত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সমগ্র জাপানের জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া পড়ি। ইহার পর স্থায়ীভাবে আমি এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমরা প্রায়ই একত্র হইতাম, ও একত্রে সান্ধ্য ভোজন করিতে করিতে আলোচনা করিতাম। রাসবিহারীর চেষ্টায় বহু সভা আহূত হয়। আমরা উভয়ে এই সকল সভায় বক্তৃতা দিতাম।

১৯২৫ সালে যখন পুনর্ব্বার জাপান প্রদর্শন করি, রাসবিহারীর যত্নে জাপানে আমি বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করি। রাসবিহারী জাপানী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন।

১৯২৬ সালে পাসপোর্টের অভাবে আমাকে জাপান পরিত্যাগ করিতে বলা হয়। যাহাতে আমাকে জাপান ত্যাগ করিতে না হয় সে জন্য রাসবিহারী বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়—আমায় অবশেষে জাপান ত্যাগ করিতে হয়।

রাসবিহারী ও আমি একই মহতী মুক্তি সেনার দুই জন সৈনিক মাত্র। আমরা পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ দিয়া মুক্তি যুদ্ধ করিয়াছি। ১৯২৭ সালে রাসবিহারী তাঁহার 'রনিন' বন্ধুদের সহায়তায় এক সম্বর্দ্ধনা সভার আহ্বান করেন।

আমরা উভয়ে বহু সভা ও সমিতিতে একত্রে বক্তৃতা করিয়াছি। ১৯৪০ সালে আমরা উভয়ে ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করি। আমি সভাপতি ও রাসবিহারী সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

আপনার পত্রগুলি আমি আমার নিখিল জগত শান্তি সমিতির পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি। আমার বিশ্বাস শীঘ্রই জাপান হইতে রাসবিহারীর বন্ধুদিগের পত্র ও শুভেচ্ছা আপনি পাইবেন।

৬। রাসবিহারীর কয়েক জন জাপানী বন্ধু ও সহকর্ম্মী যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা নীচে প্রদত্ত হইল—

(১) সুমেই উকাওয়া
৪৮৫, নাকাৎসু মুরা
এই কোগুন, কানাগাওয়া কেন, জাপান

(২) ইয়াসাবুরো সিমোনাকা
সভাপতি এশিয়া সমাজ
৫৭৯, কুগাহারা, উটাকু, টোকিও, জাপান

(৩) অধ্যাপক কে, হিতোকা
৭৯, সান চোম, ওনডেন
সিবুয়িয়াকু, টোকিও, জাপান

(৪) মাদাম কোকো সোমা
৩৯, কোজিমা ওয়েক
মুডোডা, চোফুচো, কিটা টামাগুণ
টোকিও, জাপান

রাসবিহারীর সহকর্ম্মী বিপ্লবী-বীর শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লিখিত পরিশিষ্ট ঃ—

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনীর পরিশিষ্ট লিখিবার ভার লইয়া বিপদে পড়িয়াছি। তাঁর জীবনের কোন্ সময় হইতে আরম্ভ করিব ভাবিয়া পাই না। এই জীবন চরিতে তাঁর বংশ পরিচয়, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ক্রমবিকাশের কথা অবশ্যই বর্ণিত হইয়াছে। বিজনবিহারী রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া সকল সত্যই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। আমার পক্ষে যে সকল অন্তরঙ্গ একসঙ্গে মরণ পণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনই সাধকের জীবন—সবই যেন মাতৃচরণে সম্পূর্ণ সমর্পিত জীবন—সে জীবনের দীক্ষা লাভ হইয়াছিল স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসিয়া।

১৯০৫ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের ইতিহাস এই সকল বিপ্লবী শহীদের জীবনের ইতিহাস এবং বাংলার ইতিহাসেই তার আরম্ভ। কি শুভক্ষণে লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর স্পর্দ্ধা দমন করিবার সঙ্কল্প লইয়া বাংলার ৮ কোটী বাঙ্গালীর অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গভঙ্গ করিয়াছিলেন কে জানে? বাংলা মায়ের কোলে কত যে গুপ্ত রত্ন ছিল এই লর্ড কার্জনের দুষ্কর্ম্মই তাদের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। যাঁহারা প্রকাশ্যকর্ম্মে নেতৃত্ব করিতেন তাঁহাদের পরিচয় সকলেই জানিত কিন্তু যাঁহারা গোপনে বিপ্লব বহ্নি বক্ষে বহন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে নামিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাসবিহারী অন্যতম। সরকারী অফিসে কাজ করিতেন এই বিপ্লবীদের মধ্যে দুই জন—বাঘা যতীন এবং রাসবিহারী বসু। এই দুইজনই অদ্ভুত কর্ম্মী,—সাহসে, বীর্য্যে, সত্যে, উদয়তায় মানবতার প্রতীক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কেহই তাঁহাদের জানিত না। যাঁহারা গোপনে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপিত করিতে প্রয়াসী হন কেহই তাহাদের যথার্থ পরিচয় জানে না কারণ তাঁহারা নাম, যশ প্রভৃতি হৃদয় হইতে বিদায় দিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন। বাঘা যতীনও গিয়াছেন, রাসবিহারীও গিয়াছেন। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। আমরা যাহারা তাঁহাদের সহকর্ম্মী বলিয়া গৌরব করি এবং যাহারা ভারতের স্বাধীনতা দেখিতে পাইলাম

তাহারা তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্ত কি চেষ্টা করিয়াছি? মাঝে মাঝে তাঁদের জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী সভা আহূত করিয়া তাঁহাদের দুই চারিটা স্তুতি বাক্য দিয়াই কর্ত্তব্য সাধন করি। ইহাই কি আমাদের কর্ত্তব্য?

রাসবিহারীর মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প জন্মায় এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে যতীন্দ্রের মত মানুষও বিরল। এই দুই জনকেই এক পর্য্যায় নেতৃত্বের অধিকার দিই এবং স্বভাবতঃই স্বাধীনতার সংগ্রামে ইঁহারা দুইজনই অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিত হন এবং তাঁহাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের পরিকল্পনাও একত্র বসিয়াই করেন। বাংলা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত যে বিদ্রোহের ব্যবস্থা হয় এবং সৈনিকদের মধ্যে যে বিদ্রোহের ব্যবস্থা হয় রাসবিহারী ও যতীন একসঙ্গেই করেন এবং আমায় তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে হইত কারণ আমার কর্ম্মক্ষেত্র হইতেই বার্ত্তা সর্ব্বত্র চালিত হইত। রাসবিহারীর মস্তিষ্ক ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সেইজন্য তাঁহার পরিকল্পনাগুলিও ছিল সুকল্পিত ও অতি পরিষ্কার এবং কার্য্যে পরিণত করিবার পদ্ধতি ছিল এত সুন্দর যে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের স্থানই থাকিত না। তাঁর প্রতিষ্ঠান গড়িবার শক্তি যেমন ভাল ছিল, লোক নির্দ্ধারণ শক্তিও তেমনই সুন্দর ছিল। যে সঙ্কল্প তিনি একবার গ্রহণ করিতেন তাহা হইতে তাঁহাকে বিমুখ করা দেবতারও অসাধ্য ছিল। বাংলার যতীন্দ্র, মানবেন্দ্র (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য), পূর্ব্ববঙ্গের গিরিজাবাবু, শচীন সান্যাল, অতুল ঘোষ প্রভৃতি রাসবিহারীর সহিত যুক্ত হইয়া বিপ্লব কার্য্য করিতেন। চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল রায়ও ছিলেন তাঁর বিপ্লব কর্ম্মের সহকর্ম্মী এবং চন্দননগরেই তাঁর বিপ্লব কর্ম্মের দীক্ষা হয়। শ্রীশচন্দ্র ছিলেন তাঁর নিকট সম্পর্ক সোদর প্রতিম সহকর্ম্মী এবং তাঁহাবই সহযোগিতায় বাঙ্গলার সকল বিপ্লবীর সহিত পরিচিত হন। আমার সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্টতা হয় তাহা আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত দিয়াই চিহ্নিত হয়। আমার কাছেই তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি দেন যাহা তখন শ্রীশচন্দ্রও জানিতেন না। সে কথা জীবন চরিত রচয়িতা লিখিয়াছেন। আমায় রাসবিহারী তাঁহার স্বভাব সুন্দর চরিত্রের দ্বারা এমনই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের সহিত আমার জীবন এমনভাবে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল যে, যে ক্ষেত্রে

যে কাজই, তিনি করিবেন সে কার্য্যের ফল আমাকেও ভুগিতে হইবে। আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুইটী যুবক যাহারা আমার নিকট দীক্ষিত হইয়া মাতৃযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছিল, বসন্তকুমার বিশ্বাস এবং মন্মথনাথ বিশ্বাস, সেই দুইটীকেই তিনি আমার নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। তিনি যদি বলিতেন "অমর দা, আপনি পাঞ্জাবে চলুন" তাহা হইলে আমাকে যাইতেই হইত। তবে আমার কেন্দ্রে বসিবার জন্য কেহ ছিল না বলিয়াই তিনি আমার দক্ষিণ ও বাম হস্ত দুইটী দাবী করিলেন। এই দুই যুবককে আমি পাঠাইয়াছিলাম। মতিলালের কাছে বোমা তৈয়ারী শিক্ষায় যখন তাহারা পারদর্শী হইয়া উঠিল তাহাদের মধ্যে একজনকে (বসন্তকে) রাসবিহারী বাছিয়া লইলেন এবং মন্মথকে শচীন সান্যালের নিকট কাশীতে প্রেরণ করেন। পরে যখন রাসবিহারী কাশীতে আসেন তখন মন্মথকে তাহার পার্শ্বচর করিয়াছিলেন।

রাসবিহারীর পরিকল্পনা ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহী করা। সেইজন্যই তিনি যতীনকে ও নরেন্দ্রকে (মানবেন্দ্রকে) সঙ্গে লইয়া যান এবং বাঙ্গলায় যতীন্দ্রের সহিত আমাকে থাকিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয় নাই। যদি হইত তাহা হইলে হয়ত ১৯১৫ সালেই ভারত স্বাধীন হইত, এতকাল অপেক্ষা করিতে হইত না এবং হিংসা অহিংসার প্রতিযোগিতার কথাও শুনিতে হইত না। অহিংসবাদীরা ঢাক পিটাইয়া বলিতে চান তাঁহাদের অহিংস পথেই দেশ স্বাধীন হইয়াছে। অহিংস পন্থার ক্ষেত্র যে প্রস্তুত করিয়াছিল এই সহিংস পন্থা একথা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা পাপ অর্শাইবে একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

রাসবিহারীর দেশত্যাগ, জাপানের নাগরিকত্ব লাভ, বিবাহাদির ইতিহাস গ্রন্থকার সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসবিহারী জাপানে গিয়া যে ভারতের স্বাধীনতা চিন্তা ব্যতীত অন্যচিন্তা করেন নাই একমুহূর্ত্তও এবং তাঁর পত্নীও যে ভারতের স্বাধীনতার জন্যই রাসবিহারীর মত অজ্ঞাতবাসীকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছিলেন এ কথাও ভুলিবার নহে।

জাপানী নারীদের কোন মতেই বিদেশীকে বিবাহ করার বিধি ছিল না। কিন্তু রাসবিহারীর চরিত্র এবং তাঁহার স্বদেশপ্রীতিই জাপানী নারীকে তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থে প্রণোদিত করে। যোগ্যবরে যোগ্য কন্যাই মিলিয়াছিল। যে পরিবার রাসবিহারীকে আশ্রয় দেন, সেই পরিবারের কাছে ভারতের তথা বাঙ্গলার ঋণ অপরিশোধনীয়।

রাসবিহারী জাপানকে ভারতের বন্ধু করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে জাপান ভারতের শত্রু হওয়ায় বিপ্লবীদের বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে দূর প্রাচ্যের সকল স্থানেই ভারতের বন্ধু সৃষ্টি করিয়া রাসবিহারী যে আই, এন, এ গঠন করিয়াছিলেন সেই শক্তিই তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে দিলেন। নেতাজী নেতাই হইতে পারিতেন না যদি রাসবিহারী তাঁহার সযত্ন গঠিত বল তাঁহার হস্তে অনায়াসে অর্পণ না করিতেন। কিন্তু সেই উদার স্বভাব বীর তাঁহার নিজ শক্তির সীমা জানিয়াই এত গৌরবের নেতৃত্ব নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। আজ আমরা নেতাজীর গৌরবের কথাই গাহিতেছি, রাসবিহারীকে ভুলিতে বসিয়াছি। রাসবিহারীর জীবনীর গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিয়া এবং প্রকাশিত করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। ইহার মধ্যে মিথ্যার লেশ নাই, কল্পনার গন্ধ নাই। ইহা প্রকৃতই রাসবিহারীর জীবনচরিত, উপন্যাস নহে, উপকথা নহে। আমি আশীর্ব্বাদ করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশ সেবা করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
(ব্যবস্থাপক সভার
ভূতপূর্ব্ব সদস্য)